

শরৎচন্দ্র ।

উপন্যাস ।

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত ।

"Let criticism do what it may, writers will write, printers will print, and world will inevitably be overstocked with good books."—*Washington Irving*.

"All the world may forsake an author, but vanity will never forsake him."—*Goldsmith*.

তৃতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন,—নব্যভারত-প্রেসে
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে
প্রদ্বকার কর্তৃক প্রকাশিত ।
১৩০৪ সাল ।

(*All rights reserved.*)

শরৎচন্দ্র ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।



বালক বালিকা ।

নদী তীর,—নির্জন, একদিকে প্রান্তর ধু ধু করিতেছে, অপরদিকে কল কল রবে চিরপ্রবাহিনী চলিয়া যাইতেছে। তরঙ্গ আস্তে আস্তে, জলের উপরে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া সৈকতময় প্রান্তরে শেষ হইতেছে। কত তরঙ্গ,—দেখিতে দেখিতে ছুটিতেছে। প্রান্তরের অপর পার্শ্বে গ্রাম, গ্রামের কোলাহল প্রান্তরে আসিতে আসিতেই শেষ হইতেছে, নদী তীর পর্যন্ত আসিতেছে না। তীর—নির্জন—কোলাহল-শূন্য। কোন কোন সময়ে হঠাৎ ছই একটা পাখী উড়িয়া তীর সন্নিধানে আসিয়াই ফিরিতে-ছিল।

গোধূলির অব্যবহিত পূর্বে একটা ষোড়শবর্ষীয় বালক একাকী প্রান্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া নদী তীরে উপস্থিত হইল। মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র পিতৃ মাতৃহীন বালকের স্থায়; গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্র ঝুলিতেছিল। বালকের মন কখনও চঞ্চল, কখনও স্থিরভাবে ধারণ করিতেছিল; কখনও চক্ষু হইতে ছই এক বিন্দু জল ঝরিতেছিল, কখনও চতুর্দিকের শোভা সন্দর্শনে চিত্ত পুলকিত হইতেছিল। অল্পকাল ইতস্ততঃ পরিলক্ষণ করিয়া অবশেষে আসিয়া একটা চিতা-সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে একটা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা আসিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিল—“দাদা! আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে না দেখতে পেয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলাম—তুমি আমাকে ফেলে এখানে আসিলে কেন?”

বালকটা বলিল—“নীর! আমি এখানে এসেছি তা তুমি কেমন করে টের পেলে?”

বালিকা,—তুমি আমাকে নিয়ে রোজ রোজ যে বাগানে বেড়া'তে যাও, আমি প্রথম ত এক চোটে সেইখানে গেলেম ; কিন্তু তোমাকে না দেখতে পেয়ে মনটা যেন ধড় ফড় করে উঠলো । সেইখানে ভাগ্যিস সৈরির দাদা ছিল, তাই আমাকে সে চট করে তোমার কথা বলে দিলে । আমি ছুটে ছুটে,—দেখ আমার গা দিয়ে ঘাম পড়ছে ।

বালক।—নীর ! আচ্ছা বলত, আমরা প্রত্যহ যে বাগানে বেড়াতে যাই, সেই জায়গাই ভাল, না এই স্থান ভাল ?

বালিকা।—না দাদা, এ যেন কেমন [চতুর্দিক দৃষ্টি করিয়া] ওমা একি !—দাদা, এটা কি ?

বালক।—নীর, ভয় কি বোন ! আমি যে তোমার কাছে রয়েছি ।

বালিকা।—আচ্ছা দাদা, সে দিন বাবাকে ত এই দিক পানেই নিয়ে এলো, তারপর আর তাঁকে দেখতে পাই না ; এর কারণ কি দাদা ?

বালক।—নীর ! এটা কি বলত ?

বালিকা।—বাবার সঙ্গে আমি একদিন পুকুরের ধারে বেড়াতে গিয়াছিলাম, সেই দিনকার কথা মনে হ'লে মনটা যেন কেমন করে উঠে । এই ক দিন বাবাকে না দেখে একটু একটু কষ্ট হয় সত্য, তা যেন কিছুই নয় । কিন্তু দাদা ! তোমাকে একটুকু না দেখতে পেলেই চক্ষের জল বেরিয়ে পড়ে ।

বালক।—তুমি অবোধ, কিছুই বোঝ না । মা—বাপ কি, তা ত বোঝনা, তাই তোমার কষ্ট হয় না । আমাদের মত ভ্রমী আর কে ? আমাদের মাও নাই, বাপও নাই ! (রোদন)

বালিকা।—দাদা ! তুমি কাঁদ কেন, তোমার চক্ষে জল দেখলে আমার চখেও জল যেন আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ে । দাদা ! আর কাঁদ না ।

বালক।—মা, বাপ কি, তা তুমি কেমন করে জানবে ? মাকে ত তোমার স্মরণও নাই ; এত দিন বাবা ছিলেন, তাই কোন কষ্ট পাও নাই ।

বালিকা।—বাবাকে সে দিন যখন কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে গেল, তখন একবার ভাবলেম বাবাকে দেখবো, কিন্তু তোমাকে দেখে সব ভুলে গেলাম ।

বালকটা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—শৈশব সময় বড় সুখের কাল, কিছুই জানে না, সদাই আনন্দ । আমাদেরিগের এত হুঃখ, ভাবতে বসলে হৃদয় অবসন্ন হয় তা নীরদা কিছুই বোঝে না । আমার মন জলে যায় ! উঃ ! কি

কষ্ট! পিতা মাতা নাই, তাও নয় দু' হউক, কাল আবার যে কথা শুন্লেম ; হৃদয়, মন অস্থির হয়। আবার এমনি কন্দের ভোগ, বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিনা। আজ এইখানে আসিলাম, ভেবেছিলাম মনের সাধ ভরে আজ একবার কাঁদব, হৃদয়ের ছঃখ বাহিরে প্রকাশ করে দেখুবো, তাতে পোড়া হৃদয়ের ছঃখ অধি নিবে যায় কিনা! তঃ এক দণ্ড যেতে না যেতেই আবার নীর এসে উপস্থিত হলো। আর সন্ননা। নীরদার মন সরল, কোমল, অবোধ, কিছুই জানে না; কিন্তু এর মুখের দিক চাইলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, কথা আর সরেনা।

বালিকা।—দাদা, তুমি এত ভাবছ কি? আমার সঙ্গে কথা বলনা কেন? চুপ করে রইলে যে?

বালক।—কৈ নীর—কিছুই ত ভাবছি না। মনে মনে ভাবিলেন,—কি করি! আর সন্ননা। দেশাচার কি কদর্যা! বৈধব্য-দশা কি ভয়ানক! নীরদার ভাগ্যেও কি এই ছিল! নীরদা ত এসব কিছুই বোঝেনা। এই অজ্ঞাত বিধে নীরদার শরীরকে জর্জরিত করিবে। কি কষ্ট! নীরদার বয়সই বা কত—বুঝেই বা কি? এত অন্ন বয়স—এর মধ্যে বিয়েই বা কেন দিলে? এ কষ্ট কি করে সহ করবে? নীরদার ছঃখ অপরিসীম! নীরদার কষ্ট যখন নীরদা বুঝিবে, তখন কে সমহুঃখী হয়ে নীরদাকে বোঝাবে! দেশাচার কি কদর্যা—ইচ্ছা করে এই দণ্ডে—

বালিকা।—সন্ধ্যা হয়ে এল, দাদা বাড়ী যাবে না?

বালক।—চল যাই, আর এখানে থেকে কি করব! (স্বপ্নত) চিতা! প্রজ্বলিত থাক্ত, তা হলে বাপ দিতাম, পিতার সঙ্গের সঙ্গী হতেম! নদীর গর্ভ—কি রমণীয় স্থান, ইচ্ছা করে এই মুহূর্ত্তে আশ্রয় বিসর্জন দি। তা হলেইবা নীরদার উপায় কি হলো! নীরদার মলিন মুখের প্রতি কে তাকাবে? আমি মরিলে নীরদা কি বাঁচবে? যে আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখে থাক্তে পারে না, সে কেমন করে আমার অবর্ত্তমানে প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? কি নিদারুণ অবস্থা!!

সন্ধ্যা অতীত হইল। দুইটা ভাই ভগ্নী হাত ধরাধরি করিয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বালকটার মন সময়ে সময়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। বালিকাটা নিঃসন্দেহ চিত্তে চলিতে লাগিল। প্রান্তরের মধ্যস্থান, জন-প্রাণী-রহিত, দুইটাই অন্ন বয়স্ক, আকাশে ক্ষীণ নক্ষত্র,

চতুর্দিক বায়ু সো সো করিতেছে ; ভীষণ অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন, বালকটা ভীত মনে গাইয়া উঠিলেন,—

‘সংসারে সকলি অসার ভাবিয়া দেখরে মন’

বালিকাটাও স্বর মিলাইয়া গাইল—‘সংসারে সকলি অসার ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সেই সমাধিস্থল ।

চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অমাবসার রাত্রি, বৈশাখ মাস, রজনী ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল । পথ, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল । ছইটা ভাই ভগ্নী ক্রমশঃ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে বালকটা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন—আবার সেই প্রাস্তরের শেষ সীমা । মনে নানা প্রকার ভাবনা উঠিতে লাগিল । ভয় ও বিবাদ পর্যায়ক্রমে আসিয়া মনে স্থান নিতে লাগিল । চতুর্দিকে নানা প্রকার বিভীষিকা আসিয়া কল্পনায় দেখা দিতে লাগিল, আর হাটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না ; বিশ্রামের জন্ত তথায় বসিলেন ।

বালিকাটা ভাব গতক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল—দাদা ! আমরা আর কতক্ষণে বাড়ীতে যাব ? আমি তখন ত এর চেয়ে খুব শীঘ্রির এসেছিলাম ।

বালকটা কিছুই উত্তর করিলেন না । কি কর্তব্য ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল ।

ক্ষণকাল পরে গ্রাম হইতে কতকগুলি লোক একটা মৃত দেহ বহন করিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল । বালকটার মনে একটু সাহস হইল । একাগ্রমনে সেই লোকদিগের কার্যাদি অবলোকন করিতে লাগিলেন ; ছোট ভগ্নীটা অজ্ঞাতসারে বালকটার হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রার অভিভূতা হইল ।

মৃতদেহ বাহকেরা এ পর্য্যন্ত বালক বালিকাকে দেখিতে পার নাই । এ পর্য্যন্ত তাহারা কার্য্যই তৎপর ছিল । কিন্তু ইতিমধ্যে একজন লোক

জল আনয়ন করিবার জন্ত নদীর দিকে যাইতেছিল ; হঠাৎ বালক বালিকাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে ?—তোরা এতরাত্রে এখানে এসেছিস্ কেন ?

বালকটা সকল বিবরণ খুলিয়া বলিলেন । সেই লোকটা সেই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল—আর দেখিস্ কি, নীরদা বিধবা হইয়াছে, নীরদার স্বামীর মৃত দেহ লইয়া আমরা আসিয়াছি !

বালকটার কথা সরিল না, চক্ষু হইতে জলও বাহির হইল না, মুখ বন্ধ হইয়া আসিল, ভাবনার তরঙ্গ উখিত হইল । কত ভাবনা—মহুসোর মন ভাবনার আকর ; ভাবনার সময়, কত ভাবনাই আসিয়া সঞ্চয় হইতে থাকে । বালকটা প্রথমে ভাবিলেন, পিতা—তারপর মাতা—আত্মীয় পরিজন—আকাশের তারা—গাছের পাতা—ভীষণ অন্ধকার—চিতা—সমাধিস্থল—জন্ম—মৃত্যু—ভালবাসা—প্রণয়—আরো কত কি । আবার ভাবিলেন, নীরদা—তার স্নেহ, বালিকাত্ব, সরলস্বভাব, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, নীতি,—আরো কত কি ? ভাবিতে ভাবিতে শরীর নিস্তেজ হইল, অঙ্গের বাঁধনি ছিড়িয়া পড়িল, দ্রুত মায়ু সকল উত্তেজনী শক্তি প্রাপ্ত হইল, চক্ষু হইতে অজ্ঞাতমারে জল পড়িতে লাগিল ।

নীরদার সহসা নিজা ভঙ্গ হইল । দাদার চক্ষের জল ধারাবাহী হইয়া নীরদার গায়ে পড়িতে লাগিল, নীরদা কাঁদিয়া বলিল, দাদা ! তুমি কাঁদছ কেন ?

বালকটা একটু থামিয়া বলিলেন—“না নীর ! কাঁদিব কেন ?” মনে মনে ভাবিলেন, নীরদা এখনও কিছুই বোঝেনা । হায়, এই অজ্ঞাত বিদে নীরদার শরীর ক্ষত বিক্ষত হবে ! যাহা হউক, এখন আর বুঝানে কাজ নাই । কোন রকমে নীরকে বাড়ী লয়ে যেতে পারলে হয় ? তারপর বা কপালে ঘটেছে, তা ত চিরকালের মঘল ! হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কেন ? আমাদের যে এত ভালবাসে, তার এই প্রকার নিদারুণ শোকময় ঘটনার অপরিহার্য্য বিবেক দংশনের কথা মনে হলে এ মন দখে যায় না কেন ? ইচ্ছা হয় দেশান্তরিত হই ; কিন্তু তাহা হইলেই বা নীরদার কি হইবে ? কি সন্তাপপূর্ণ ঘটনা ! কি ভয়ানক অভ্যচার ! অবোধ বালিকা, সংসার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি জানে, কি বুঝে ? পতিবিহনে নারীর কি প্রকার হৃদশা ঘটে, কেমনে বুঝিবে ? নীরদার কমনীর স্মরণ মূর্তি, মনে হলে পাষাণও বিগলিত হয় ; কি কষ্ট, অপরিহার্য্য দৃশ্য !!

এদিকে চিত্তা সজ্জিত হইল। নৈশ সমীরণ বেগে বহিতে লাগিল। জগৎ আঁধার—আঁধার হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। নয়ন সন্নিধানে ভয়ানক দৃশ্য—অপরিহার্য্য দৃশ্য ! কে দেখিবে ? শেষ দৃশ্য, এ সংসারে আর বাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না, সেই শেষ মূর্ত্তি, আর বাহার অপরূপ নয়ন মনকে হরণ করিবে না, সেই মূর্ত্তি—কে দেখিবে ? নীরদা কি বুঝে ? শেষ মূর্ত্তি কাহার না দেখিতে ইচ্ছা হয় ? দেখিতে দেখিতে সব ডুবিবে, এ সংসার তিলেকের মধ্যে নয়ন সমীপে আঁধার বোধ হইবে, এ সকল ভাবিতে বসিলে আর জীবনে সুখ পাওয়া যায় না, এ সকল ভাবিয়া কে মনের সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে ? আজ দেখিলাম, আর দেখিব না, এ নয়ন আর জুড়াইবেনা,—কি ভীষণ দৃশ্য !!!

চিত্তা জলিয়া উঠিল ! নীরদার জীবন-সুখ ক্রমে ক্রমে আঁধার আঁধার হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সমীরণ বেগে বহিতে লাগিল,—চিত্তা হুহু করিয়া সজোরে জলিয়া উঠিল ! অন্ততাপ—ভাবনা—সুখ—দুঃখ—ভালবাসা—প্রেম—প্রণয়—আশা—ভরসা—নীরদার সব একে একে আঁধার—আঁধার হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল ! নীরদা কি বুঝিবে ? নীরদার একমাত্র জীবন-সুখ ভস্মীভূত হইল ; নীরদা বুঝিল না,—বুঝিল না, কি বিষম সংসার-বিষ তাহাকে অসময়ে দংশন করিল !

রজনী প্রভাত হইল। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের শ্রায় নীরদার জীবন-সুখ বিসর্জিত হইল। পবন মৃদু মৃদু বহিল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, প্রকৃতি পরিবর্তিত হইল—চিত্তা নিবিল ! আকাশে নক্ষত্র ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল, সংসার পরিবর্তিত হইল।

সেই বালকটি নীরদার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আন্তে আন্তে গ্রামাভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। মনুষ্যের হৃদয় পাবাণময়, একেবারে স্রব হইল না !!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সধবা ও বিধবা ।

সেই দিন বৈকালেই নীরদার বেশ পরিবর্তিত হইল ! পাড়ার একটা পাষণ-জদয়া স্ত্রীলোক আসিয়া নীরদার অঙ্গের আভরণ কাড়িয়া লইল । শোভার মধ্যে কেবল মাত্র একখানি লালবস্ত্র পরিতে দিল । নীরদা বুদ্ধিগাও ভাল বৃত্তিতে পারে নাই, অথবা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় আর উত্তর আসিল না ; নীরদার কোন কিছুতেই আপত্তি ছিল না ।

নীরদার আর একটা সঙ্গিনী—সেও বালিকা । নীরদার সপ্তম বর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া তিনমাস হইয়াছে, ইহাকে ভাষায় আট বৎসর কহে । সঙ্গিনীর এই ১৪ বৎসর অতীত হইয়াছে । সঙ্গিনীর নাম বিদ্যাবাসিনী, সকলে বিন্দু বিন্দু বলিয়া ডাকিত ! বিদ্যাবাসিনী নীরদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ।

লাল বস্ত্রখানি পরিয়া, নীরদা ছুটিয়া বিদ্যাবাসিনীর নিকটে যাইয়া বলিল, বিন্দি ! দ্যাখ্‌ত আমার কেমন কাপড় !

বিদ্যাবাসিনীর মুখে হাসি আসিল না, চক্ষু হইতে একবিন্দু জল অজ্ঞাতে পতিত হইল, মনের ভাব লুকাইয়া বলিলেন, নীর ! কাল তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

নীরদা ।—আমি দাদার কাছে বলে দেব, তুমি আমাকে 'ভুই' বলেছ । আমি লাল কাপড় খানা পরে এলেম, তাতে তুমি একটুও ভালটাল বলে না ! আমি যাই, তোমার কাছে আর আসব না, দাদার কাছে বলেদি গিয়ে ।

বিদ্যাবাসিনী ।—(নীরদার চিবুক ধরে) ওলো আমার আহ্লাদ খানিরে ! তুমি যাবে যাও না কেন ? দাদার কাছে বলে দিলে ত আমার সর্বনাশ হবে ! তোমার দাদা আমার কি করবেন ?

নীরদা ।—কি করবে, তা যেন আর তুমি জান না ! আমি যাই, বলে দেই গিয়া ।

বিদ্যাবাসিনী—আচ্ছা থাক যেওনা । না, তোমার কাপড় খানি বেশ, তুমি কাল কোথায় গেছেলে, বলেনা ?

নীরদা ।—তবে বলি শুন । কাল সন্ধ্যার আগে দাদাকে না দেখতে পেয়ে আমার মনটা যেন কেমন করে উঠলো । প্রথমতঃ, দাদা ও আমি রোজ যে

বাগানে যাই, সেইখানে গেলেম, কিন্তু কোথায় দাদা? সে বাগানে দাদাকে না দেখে মনটা বড়ই অস্থির হলো। সেইখানে সৈরির দাদা ছিল, সে আমার কান্না দেখে দাদার কথা বলে দিলে; আমি সেই নদীর ধারে গিয়া দাদাকে দেখতে পেলেম। কিন্তু ভাই, বলব কি, দাদার মুখে আর সে হাসি নাই; আমাকে দেখলে তিনি কত সঙ্কষ্ট হতেন, তা কাল যেন আরো হুঃখিত হলেন! তারপর ত সেইখানেই রাত হয়ে গেল! অনেক রাত্রে আমরা দুজনে মাঠের ভিতর দিয়া আসছি, আসতে আসতে, কতক্ষণ পরে দেখি, আমরা আবার সেইখানেই এসেছি। দাদার মন বড়ই বিরক্ত হলো। তিনি সেইখানে বসলেন, আমি তাঁহার হাঁটুর উপর মাথা রেখে শুলেম। অনেকক্ষণ পরে একটু গোলমাল কাণে গেল, উঠে দেখি, দাদা কাঁদছেন। আমি দাদাকে কারণ জিজ্ঞাসলেম; দাদা কান্নাটান্না ঢেকে আমাকে বললেন, ‘না কাঁদব কেন?’ আমি অবাক হয়ে বসে রলেম। তারপর কি বলব, সেই যে গোলমালের কথা বলছিলাম, সেইখানে আরো দশ বারো জন লোক আগুন জ্বলে কি যেন করতে লাগলো! আমার মনটা কি জানি কেন, যেন ধড় ফড় করে উঠলো। আমার একবার ইচ্ছা হলো দাদাকে জিজ্ঞাসি, কিন্তু কথা বার হলো না। দাদা মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন! অনেকক্ষণ পরে রাত পোহালে দাদা আমার হাত ধরে বাটার দিকে চলে এলেন! তারপর আমি ঘরে গেলে দিনীর মা এসে আমার সকল গয়না টয়না খুলে নিলে! আমি আর কিছুই বল্লম না। তারপর এই লাল কাপড় খানি আমাকে পরতে বল্ল, আমি পরেই দাদার কাছে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু পথের মধ্যে তোকে দেখতে পেলেম, শুনলি বৌ, আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারি না।

বিক্র্যবাসিনীর মন চঞ্চল হইল; হৃদয় মধ্যে হুঃখ উজ্জ্বাস বেগে বহিতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করে বলিলেন, নীর, আমাদের ঘাটের ধারে কত কি ফুল ফুটেছে তা তুমি দেখ নাই, চল যাই আমরা সেই সকল ফুল নিয়ে আসিগে।

নীরদা—না ভাই! দাদাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখি নাই, একবার দাদার কাছ থেকে আসি, তারপর যাবওকন।

বিক্র্য।—তাকে এখন দেখতে পাবে না, তিনি যেন কোথায় গেছেন। চল আমরা ফুল তুলে নিয়ে আসিগে।

নীরদাদের বাটীর পিছন দিকে খিড়কীর পুকুর, তাহার চতুর্পার্শ্বেই ফুলের বাগান । সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল ; স্থানে স্থানে বসিবার জন্ত আসনও ছিল । বাগানের চারিদিক প্রাচীরে আঁটা । বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া এই স্থানে বসিয়া গল্প করিত । আমরা পূর্বে যে বালকটীর কথা বলিয়াছি, তাহার প্রযত্নেই এই বাগানটী প্রস্তুত হইয়াছিল । সেই বালকটীর নাম শরৎচন্দ্র । শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন । শরৎচন্দ্রের পিতা নিতান্ত সামান্ত লোক ছিলেন না, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি অনেক ছিল । শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময় এই সকল গাছ নিয়ে এসে এই বাগানটী সাজাইতেন । সে অনেক দিনের কথা ।

নীরদাকে লইয়া বিদ্যাবাসিনী খিড়কীর বাগানে গেলেন । বিদ্যাবাসিনীর যখন কোন ছুঃখের কথা মনে উপস্থিত হইত, তখনই তিনি এই খানে আসিতেন । বাগান না, গেন সাঙ্ঘনার কুটীর ! বিদ্যাবাসিনী বাগানে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, দ্যাখ্, নীর ! এসকল গাছ কে এনেছে, জানিস ?

নীরদা—আমাদের বাগান আমি আর জানিনে ! এ সকল গাছ আমার দাদা এনেছে ? দাদা, যখন কলকাতা থেকে বাড়ী আসে, তখনই কত প্রকার গাছ নিয়ে এসে, এই বাগানে পোতে, তা আর আমি জানিনে ।

বিদ্যা—তোমার দাদা আবার কে ?

নীরদা—আমার দাদাকে যেন আর তুই জানিসনে ! অনেকক্ষণ দাদাকে না দেখে মন্টা কেমন করতেছে, তুই জানিস ত বলনা ভাই, দাদা কোথায় গেছেন ?

বিদ্যা—কি জানি ; তোমার দাদার কথা আর শুন্ব না । তোমার দাদাকে আমারও দেখতে ইচ্ছা করে, তা তোমার দাদা একবারও দেখা দেয় না ।

নীর—দাদা, যাহাই বলনা কেন, আমাকে খুব ভালবাসে । তোকে ভালবাসবে কেন ? তুই তার কে ?

বিদ্যাবাসিনীর চক্ষের জল ছল ছল করিল, বলিলেন তা থাক্, তোকে সেদিন যে গানটা শিখিয়েছিলাম, সেটা তোমার মনে আছে ?

নীর—কোনটা ? সেই বিধবারটা ?

বিদ্যা—হাঁ সেইটা, একবার গা ত ।

নীরদা সুর মিলাইয়া গাইল, “আর প্রাণে কত সখ” । আবার একটু পরেই বলিল, আছা দ্যাখ্ বৌ, বিধবারা ত বেশ, তাহাদের কষ্ট কি ?

বিন্দ্য।—তোমার পোড়া কপাল আর কি ? (স্বগত) তা বেশ না কেমন, বিধাতা (দীর্ঘনিঃশ্বাস) তোমাকে বেশ বোকাবেন ! এখন একদিন না দেখতে পেলই আমার মন অস্থির হয় ; নীরদা চিরকাল, চিরদিনের তরে স্বামী-স্বখে বঞ্চিত ! বিধাত ! তোমারই ইচ্ছা ।

নীর।—না ভাই, আমি এখন যাই, দাদা বোধ হয় এতক্ষণ এসেছেন ।

বিন্দ্য।—আচ্ছা তবে যাও ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বাল্য-প্রেম ।

নীরদা চলিয়া গেলে, বিন্দ্যবাসিনী একাকিনী সেই স্থানে কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন । ক্ষণকাল পরে কতকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা মালা গাঁথিয়া একস্থানে রাশিকৃত করিতে লাগিলেন ।

এই সময় হঠাৎ সেই স্থানে শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া বিন্দ্যবাসিনী ব্যস্ততা সহকারে পুষ্পগুলি রাখিয়া বসিলেন ।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, বিন্দু ! তুমি এখন আমাকে দেখে লজ্জা কর কেন ? ছেলে বেলায় যখন আমি তোমাদের দেশে যাইতাম, তখন ত তোমার এভাব ছিল না । তখন তুমি তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বলতে একদিনও কুণ্ঠিতা হতে না । সে ত অনেক দিনের কথা নয় । দেখ, তুমি যখন পুতুলের বিয়ে দিতে, আমি তখন তোমাকে বলিতাম “এই প্রকার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে, অল্প প্রকার দেওয়া ভাল” তুমিও তখন আমার কথায় সায দিতে । তুমিও তখনও আমাকে বিয়ে করতে চাইতে, কিন্তু তখন ত তোমার লজ্জা ছিল না, তখন ত তুমি সরলা ছিলে । আর এখন দিন দিনই তুমি মনের ভাব লুকাইতে চেষ্টা কর । মানুষ কোথায় না বড় হলে ভাল হয়, তা তুমি আরো দিন দিন মন্দ হচ্ছে। তুমি ফুলের মালা সাজাচ্ছেলে, তা আমাকে দেখে ধাম্লে কেন ? এ সব কথা আমি অনেক দিন তোমাকে বলব বলব মনে ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই ।

বিক্যাবাসিনী।—আপনি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলেন। নীরদা যে আপনাকে না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়েছে ?

শরৎচন্দ্র।—নিরদাকে আজ আর দেখতে ইচ্ছা করে না, তাই এদিক ওদিক বেড়াতে গিয়াছিলাম। তা যাই হউক, বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে ? তুমি আমার এতগুলি কথায় যে কিছুই বল্লে না।

বিক্যাবাসিনী।—আর বল্ব কি ? আগে আপনাকে দেখলে লজ্জা হতো না, কিন্তু কি জানি, এখন যেন দেখলেই লজ্জা আপনা আপনি এসে পড়ে। যা হউক, আমি আর লজ্জা করব না।

শরৎচন্দ্র।—লজ্জা করবে না ? তবে এস ত দেখি সেই ছেলে বেলার মত আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াই।

বিন্দু।—তা হবে না, মানুষে দেখলে কি বল্বে ? তা কখনই হবে না, আমি যাই—

শরৎচন্দ্র। তবে তুমি কেন বল্লে আর লজ্জা করবে না ?

বিন্দু।—অনেক দিন পূর্বে, (এ সেই ছোট বেলার কথা) আমি আপনাকে ‘শরৎ’ বলে ডাকিতাম, একটুও লজ্জা বোধ হ’ত না, কিন্তু আজ আপনাকে “শরৎ” বলে ডাকতে ইচ্ছাও করে, আবার লজ্জাও করে।

শরৎ।—আচ্ছা বিন্দু! তুমি কি আমাকে আগেকার চেয়ে অধিক ভালবাস।

বিন্দু।—বুঝি না। বাল্যকালে আপনাকে যেমন দেখতে ইচ্ছা করত, আবার তেমনি দেখতে পেতাম। তখন যেন একটু ভাল ভাব ছিল। কিন্তু এখন একটু আত্মীয় ২ বোধ হয় সত্য, কিন্তু আর আপনাকে প্রায়ই দেখতে পাই না। দেখতে পাই না, তাও নয় দুঃ হউক ! আগে আপনাকে আমাতে সমস্ত দিন বসে বসে থাকলেও কেহ কোন কথা বলত না। এখন এই সে বসে রয়েছি, এ দেখলেও কতজনে কত কথা বল্বে। তাই বলি ! আমি বুঝি না—মনে একটু কেমন কেমন ভাব হয়।

শরৎ।—তা মিথ্যা নয়। বিন্দু! মনের বলতে কি, ছেলেবেলা আমাদের মনে যে পবিত্র ভাব ছিল, এখন আর তাহা নাই। বোধ হয় সে ভাব আমাদের বিবাহেতেই দূর হয়েছে। বিবাহের পূর্বে আমাদের মনে যে ভালবাসা ছিল, এখন তাহা হ্রাস হইয়াছে, বলিতেছি না। তবে সে প্রকার মনের সরলতা এখন আর নাই।

বিক্র্য।—আপনাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছা করে, কিন্তু—আপনি আমাকে দেখা দেন না কেন ? বলিতে বলিতে বিক্র্যবাসিনীর বাল্য সখার কথা মনে উথলিয়া উঠিল ; বর্তমান অবস্থা সহসা মন হইতে অপমৃত হইল ; বিক্র্যবাসিনীর মস্তক অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের হাঁটুর উপর ঝুস্ত হইল ! কি বিমল বাল্যপ্রেম ! শরৎচন্দ্র আফ্লাদে বিগলিত হইলেন । এই প্রকারে শরৎচন্দ্র এবং বিক্র্যবাসিনীর হৃদয়-সরোবরে বাল্য-প্রেম-কমল বিকশিত হইতে লাগিল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বাল্য-সখা ।

আর একটা বালক, তার নাম অবিনাশ । অবিনাশ শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র । অবিনাশ শরতের বাল্য সহচর । অবিনাশ কেবল পিতৃহীন ; শরতের মা, বাপ, কেহই নাই । কয় বৎসর পূর্বে শরতের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল, এবার তাহার পিতারও মৃত্যু হইল । অবিনাশের একটা ভগ্নী আছে, আর আপন ভাই নাই । শরতের চারিটা সহোদর এবং তিনটা সহোদরা, সহোদরের মধ্যে দুইটির বিবাহ হইয়াছিল । নীরদা শরতের কনিষ্ঠ ভগ্নী, নীরদা এবার বিধবা হইল । নীরদার স্বামী তাঁহার মাতুলালয় মধুপুরেই থাকিতেন । শরতের চারিটা সহোদরের মধ্যে দুইটা জ্যেষ্ঠ, এবং দুইটা কনিষ্ঠ । জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের দুইটা স্ত্রী ছিল, তাহারা শরৎকে পূর্বে বড় মন্দ চক্ষে দেখিতেন না । শরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব কৃতবিদ্যা, স্মৃতিরং পিতার বর্তমানে তাঁহাদিগের ভ্রাতৃত্বহের লাঘব হয় নাই ।

অবিনাশ, শরতের কনিষ্ঠ । ছোটকাল হইতেই দুইটা ভাই গলাগলি ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিত । এখনও সেই ভাব, সেই ভাব ক্রমে ক্রমে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল । অবিনাশ যখন শিশু, তখন শরতের ক্রীড়ার সহচর ; আর অবিনাশ এখন বালক, শরতের বাল্য-সখা । দুইজনের এমনি মিল, একজন অপরকে রাখিয়া কখনই কিছু ধাইত না । দুইজনের মনের কথা দুইজনেই জানিত । অবিনাশের মাতা শরৎকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন । শরতের মাতা নাই, কিন্তু অবিনাশের মাতাই শরতের

মাতার ছায়। মাতৃ বিয়োগের কষ্ট শরৎচন্দ্র এপর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই ; পিতার বর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঋণী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

পিতার মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত শরতের মুখে কেহই হাসি দেখিতে পায় নাই, প্রায়ই নির্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। অবিনাশের সহিত দেখা হইলেও ততটা মন খুলিয়া কোন কথাই বলিতেন না। • এক দিন অপরাজ্ছে শরৎ অবিনাশকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ ময়দানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অবিনাশের বয়স এই সময়ে পনের বৎসর মাত্র।

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন,—দাদা ! তোমার মুখ আজ কাল এত মলিন কেন ? সকল সময়েই চিন্তা কর। এত ভাব কি ? কলিকাতায় যাবে, তাই ভাব কি ?

শরৎ।—ভাই ! মনটা বড়ই অস্থির হয়েছে। বাবা মরেছেন, তিনি ত সুখেই গেলেন, কিন্তু আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। এতদিন ঘরের সকলের একভাব ছিল, এখন দেখি আর এক ভাব। এতদিন কলিকাতা থেকে বাড়ী এলে আর ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা হ'ত না, এখন এক দণ্ডও ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না। বাবা মরেছেন, তাতে তত দুঃখ নাই, নীরদাও চিরকাল তরে সকল সুখ হতে বঞ্চিত হলো ! আমি আর নীরদার উপায় দেখি না ! নীরদার কথা যখন ভাবি, তখন মদয় অপ্রচ্ছন্ন আগুনে পুড়ে ছারখার হয় ! মনের কথা আর কে জানে ? সমদুঃখীই বা কে আছে ? কলিকাতা যাবার জন্ম মনটা চঞ্চল হয়েছে সত্য, কিন্তু কলিকাতা যাইয়া এবার সুস্থ চিত্তে থাকতে পারব না। নীরদার জন্ম মন সদাই অস্থির। দেখ ভাই ! বাবা মরেছেন আজ চই মাসও হলো না, এরি মধ্যে বৌ ঠাকুরকণদের ভাবাস্তর দেখছি ? মনোদুঃখ কে বুঝবে ?

অবিনাশ।—আজকাল তোমার যে প্রকার ভাব দেখছি, বোধ হয়, এ প্রকার অবস্থা থাকলে তোমার কোন ব্যামো হবে। বৌদের ব্যবহার দে ওরকম হবে, তা কি তুমি এতদিন ভাব নাই।

শরৎ।—ভাবব না কেন ? কিন্তু ভাই আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাদিগের সহিত আর কখন কোন মত্ক ছিল না, তাঁহাদের প্রতি আশা করা নৃণা, তা জানি, কিন্তু তবু এতদিন ভাল বোধ হতো। তা যাক, আমার আর কি ? কেবল ভাবি নীরদার কি হবে ? নীরদার এপথ, ওপথ দুই পথেই কষ্টক পড়িল ! !

অবিনাশ ।—সে দিন মা বলিতেছিলেন যে, ওপুরী আঁধার হলো !! ‘হুই দিন যেতে না যেতেই যে ঘাঁর পরিবার সঙ্গে করে লয়ে চলো’—আমিত একথার কিছুই ভাব বুঝলাম না। দাদা—তোমাদের সকলেই কি বাড়ী ছেড়ে যাবে ?

শরৎ ।—শুনেছিলাম, একদিন বড় দাদা বলেছিলেন যে, দেশের যে প্রকার অবস্থা, এতে শূন্য বাড়ীতে সকলকে রেখে যাওয়া উচিত নহে; তার-পর আর কি কথা ঠিক হয়েছে, তা ভাই আমি জানি না। তাতে আমার কাজ কি ? নীরদা এখন বালিকা, যেখানেই থাকুক, শারীরিক কষ্ট হলেও মনোকষ্ট পাৰে না। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, সেই ভাবনাতেই আমার মন অস্থির হয়েছে। ভাই অবিনাশ!—মথার্থ কথা বলতে কি—আর দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না; নীরদা মনের আঁগুনে দগ্ধে মরবে, আর আমরা আমোদে থাকব !

অবিনাশ !—যা হবার তা হয়েছে। তুমি দেশে আসবেনা, তা হলেই বা নীরদার কি হবে ? নীরদার মনোকষ্ট ত চিরসম্বল; তবে আমরা দুজন বেঁচে থাকলে, আর কোন কষ্ট হবে না।

শরৎ ।—তাইবা ভাই কে জানে ?

অবিনাশচন্দ্র অশ্রমনস্ক হইয়া বলিলেন—এই যা দাদা—মা যে তোমাকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে বলেছেন ! তোমাকে ক দিন না দেখে তিনি বড়ই অস্থির হয়েছেন, চল, আমাদের ঘরে উভয়ে যাই।

শরৎ আর অবিনাশ দুইটাই বালক; শরৎ ধীর প্রকৃতি, শান্ত, চিন্তা-শীল। অবিনাশ একটু চঞ্চল এবং অশ্রমনস্ক। শরৎ বলবান, অবিনাশ রুগ্ন। শরৎ কোমল স্বভাব-সম্পন্ন, অবিনাশের রাগ অধিক। শরৎ মধুর স্বভাবের গুণে ঘাচা করিতে পারিবেন, অবিনাশ ক্রোধের ভয় দেখাইয়াও তাহা পারিতেন না।

কাহার মনে কি আছে, তাহা কেহই জানে না। শরৎচন্দ্র ভাবিতে জানেন, তাই দিন রাত্রি বসিয়া ভাবেন, কিন্তু কি ভাবেন, তাহা কে জানে ? ষোড়শবর্ষীয় বালকের মনে এত ভাবনা কেন, তাহা কে বলিতে পারে ? শরৎচন্দ্র সকল সময়েই ভাবিতেন, কিন্তু কি ভাবিতেন, তাহা প্রায়ই কাহারও নিকট খুলিয়া বলিতেন না।

অবিনাশচন্দ্র, শরৎচন্দ্রকে লইয়া তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলে।

তিনি বলিলেন—শরৎ ! বাছা, তুমি আর আমাদের ঘরে পা ফ্যালো না কেন ? অবিনাশকে যখন কোন দ্রব্য খেতে দিই, তখনই তোমার কথা মনে উঠে, আর মন দগ্ধে যায় । শরৎ ! নীরর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি ? সে যে এই কতক্ষণ তোমাকে খুঁজতেছিল !

শরৎচন্দ্র ।—না জেঠাই মা, নীরদার সঙ্গে আমার প্রায় ৫ ঘণ্টা দেখা নাই, সে কি আপনায় কাছে এসেছিল ?

মাতা ।—সে কি একবার ? আর না হলে দশ বারো বার এসেছিল । আমি তাকে দুই তিনবার কত বল্লম যে, আর দুদিন পরে তোর দাদা যখন কলিকাতায় যাবে, তখন তুই থাক্‌বি কেমন করে ? তাতে সে বলে উঠলো, ‘আমিও দাদার সঙ্গে যাব।’ শরৎ ! নীরদাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাদেরও ভাল বোধ হয় ; না হলে যে বারো দেশে যায়, সেটা যেন কেমন কেমন লাগে !

শরৎচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জেঠাই মা !—আমার কি সাধা ! আমার কি ইচ্ছা করেনা যে নীরদাকে আমার সঙ্গে রাখি । (স্বগত) ঈশ্বর করেন ত মনের সাধ মিটাব, নচেৎ দেশান্তরিত হয়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ।

অবিনাশ ।—আচ্ছা মা ! নীরদা ত কিছুই বোঝেনা ; এত অল্প বয়সে বিধবা হলো, আর একবার বিয়ে দিলে দোষ কি মা ?

মাতা ।—সাধ কি হয় না ? তবে কিনা লোকে মন্দ বলিবে, সেই ভয় করি । কপালে স্নুখ না থাক্‌লে বাছা কিছুতেই স্নুখ হয় না, কপালে স্নুখ না থাক্‌লে রাজরাণীও ভিকারিণী হয় ।

সন্ধ্যার সময় এই প্রকার কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে নীরদা আসিয়া বলিল—দাদা ! তুমি নাকি কাল কলিকাতায় যাবে ? তোমাকে বড় দাদা ডেকেছেন, চল, তিনি ব্যস্ত হয়েছেন ।

শরৎ ।—জেঠাই মা ! তবে শুনে আসিগে ।

মাতা ।—একটু শিগির করে এস বাছা ।

শরৎচন্দ্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন, অবিনাশচন্দ্র ও “দাদা আমিও আসি” বলে পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন ।



যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

উপায়হীন ।

শরৎচন্দ্র আগে আগে, (অবিনাশচন্দ্র পাছে পাছে) যাইয়া বড় বধুঠাকুরাণীর নিকট বলিলেন—বৌঠাকুরণ ! বড় দাদা আমাকে ডেকেছেন কেন, তা আপনি কিছু জানেন ?

বৌ-ঠা।—এই যে ঠাকুরপো ! এতক্ষণ আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ? আমুন, আজ আর আপনি বৈকালে কিছুই খান্নাই, জলখাবার খান এসে ।

শরৎচন্দ্র একটু বিস্মিত হইলেন ; মনে মনে ভাবিলেন, কেবল আজ কেন, বাবার মৃত্যুর পর ত একদিনও বৌ ঠাকুরণ এত আদর করেন নাই । ভীক্ষু দৃষ্টিতে অবিনাশের প্রতি কটাক্ষ করিলে, অবিনাশচন্দ্র কাণে কাণে বলিলেন, আজ বৈকালে বড় দাদা সকলকে বড় ভৎসনা করেছেন, তাই এত আদর । চল যাই খাই গিয়া ।

জলখাওয়া হইলে পর শরৎচন্দ্র এবং অবিনাশ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় দাদার নিকটে গেলে পর তিনি বলিলেন, শরৎ ! তোমাদের স্কুল খুলেছে, আর বাড়ী থেকে কাজ নাই, আগামী কল্য তোমরা কলিকাতায় রওনা হয়ে যাও । আগামী পরশ্বঃ রোজ আমি সকলকে লইয়া কার্যা স্থানে যাইব ।

শরৎচন্দ্র কিছুই বলিলেন না ; বড়দাদা পুনরপি বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া যাইব ।

শরৎচন্দ্র এবার বলিলেন—আর নীরদা ?

বড় দাদা।—নীরদাকে এবার আমার সহিতই লয়ে যাব, তার পর যা হয় হবে ।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, যে বড় বধু ঠাকুরাণীর কাছে নীরদা এক মুহূর্ত্তও থাকেনা, তিনিই নীরদার অবলম্বন হবেন ! বৌ ঠাকুরণ নীরদাকে দেখতে পারেন না কেন, তা বুঝিনা ; তা যাই হউক, এবার নীরদার ছঃখের সীমা রহিলনা । দেশে থাকিলে তবু যা হউক অবিনাশ ছিল, জেঠাইমা ছিলেন ; ছঃখের সময় তাঁহারা একটু

আদর কর্তেন ; এখন কষ্ট দিলেও উনি দিবেন, সুখে রাখলেও উনি রাখবেন । তা আমি আর কি করিব, কোন উপায় দেখিনা ।

এদিন গেল ; তারপরদিন কলিকাতায় নৌকা প্রেরিত হইবে, মহা ধুম ! লোকেরা জিনিস পত্র নৌকায় তুলিতে লাগিল । নীরদা মনে মনে জানিত, সেও শরতের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে । তাহার যেখানেই যা ছিল, সকল একত্র করিয়া মাঝীদের নিকট দিল ; মাঝীরা তিতরের কথা জানিত না, যা যা পাইল সকলই নৌকায় তুলিল ।

শরতের সঙ্গে ঘটনাক্রমে সহসা নীরদার দেখা হইল । শরৎচন্দ্র নীরদার প্রফুল্ল চিত্ত দেখিয়া বলিলেন—নীর, আমরা আজ কলিকাতায় যাইব, তাতে তোমায় এত আহ্লাদ কেন ?

নীরদা বলিল, আমিও যে যাব, তা তুমি কি জাননা ?

শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, নীরদার এই আশাই এত হর্ষের কারণ ; কিন্তু সকলই বৃথা ! হঠাৎ নীরদাকে বলিলে পাছে নীরদা কষ্ট পায়, তাই তাহাকে ও কথা আর কিছু না বলে, বলিলেন—নীর !—আমার চেয়ে বড় দাদা যে তোমাকে অধিক ভালবাসেন, তা কি তুমি জান না ?

নীরদা।—না দাদা, আমি তা জানিনা । আর কোন দাদার জন্তই আমার মন তত অস্থির হয় না ।

শরৎ ।—দেখ, বড় দাদা তোমাকে একদিনও ফেলে খান না । যেখানে যা পান, সকলি তোমার জন্ত নিয়ে আসেন । বড় দাদা তোমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসেন ।

নীরদা।—ভালবাসেন, তাতে কি দাদা ?

শরৎ ।—তা কিছু নয় ! তবে কি না, তুমি আমার সঙ্গে গেলে ত আর বড় দাদাকে দেখতে পাবে না ।

নীরদা ।—কেন দাদা, বড় দাদা যাবেন না ?

শরৎ ।—তিনি কলিকাতায় যাবেন না ; তিনি তাঁহার কার্য-স্থানে যাবেন ।

নীরদা ।—সে আবার কোথায় ?

শরৎ ।—তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে ?

নীরদা ।—না দাদা, তা যাব না ; আমি তোমার সঙ্গেই যাব ।

শরৎ ।—আর আমি যদি তোমাকে না নিয়ে যাই ?

নীরদা।—না নিয়ে যাও, কাঁদবে। তুমি আমার কায়া দেখলে কখনই রেখে যেতে পারবে না।

শরৎচন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, মনের ভাব গোপন করে বলিলেন, নীরদা! তুমি বড় দাদার সঙ্গেই এবার যাও, তার পর আমি আবার যখন বাড়ী আসব, তখন তোমাকে লয়ে যাব।

নীরদা।—না দাদা তা হবে না। আমি যাবই যাব। আর যদি তুমি আমাকে না নিয়ে যাও, তবে আমি জলে ঝাপ দেব।

এবার শরৎচন্দ্র ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, নীরদা, তোমার কপাল মন্দ, নাহলে আজ তুমি আমার সঙ্গেই বা যাবে কেন? নীর আর অমন কথা ব'ল না। তোমার মুখে অমন কথা শুনলে আমার মন অস্থির হয়। দেখ নীর! আমি যেখানে থাকি, সেখানে তুমি থাকবে কেমন করে? সে অতি ভয়ানক স্থান। মনে মনে ভাবিলেন, নীরদার কথা শুনলে মন অস্থির হয়। ইচ্ছা করে নীরদাকে সঙ্গে করে লয়ে যাই। কোথায় রাখব, সেই একটা ভাবনা। তা আমারও যা হবে, নীরদারও তাই। আমি যদি খেতে পাই, তবে নীরদাও পাবে, নয় আমার অংশই নীরদাকে ভাগ করে দেব। না—সে কষ্ট নীরদার সহ্য হবে না, নীরদা বালিকা। আমার সহিত থাকলে নীরদার মনটা একটু ভাল থাকবে, বটে, কিন্তু অল্প নানা প্রকার কষ্ট হবে। তবে আর নীরদাকে নিয়ে যেয়ে কাজ নাই, কিন্তু তা ত বলিলে শুনে না, তবে অবশেষে গোপনেই যেতে হলো। আমরা আজ রাত্রে যাবো, কাল সকালে নীরদা উঠে যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন নীরদার মন কেমন করবে? নীরদা ভাবিবে, 'দাদার মত নিষ্ঠুর আর নাই। তাতেই কি নীরদার মনের ক্ষোভ মিটিবে? কাল সমস্ত দিন আর নীরদা থাকবে না; সমস্ত দিন কাঁদবে?

নীরদা—দাদা, তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে সঙ্গে করে নিবে না?

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, নীরদার চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতেছে। শিশু-মাতৃহীন অনাথা নীরদার চক্ষে জল দেখিয়া শরৎচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে কত প্রকার দুঃখের কথা উঠিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বলিলেন, সে কথায় আজ কাজ কি নীর? আমরা ত আজ যাবো না, যখন যাব সে তখনকার কথা।

নীরদার চক্ষের জল নিবারণ করিবার জন্ত শরৎচন্দ্র প্রবঞ্চনা করিতেও

কুণ্ঠিত হইলেন না । যে নীরদার চক্ষের সামান্য জল পড়া দেখিতে শরৎচন্দ্র আজ অনিচ্ছুক হইলেন, সেই নীরদার চক্ষের জল কত দিন পড়িবে, কত কাল পড়িবে ! শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, নীরদার এ জল চিরকাল পড়িবে, তবুও আজ প্রবঞ্চনা দ্বারা সে জল নিবারণ করা উচিত । শরৎচন্দ্র সকলই ভাবিলেন, কিন্তু ভাবিলেন না যে অদ্যকার প্রবঞ্চনায় কল্যাণ নীরদার হৃৎকায়ো বৃদ্ধি হইবে । অথবা ভাবিলেও সে চক্ষের জল, সে হৃৎকায় শরৎচন্দ্র দেখিতে পাইবেন না !

রজনীযোগে উপায়হীন শরৎচন্দ্র অনাথা নীরদাকে রাখিয়া নৌকা খুলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন ।

পরদিন শরৎচন্দ্রের বাটীর অস্ত্রাশ্রয় সকলকে লইয়া শরতের বড় দাদা কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন । বাটীর দরজায় চাবি পড়িল । নীরদা বিবাদ-মাগরে মগ্ন হইল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

অনেক ঘটনা ।

তারপরের বৎসর অবিনাশ চন্দ্রও পড়িতে কলিকাতায় গমন করিলেন । শরৎচন্দ্র এবং অবিনাশ বৎসর অন্তর একবার কি ছইবার করিয়া বাটীতে আসিতেন । বিদ্যাবাসিনী একয়েক বৎসর পিত্রালয়েই রহিলেন । নীরদা সমস্ত বৎসরের কথা বিদ্যাবাসিনীকে বলিত, বিদ্যাবাসিনীর নিকট হইতে নীরদার স্মৃতি ও হৃৎকায় কাহিনী শরৎচন্দ্র বৎসরের শেষে একবার শুনিতে পাইতেন ।

এই রকম করিয়া ৭।৮ বৎসর চলিয়া গেল । প্রথম ছই তিন বৎসর নীরদার মনের হৃৎকায় কথা শরৎচন্দ্রের কাণে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু চতুর্থ বৎসর হইতেই একটু একটু করিয়া মনের কথা বাহির হইতে আরম্ভ হইল । এতদিন নীরদা কেবল বোঁঠাকুরদিগের কঠোর ব্যবহারেই অস্থির হইয়া ভাবিত, ‘আমার চেয়ে কষ্ট আর কাহারও নাই ;’ কিন্তু ক্রমে যেমন দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, এই রকম করিয়া তিন চারি বৎসর যাইতে লাগিল, তখন নীরদা বৃদ্ধিতে পারিল, এত দিন ভালই ছিলাম, এখন আর সস্থ হয় না । সস্থ হয় না, এই কথা নীরদা যখন বৃদ্ধিতে পারিল, তখন হইতে আর নীরদার কিছুই ভাল লাগিত না ।

সহ হয়না কখন ? শৈশব সময়ের মত স্নুথের সময় আর নাই । বালক বালিকাগণ সংসারের ভাল সেওয়ার মন্দ জানে না, ষাওয়া দাওয়া ব্যতীত তাহারা আর সংসারের ধার ধারে না । বুদ্ধ,—ঠাঁহাদেরও সহিতে সহিতে সহিয়া আইসে, অর্থাৎ রিপূর আধিপত্য তখন নিস্তেজ হয়, কাজেই সকল সহ হয় ! সহ হয় না কখন ? সহ হয়না—যখন রিপূর আধিপত্য প্রথর সূৰ্যের জ্বাল তীক্ষ্ণতর । মধ্যাহ্নে সূৰ্যের তেজ প্রথর, কাহারও সহ হয় না ; যৌবনে মানবের রিপূ প্রথর,—অসহনীয় । যৌবনে রিপূর দৌরাণ্ড্য,—দৈত্য সকল মানবকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূণ্য করিয়া দেয়, তাই সহ হয় না । যে সময় লোকের মুখে শুনা যায়—আর সহ হয় না, সেই তাহার যৌবন ; এমন সৰ্ব্বনেশে সময় আর জীবনের কোন অংশই নহে । শৈশবে নীরদাকে যে আশীর্ষিষে দংশন করিয়াছিল, এতদিন পরে সেই বিষের জ্বালা আরম্ভ হইল । জ্বালা আরম্ভ হইল, কিন্তু এ জ্বালার যাতনা জীবনে ধামিবে না, তাহা আজও নীরদা বুকিতে পারে নাই,—তাহা বুকিতে আরো সময় বাকী রহিল ।

কয়েক বৎসর পর সে সময়ও আসিল । যে ৭।৮ বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, সে সময়ে নীরদা সকলি বুকিতে পারিত । যে রজনীতে শরৎচন্দ্র নীরদাকে প্রবঞ্চনা করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের পর আর শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া নীরদার নিকট তাহার দুঃখের কথা শুনি-তেন না । বিদ্যাবাসিনী ঠাঁহার এ অভাব পূরণ করিতেন ।

নীরদার বয়স এখন ১৫।১৬ বৎসর । বিদ্যাবাসিনী বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ; জীলোকের স্নুথের সময় এক রকম কাটিয়া গিয়াছে । নীরদার দুঃখের প্রকৃত সময়ই এই । নীরদার মুখে হাসি নাই ; নীরদা বড় একটা কথা কয়না । খাইবার সময় হইলে দুটা খায়, শুইবার সময় হইলে শোয়, শুইলে নিদ্রা আসে না,—কেবল চিন্তা । নীরদা এখন জানিত, এখন বুকিত, এ চিন্তা চিরসম্বল ! নীরদার দুঃখ অসীম !

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে বিদ্যাবাসিনী ঠাঁহার নিকট যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে কেবল নীরদার দুঃখের কাহিনী থাকিত ।

দুই বৎসর হইল নীরদা আর বড়দাদার সঙ্গে যায় না । নিজের ভাল-মন্দ নিজেই বুঝে । ষণ্ডুর বাড়ী স্নুথের আলয়, আবার ষণ্ডুর বাড়ী দুঃখের আলয় । জীলোকের আশা ভরসা সকলই ষণ্ডুর বাড়ী হইতে ;

আবার সকল প্রকার নৈরাশ্রও ঐ এক স্থান হইতেই উৎপন্ন হয়। স্বামী থাকিলে ঋগুর বাড়ীর মত স্নেহের স্থান জগতে আর নাই, আর না থাকিলে অমন দুঃখের স্থান আর কোথায় ? নীরদা ভাবিল, যখন জীবনে আর প্রকৃত স্নেহ নাই, তবে বুধা বাহু স্নেহে কাজ কি ? এই ভাবিয়া এই দুঃখের আলসকে বাস-স্থান ঠিক করিয়া, ঋগুর বাড়ী আসিয়া আর যায় নাই । • তবুও ঋগুর আছে, শান্তুড়ী আছে, তবুও দেবর আছে ! যাহার পিতা মাতা নাই,—তাহার ঋগুর শান্তুড়ীর ন্যায় আরাধা দেবতা আর কোথায় ? আর যাহার পুত্র নাই, তাহার দেবরের ন্যায় স্নেহের পাত্র জগতে আর নাই !! নীরদা নিজের অবস্থা বুঝিয়াই ঋগুর বাড়ী ছাড়িয়া যায় নাই ।

নীরদার ঋগুর বাড়ী আর বিদ্যাবাসিনীর পিতৃালয় এক গ্রামে। এখন নীরদার সহিত বিদ্যাবাসিনীর প্রায়ই মেধা সাক্ষাৎ হইত। নীরদার দুঃখের কথা বিদ্যাবাসিনী শুনিতেন এবং সেই কথা শরৎচন্দ্রের নিকট কলিকাতায় লিখিতেন।

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া নামে স্কুলে পড়িতেন ; প্রধান কাজ ছিল পত্র লিখা এবং ক্রীড়া। লোকে ঠাট্টা করিয়া শরৎচন্দ্রকে ডাকাইত বলিত। পূর্বে, পূর্ববাগলায় এক প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন গ্রামে আছে ; কিন্তু বৃটীশ-শাসিত ভারত-মাদ্রাজের কোন সহরে এখন আর সে প্রকার খেলা প্রচলিত নাই, সে খেলা তরবারি সঙ্ক্রীয়। পূর্বে এই খেলার অনেক লোক মরিত, অনেক লোক ডাকাইত হইত ; অনেক লোক লাঠিয়াল হইত। শরৎচন্দ্র তরবারি (পাইক) খেলায় একজন বিশেষ পারদর্শী লোক ছিলেন ; তাহার সহিত খেলার কেহই জয় লাভ করিতে পারিত না।

অবিনাশচন্দ্র স্কুলে রীতিমত পড়িতেন, অবিনাশ ভাল ছাত্র। লোকে শরৎচন্দ্রকে মন্দ বলিত, অবিনাশকে ভাল বলিত, কিন্তু ইহারা দুইজনে অকৃত্রিম প্রণয়ে আবদ্ধ। অবিনাশচন্দ্র জানিতেন, তরবারি খেলায় শরৎের অদ্বিতীয় ক্ষমতা, তাহার তাহা নাই। শরৎচন্দ্র জানিতেন, লেখা পড়ায় অবিনাশ বিলক্ষণ পটু, তাহার সে ক্ষমতা অল্প। স্তুরাং কাহারও মনে অহঙ্কার বা আত্মাভিমান ছিল না ; দুই জনের প্রাণ, এক প্রাণ ছিল।

অবিনাশের মাতা এখনও ক্ষৌণ জীবন বহন করিতেছিলেন, অবিনাশের ভগ্নী এখনও জীবিত আছেন।

যে কথা বলিবার জন্ত এত কথার সূত্রপাত হইল, তাহা এ বৎসরের কথা । এ বৎসর শরৎচন্দ্রে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন । শরৎচন্দ্রের স্কুলের পড়া কেবল মাত্র একটা উপলক্ষ ছিল, এই বৎসরের শেষে শরৎচন্দ্রের বিড়ম্বনার শেষ হইল । শরৎচন্দ্রে জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে আসিলেন । অবিনাশ চন্দ্র কলিকাতাতেই থাকিতেন ।

স্বদেশে যাইয়া বিদ্যাবাসিনী এবং নীরদার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কারণ তাহারা স্থানান্তরে ছিল । সময়ে নীরদাকে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । বিদ্যাবাসিনী আসিলেন না ।

কিছুদিন পরে পরীক্ষার কুফল ফলিল । শরৎচন্দ্রে যেমন জানিতেন, তাহাই শুনিলেন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছেন । দেশশুদ্ধ লোকের শরতের গায়ে থু থু দিতে লাগিল, বিদ্যাবাসিনী ভয়ে কিছুই লেখেন নাই, নীরদা হুঃখিত হইয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করে নাই । শরৎচন্দ্রের মনে একটু হুঃখ হইল, ভাবনা আসিল, চিন্তার স্থান বিস্তীর্ণ হইল !! শরৎচন্দ্রে দিন রাত্রি ভাবিতেন ; লোকেরা ঠাট্টা করিত, তবু ভাবিতেন ; জীবনের ভাবী পরিণাম দিন রাত্রি জপ করিতেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

মন্ত্র পরিগ্রহ ।

বাল্যকাল হাসিতে খেলিতে চলিয়া যায় ; কোনও ভাবনা নাই, সংসারের কোন চিন্তা নাই, জীবনের ভাবী পরিণামের কথা হৃদয়ে স্থান পায় না, সদাই সুখ, সদাই আনন্দ !! হুঃখের ঘটনা ঘটিলে মন ক্ষণকালের জন্ত মেঘাচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে ? একদিন, দুই দিন, তারপর আর সে মেঘ থাকে না, তারপর আবার আমোদ, আবার ক্রীড়া কৌতুক । বাস্তবিক বালকের মত সুখী জীব আর নাই ।

তারপর ছাত্র—যাহারা স্কুলে অধ্যয়ন করে । স্কুলে অধ্যয়ন কালে ভাবনা আছে, সে ভাবনায় সুখ ভিন্ন হুঃখ নাই । যাহারা বিদ্যায় অমূল্য রত্ন বাছিয়া লইতে সক্ষম, তাহাদের শত ভাবনা থাকিলেও হুঃখ নাই । তবে হুঃখ

কোথার ? হুঃখ আছে সংসারে,—হুঃখ আছে সংসারের চিন্তায়,—হুঃখ আছে সংসারের অর্থে ।

শরৎচন্দ্রের সুখের সময় চলিয়া গেল ! শরৎচন্দ্র বিদ্যার তিমিরময় গর্ভ হইতে অমূল্য রত্ন বাছিয়া লইতে পারিলেন না, তাঁহার জীবনের সুখের সময় অভিবাহিত হইল । শরৎচন্দ্রের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল,—সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বে যে ভাবনা, শরৎচন্দ্রের মনে সেই দারুণ ভাবনা উপস্থিত হইল ।

লোক বড় হয় অনেক রকমে । কেহ পথ বাছিয়া বিনা কণ্টকাঘাতে উন্নতিতে আরোহণ করে, কেহ আঘাতে আঘাতে সতর্ক হইয়া উঠিতে থাকে, আর কেহ দৈববলে উঠিয়া যায় । কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য আর শিবজি, ইহারা, সকলে এক পথ অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করেন নাই । কেহ এ পথে, কেহ ও পথে । কেহ আঘাত পাইয়াছেন, কেহ আঘাত পান নাই, কেহ হঠাৎ উঠিয়াছেন । শরৎচন্দ্রের পথ অবলম্বন করিবার এই প্রথম আঘাত । এই সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল । এতদিন হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটিয়াছে, এখন প্রকৃত ভাবনার সময় । শরৎচন্দ্র যে দিন ফেল হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই ভাবিতে আরম্ভ করেন,—ভবিষ্যতে কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন । শরৎচন্দ্রের একদিকে সংসার—বিদ্যাবাসিনী—নীরদা—আত্মীয় পরিজন—সুখের স্বপ্ন ; অপর দিকে দেশ—দেশের হীনা-বস্থা—স্বীয় তরবারি শিক্ষা—বীরত্ব । একদিকে যশ, অপর দিকে নিন্দা । একদিকে সুখ, অপর দিকে চিরদুঃখ । শরৎচন্দ্র ভাবিতে বসিয়া দেখিলেন, একদিকে অর্থের চিন্তা—স্বার্থসিদ্ধির উপায়—অধীনতা—চির কলঙ্ক ; অপর দিকে অর্থ নাই, কেবল স্বার্থ-নাশ—কেবল স্বাধীনতা—কেবল বিমল স্বর্গ-সুখ ।

মহুয্যের মন দুর্বল, শরৎচন্দ্র আবার দেখিলেন,—আশা বলিয়া দিতেছে, “এই পথে আইস, দেখ কত লোক আসিতেছে, সুখ পাইবে, জীবন সার্থক হইবে ।” অপরদিকে নৈরাশ্র ভয় দেখাইতেছে,—“কোথায় বাইবে, কে থাকিতে দিবে, অর্থ কোথায়, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, অন্ধকার—হয় মৃত্যু, নয় মৃত্যু তুল্য যন্ত্রণা ।”

আবার মনের গতি ফিরিল, আবার ভাবিয়া দেখিলেন,—একদিকে অর্থ-চিন্তায় শরীর ও মনকে অর্জরিত করিতেছে, সুখ নাই—কলহ-বিবাদ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, পাপ-লিপ্সা ; অপর দিকে সাহস বলিয়া দিতেছে, ‘অর্থ চাই

না, মন প্রাণ দাও, স্বাধীনতা বা স্বৰ্গ-সুখের দ্বার অব্যাহত রহিয়াছে।' শরৎচন্দ্র ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না ।

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না, তথাপি ভাবনা ছাড়ে না ; ভাবনার আবার দেখায়, একদিকে বিদ্যাবাসিনী চিৎকার করিয়া ক্রন্দনের ধ্বনিতে গগন কাঁপাইতেছে, বলিতেছে, 'নাথ আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? আমি মরিব ; তোমা বিহনে সংসার জ্বাল ছিঁড়িব।' নীরদা বলিতেছে, 'দাদা ! আমার পৃথিবীতে আর কেহ নাই।' অপর দিকে ভীষণ সমর-ক্ষেত্র, তরবারি লইয়া যোদ্ধাগণ উৎসাহিত চিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।

আবার একদিকে,—অর্থের জন্ত পরপদ অর্চনা, পরপদে অঞ্জলি দান, সংসারের মনতুষ্টার্থ অর্থের সেবা ! শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, বিদ্যাবাসিনীও অর্থের জন্ত আমার দিকে ঝাকাইয়া রহিয়াছে। নীরদা কি ভাবিতেছে ? ভাবিতেছে, দাদার চাকুরি হইলে আমার কষ্ট যাইবে। বিদ্যাবাসিনী ভাবিতেছে, শরৎ যে দিন পরপদ অর্চনা করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় হটাকা আনিতে পারিবে, সে দিন আর আমাকে পিজালয়ের কষ্টে এবং আশ্রয়স্থানে দগ্ধ হইতে হইবেনা। এই অর্থ যদি না পাই, তাহা হইলে বিন্দু আমাকে পর ভাবিবে, নীরদা নৈরাশ হইবে, আমাকে খিকার দিবে। নচেৎ দর্শন যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে বিন্দু ও নীরদা আমার অহুসরণ করুক না কেন ! এক দিন আমিও মরিব, বিন্দুও মরিবে ; নীরদার অস্থি আর কতকাল পৃথিবীতে পড়িয়া ছিন্নভিন্ন হইবে ? তবে আমার সঙ্গে আশুক—নয় ভীষণ অন্ধকারে ডুবিব। তবে আর ওদিকে চাহিব না। শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, তবে সংসারের আশা ছাড়িয়া দিই। অর্থ অর্থ করিয়া পরপদ অর্চনার আশা মন হইতে দূর করি। সংসার যা'ক ! আত্মীয় পরিজন,—সুখের স্বপ্ন—দূর হউক। যদি তরবারি সহায় থাকে, যদি মন্ত্র সাধনার মর্শ্ব বুদ্ধিয়া থাকি, যদি আমার মন্ত্র পরিগ্রহ হইয়া থাকে, তবে যাই, যে দিকে প্রজ্জ্বলিত হত্যাশব-বৎ সমর ক্ষেত্রে যোদ্ধাগণ আনন্দে নৃত্য করেন ; তবে যাই, যে দিকে অর্থ নাই, অর্থের সাধনা নাই। সংসারে থাকিয়া কি করিব ? জীবনে সুখ থাকে, সুখী হব, দুঃখ থাকে, দুঃখে দিন কাটািব ; তবু পথ আবিষ্কৃত হইবে, যে পথে বঙ্গবাসীরা ভ্রমেও পদনিক্ষেপ করেন না, তবু সে পথে হাটিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইব।—তবে যাই, কিন্তু যাইবার পূর্বে বিদ্যাবাসিনীকে একখান পত্র লিখিয়া দেখি, বিন্দু আমার অহুসরণ করে কি না। না করে,

বুঝিব, বিন্দুর মুখের কথা বুঝা, মন সরল নহে ; বুঝিব, বিন্দু বাহা বলে, সকলই আমার মন রক্ষার্থ। তবে পত্র লিখি ; এই বলিয়া শরৎচন্দ্র পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন ;—

“প্রাণের বিন্দু, কতবার তোমাকে দেখিয়াছি, কিন্তু আবারও দেখিতে ইচ্ছা করে ; তোমাকে দেখিবার তৃষ্ণা আমার আর ষিটল না। এবারও দূরদেশ হইতে তোমাকে এবং নীরদাকে দেখিবার জন্ত আসিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তোমার দেখা পাইলাম না, তুমি দেখা দিলে না!! আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিল। তুমি তোমার পিতালয়ে সুখে আছ, থাকিতে পার, আমি সেখানে সুখ পাইনা ; যেখানে সুখ পাইনা, সেখানে যাইব কেন ? তুমি বলিবে, “মনে সুখ থাকিলে, সর্বত্রই সুখ মিলে।” আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের ওখানে গেলে আমার মনের সুখও চলিয়া যায়, তাই তোমাদের ওদেশে যাইয়া আর দেখা করিলাম না। আর দেখা করিবই বা কাহার সহিত ? তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভালবাস কিনা, তাহা কে জানে ? ভালবাসিলে আমার সহিত দেখা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইত না। সাধে কি আমি সমস্ত দিন তোমাদের বাড়ীর ঘাটে নৌকায় শুইয়া থাকি ? আমি তোমাকে দেখিবার জন্তই তোমাদের ওদেশে যাই, কিন্তু কোথায় তুমি ? সমস্ত দিন তোমাকে একবারও দেখি না, তুমি সমস্ত দিবসের মধ্যে একবারও আমার সহিত দেখা কর না। তুমি দেখা করনা কেন ? দেখা কর না—তুমি তোমার চিরাপ্রিত লজ্জাকে অধিক ভালবাস, তোমার দেশীয় সকলকে অধিক ভালবাস ; তাই আমার সহিত দিনের বেলায় দেখা করনা। সমস্ত দিন লজ্জা এবং আত্মীয় স্বজনের পূজার জন্ত রাখিয়া, রজনী যোগে শরৎ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কর !! অবগুষ্ঠনবতি ! আবার বল তুমি আমাকে অধিক ভালবাস ? ভালবাসিলে সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাইতাম, যে জন্ত এই দূরদেশ হইতে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া যাই, তাহা পূর্ণ হইত, কিন্তু তাত হয় না ? সাধে কি আমি নৌকায় যাই ! অজ্ঞ লোক দেখিতে হইলে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, চিরদিন দেখিলেও দেখিয়া শেষ করা যায় না ; অজ্ঞ লোকের সহিত দেখা করিতে আমি তোমাদের ওদেশে যাইব কেন ? যেখানে যাই, সেই খানেই অজ্ঞ লোক পাই—পাইনা কেবল বিদ্যাবাসিনীকে। বিন্দু ! তোমাকে দেখিবার জন্তই

তোমাদের দেশে যাই, কিন্তু তুমি লজ্জাপ্রযুক্ত দেখা দাও না, মনোহুঃখে রজনী প্রভাত হয়, মনোহুঃখে নৌকায় দিন কাটাই। যে পর্য্যন্ত তোমার এই লজ্জা থাকিবে; বতদিন পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা তোমার লজ্জাকে অধিক ভালবাসিবে, ততদিন আর তোমাদের ওখানে যাইয়া দেখা করিব না।

আর একটা কথা, তোমার কষ্টে আমি যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি; এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করে, হয় তোমাকে লইয়া থাকি, নয় মনের বাসনা পূরাই। এখন আর মনের কথা গোপন করিতে অভিলাষ নাই। ছোট বেলা হইতে,—বিন্দু স্মরণ করিয়া দেখ, যখন কলিকাতায় স্কুলে পড়িতে যাইতাম, তখন হইতে মনে একটা বাসনা ছিল, সেই বাসনাকে এতদিন জুড়য়ে পোষণ করিয়াছি। এখন হয় সেই বাসনা চরিতার্থ করিব, নচেৎ তোমাকে লইয়া সংসারে প্রবেশ করিব, বিড়ম্বনার জাল বিস্তৃত করিব। বিন্দু! তোমার উত্তর চাই। একদিকে তুমি, নীরদা, সংসার; অপরদিকে—দেশ, ভীষণ সময় ক্ষেত্র—মৃত্যু! এখন বল ত বিন্দু, কোন্ পথে যাইব? তুমি যদি আমার সহিত যাইতে পার, তাহা অপেক্ষা আর সুখের কিছুই নাই; তাহা হইলে চল এখনই শরীর মন দেশের জন্ত বিসর্জন দি। বিন্দু! হুঃখিনি! ভয় পাইও না। আমি কাপুরুষ নহি; আমি তোমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য আসি নাই। মনের কথা এতদিন এই জন্তই গোপন করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তোমার মন সবল হইলে তারপর বলিব; আর প্রতীক্ষার সময় নাই; তাই বলিলাম, প্রিয়ে! ভয় পাইও না। আবার সংক্ষেপে বলি, আমার যুক্তবিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিলাষ আছে; তোমার বাধা না থাকিলে লিখিও; শীঘ্র উত্তর লিখিও। তবে আজ বিদায় হই।”

মধুপুর,
২৫এ চৈত্র।

তোমারই
শরৎ।

পত্রখানি ডাকযোগে বিক্র্যবাসিনীর নিকট প্রেরিত হইল; শরৎচন্দ্র উত্তর পাইবার আশায় বাটীতেই রহিলেন। বাটীতে থাকিয়া থাকিয়া মনকে আরো দৃঢ় করিবেন। পাষণে মন বাধিয়া জীবনের সার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন;—“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

বিক্ষ্যবাসিনীর

বিক্ষ্যবাসিনী যখন শরৎচন্দ্রের পত্র পাঠ্যে পড়িয়াছিলেন, তঁহার মন কি প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ; তঁহার পত্রখানি অবিকল এই স্থানে সরিবেশিয়াই রাখিয়াছি।

হুঃখিনী বিন্দুর জীবন—

হর্ষে তোমার পত্রের কথা পড়িয়াছিলাম, তুমি পত্রটিতে পড়িতেই হর্ষ চলিয়া গেল ; ঘোর বিবাদ সম্বন্ধে তুমি হুঃখিনী বলিয়া তোমার পত্র খুলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বিবাদে তোমার পত্র আমাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল। আমার মনে তোমার পত্রের কথা, তাহাও আজ ফুরাইল ; হুঃখিনী আজ নৈরাশ সাধুস্বামী।

প্রাণের শরৎ,—এই পত্রখানি পড়িয়া তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিলে, শুনিয়া আমরা কত দুঃখিত হইলাম ! মনকে প্রবেশ দিতে চেষ্টা করিলাম, তা হইল—তোমার মনের কথা শরৎ ! আমি কাঁদিতে জন্মেছি, আমার আবার কি হইবে ?

শরৎ ! তোমার পত্রখানি পড়িয়া হুঃখিনী সরেনা। তুমি আমাকে এই সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ ? আশৈশব আমি সমুদ্রে ভাসিতেছি—আমি কি উপায় করিব ? তুমি কি আমার উপায় করিবে না ? কুল কি পাইব ? আমার পদসেবা করিবে না ? শরৎ ! তোমার পদসেবা কি আমার পদসেবা ? তুমি কত দিন আর এই প্রকার গুণিত অবস্থার পিছু পিছু থাকিবে ? আমার কত দিন সমুদ্রে ভাসিব ? * * * *

শরৎ ! তোমার পত্রখানি পড়িয়াছি—তুমি কোথায় ? বিক্ষ্যবাসিনীর নয়কোণে তুমি কোথায় ? তুমি দেখিলে, তোমার প্রাণ কেটে যেতো, আজ আশৈশব তুমি জলে সমস্ত শরীর দিলে ; কিন্তু তুমি দেখিলে না, আমার পদসেবা তুমি কত দিন শরৎ করিয়াছিলাম, সেই আশৈশব তুমি প্রাণ কি প্রকার ছট্‌ফট্ করিতেছে !!

আজ আমার মনে সুখ নাই, জীবনের সুখ নাই—আজ আমার জীব-

নের সুখ বিদায় দিলাম, অদৃষ্টের লেখা কে ধ্বংস করিবে ? আমি এত দিন কুহকিনী সুখ-স্বপ্নের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতাম—‘অদৃষ্ট কি’— আজ সে স্বপ্ন ভাঙিল ; অদৃষ্টের ছুঃখ ষাড় পাতিনা মন্তকে লইলাম !

আমি অনেক কঁাদিলাম, হয়ত তুমি হাসিবে, আমাকে পাগল বলিবে । যাহাই বল, আমার মনের কয়েকটা কথা আজ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, বিরক্ত হইয়া থাকি হইয়া তোমার একমাত্র মধুর পত্র লেখাও ক্ষান্ত করিলাম । আমার আশা কি ? আমি ছুঃখ-নীরে ঝাঁপ দিয়াছি, চিরদিন ভাবিলাম তোমার মায়া, তাহার আবার শিশিরের ভয় কি ? বাল্যকাল হইতেই তোমার একবার ভরল-পীড়নে ডুবিতেছি, আবার ভাসিতেছি, এবার আমার মন কি তুমি তার ভয় কি ?

শরৎ ! মনকে প্রকাশ করি, মন প্রবোধ মানে না । কত আশা-প্রবোধ বাক্যে মনকে প্রবোধ দিয়া মন বুঝে না । অবলাবালায় দোষ কি নাথ ! মনকে প্রবোধ দিতে পারি না ; তুমি শিখালে না কেন ? আমার ছুঃখ কে বুঝিবে ? আমাকে পাগল বলিবে, বল ; নিশ্চয় জানিও, কিছুদিন পরে তোমার মনকে প্রবোধ দিবে ।

তুমি অনাথা বিদ্যাবাসিনী, তোমার মনকে হাসাইতে যাইবে, ষাও, বিন্দু বারণ করে না । একদিন তোমার বিদ্যাবাসিনী কঁাদিবে— আমার এই সমস্ত দেশ প্রকাশে হাসিবে, মনকে প্রবোধ দিবে কেন ? তুমি সংসারকে হাসাও, বিন্দুর ভাগ্যে যাহা হইবে তাই হইবে ! বিদ্যাবাসিনীর নির্জন বিলাপধ্বনি কি দেবতাদিগের মনকে প্রবোধ দিবে ?

জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা ত সকলেই জানে । মনের মুতুতে লোকে এত ছুঃখ প্রকাশ করে কেন ? মনকে প্রবোধ দিবে কিছুই নহে, যে ক্রন্দন করে, সেও একদিন এই ছুঃখের মত পলায়ন করিবে । আমিও মরিব, হয় আজ—নয় কাল পরে । আমি কেন ? মন বুঝে না । পীড়ার মুতু হইলে তত ছুঃখ প্রকাশ করিতে মনে একটা খেদ থাকে, আমি আরো উহাকে দেখিলাম । মনকে প্রবোধ দিবে বিবে পুড়িয়া ছারখার হয় ।

তুমি অথবা আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আমাকে প্রবোধ দিবে বিসজ্জন দিলাম । আজ হতে অবগুষ্ঠন ত্যাগ করিলাম । মনকে প্রবোধ দিবে আমাকে চরণ থেকে ঠেলিবে ? তুমি আমাকে প্রবোধ দিবে ?

কর, আমি তোমার অহুসরণ করিব। না পারি মরিব, তবুও আর কষ্ট সহ করিব না।

শরৎ ! তুমি কি জান না, বিন্দু তোমা ভিন্ন আর কিছু জানে না। আমার হুঃখ, সুখ সকলই তুমি ! আমি সুখী হইলেও তোমার প্রসাদে হইব, দুঃখী হইলেও তোমার দ্বারাই ! আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। বিন্দুর ক্ষমতা কি নাথ ! তোমাকে সুখী করিবার আমার সাধ্য নাই, দুঃখী করিবারও সাধ্য নাই। শরৎ ! বিন্দু তোমাকে কখনই কাপুরুষ মনে করে না। আমি তোমাকে কখনই দোষ দিব না—দোষ আমার—দোষ আমার অদৃষ্টের !

আমি শৈশব হইতে এই বিশ বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃলাভের দ্বারে দ্বারে অনা-ধিনীর স্নায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সেও আমার দোষ ; তোমার ক্ষমতা থাকিতেও আমাকে এই সমুদ্রে ভাসাইয়া পতিত দেশকে উদ্ধার করিতে যাইবে, সেও আমার অদৃষ্টের দোষ। নাথ ! তোমার কি দোষ ! আমার অদৃষ্টের দোষ না হইলে ঘাহার গর্ভে দশ মাস দশ দিন অবস্থিতি করিয়া ছিলাম ; তারপর ক্ষুধায় অস্থির হইলে সন্মুখের আহার পরিত্যাগ করিয়া যে গর্ভধারিণী স্তম্ভ-পান করাইয়া আমাকে স্নহ করিতেন, তিনিও (আমি অসহারা) আমাকে সমুদ্রে ভাসিতে দেখিয়া, দূর করিয়া দিতে চাহেন ! এ দোষ কাহার নাথ ! আমার কপাল মন্দ,—আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা !!

শরৎ ! তোমাকে পাইয়াও আমি তব সহবাস-অনিত সুখ ভোগে বঞ্চিত ; হয়ত চিরবঞ্চিত হইতে বসিয়াছি, এ হুঃখ কাহাকে জানাইব ? কে বলিবে ? আমি কোথায় যাইব ?—এ পৃথিবী আজ শূন্যময় দেখিতেছি,—সকলই অন্ধ-কারবৎ বোধ হইতেছে। বিধাত ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! আমি বলিয়া থাকি, নীরদা এবং স্নশীলা * আমা হইতেও দুঃখিনী। এত দিন তাহাদিগের দিকে চাহিয়াই জীবিত ছিলাম, কেননা নীরদার পতি নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, স্নশীলার পতি নাই, মাতা নাই ; তাহারা তব মনকে প্রবোধ দিতে পারে—‘এমৎসার হইতে তাঁহারা বিদায় লইয়াছে,’ তাহারা তাই বলিয়া কাঁদে। আমি কি বলিয়া কাঁদিব ; আমার পিতা, মাতা, তুমি, সকলই জীবিত, তবে আমার হুঃখ কেন ?

* স্নশীলা বিদ্যাবাসিনীর মাতৃহীনা বিধবা ভগিনী ; শরৎচন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ।

তোমার পত্রে আর একটা কথা পড়িয়া আমি ঝরঝর নাই ব্যথিত হইয়াছি, তুমি লিখিয়াছ, আমি পিত্রালয়ে স্নেহে থাকি ; পিত্রালয়ে থাকিয়া স্নেহ পাইলে সুনীলা মধুপুরে পতিশূল-গৃহে গিয়াছে কেন ? পিত্রালয়ে স্নেহ থাকিলে, মাতৃহীনা অনাথা নীরদা মধুপুর ছাড়িয়া তাহার পতিশূল স্বত্তরালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে কেন ? পিত্রালয়ে স্নেহ থাকিলে, সৌদামিনী * মধুপুরে থাকে না কেন ? যদি কেহ বলে পিত্রালয়ে স্নেহ আছে, সে আমার মত পিত্রালয়ে বাস করুক, বৃষ্টিতে পারিবে পিত্রালয়ে কি স্নেহ ! যে স্থানে তুমি এক মুহূর্ত্তও স্নেহ পাওনা, আমি সেই স্থানে অহঃরহঃ, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর বাস করিতেছি । আমার মনে একটা আশা ছিল, একটা ভরসা ছিল, সেই আশার পানে তাকাইয়াই আজিও জীবিতা রহিয়াছি । শরৎ ! তুমি কি আমাকে সেই আশা হইতে বঞ্চিত করিবে ?

আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, তাতে মনে কিছু ভেব না । তুমি আমার মনে যে কষ্ট-দিয়াছ—আমিই তাহা বৃষ্টিতেছি—মনে রাখিও, আমাকে ভুলিও না ।

পুং আজ তোমার সঙ্গে বাইতে পারিলে, আমার মনে ক্ষোভ থাকিত না ; কিন্তু ভয় হয়, বিষাদ হয় ?

তোমারি

চির-ছঃধিনী—বিন্দু

দশম পরিচ্ছেদ ।

উপদেশ ।

শরৎচন্দ্র বাটীতে একা ছিলেন ; সম্প্রতি নীরদা আসিয়াছে । অবিনাশের মাতা রক্ষিয়া দেন, শরৎচন্দ্র আহার করেন । নীরদার পাক নীরদা আপনি করিয়া লয় ! বালিকা নীরদা এখন বুদ্ধিমতী, না বুঝে এমন কিছুই নাই । সমস্ত দিন শরৎচন্দ্র কেবল নীরদার সহিত কথাবার্তার সময় কাটাইতেন । নীরদার মনে যে সকল সন্দেহ ছিল, সে সকল এই সময়ে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন ।

* শরৎচন্দ্রের একটা ঘুর সম্পর্কীয়া ভগিনী ।

বিদ্যাবাসিনীর নিকট পত্র লেখার পর, আর শরৎচন্দ্রের কোন বিষয় ভাল লাগিত না ; সকল সময়ই প্রায় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আর যখন অন্তমনস্ক থাকিতেন, তখন নীরদাকে বুঝাইতেন ।

এ দিনটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হইল। মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিল, ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। শরৎচন্দ্র চিন্তা করিবার সময় ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেন না, ঘরে বসিয়া ভাবিলে নীরদা আসিয়া বিরক্ত করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি নিঃস্বপ্ন স্থানে যাইয়া ভাবিতেন। আজ আর যাওয়া হইল না। বৃষ্টি ছিট্ ছিট্ পড়িতে পড়িতে ক্রমে ধারাবহী হইয়া পড়িতে লাগিল, শরৎচন্দ্র স্থানান্তরে যাইবার বাসনা ছাড়িলেন। ক্ষণকাল পরে নীরদা আসিয়া উপস্থিত হইল।

শরৎচন্দ্রের পাশে নীরদা উপবিষ্টা, শরৎচন্দ্র একটু অন্তমনস্ক, কি যেন ভাবিতেছিলেন—নীরদা ডাকিল—‘দাদা !’

শরৎচন্দ্র চমকিয়া বলিলেন ’—কি নীর ?—

নীরদা ! আপনি সে দিন আমাকে বুঝাইতে বুঝাইতে উঠিয়া গেলেন, আজ সেই বাকী অংশটা বলিয়া দিন ?—

শরৎ। সেই বাকী অংশটা কি, তা ত আমার স্মরণ নাই ; তোমাকে কোন বিষয় বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া দেও, বুঝাইতেছি।

নীরদা। মন ঠিক থাকে না কেন ? আপনি বলিয়াছিলেন, আমার জীবনের সুখ, দুঃখ এ সকলই ঈশ্বর হতে। যদি কখনও সুখী হই, তাহাও ঈশ্বরের সেবার, আর তা না হলে বুঝিব, আমার মন সংসারে লিপ্ত ; তা ত বেশ বুঝেছি। আপনি বলেছেন, দিন রাত্রি সেই একমাত্র অনাথস্মরণ দীনবন্ধুকে ডাকিও, তিনি তোমার মন ঠিক রাখিবেন। তা কই দাদা, আমি ত প্রত্যহ ভীক্তি, প্রত্যহ তাঁহাকে মন দিবার অন্ত প্রস্তুত থাকি, তা পোড়া মন সংসার ভুলিয়া ক্ষণকালও থাকিতে চায় না। রাত্রে যখন নিঃস্বপ্নে দীনবন্ধুকে ডাকিব, তখনও নানা প্রকার সংসারের চিন্তা, সংসারের ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়, মনকে আজও ঠিক করিতে পারিলাম না, মন ঠিক হয় না কেন দাদা ? এর উপায় কি ?

শরৎ। নীর ! ব্যস্ত হওনা। প্রার্থনার অঙ্গ ভক্তি, বিশ্বাস, বিনয় আর ধৈর্য, এই করণা অঙ্গ ঠিক থাকিলে তবে প্রার্থনা সফল হয়। কেবল ভক্তি থাকিলে হয় না ; কেবল বিশ্বাস থাকিলে হয় না, কেবল বিনয় থাকিলে হয়

না ; আরও কিছু চাই—সেটা ধৈর্য্য । তুমি ছ দিন না বেতে যেতেই মন ঠিক হলো না বলে চঞ্চল হয়েছ ?—কত সাধক চিরকাল যোগ, ধ্যান করেও তবু মনকে সম্পূর্ণ ঠিক রাখিতে পারেন নাহি । যে সংসারে শৈশব হইতে এই পর্যন্ত নিমজ্জিতা হইয়া রহিয়াছ, সে সংসারকে সহসা ভুলিতে পারিবে, এমন আশা করিও না । আবার নৈরাশও হইও না, আজ না হয় কাল হবে, কাল না হয়, তার পর দিন হবে, নয় পর মাসে হবে, নয় পর বৎসরে হবে নয় মৃত্যু সময়ে হবে । তবু হবেই, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিও । প্রার্থনার অর্থ কি ? নীর তা জাননা । সত্য সত্য ঈশ্বরই কি আসিয়া মনকে সবল করিয়া দেন ? না নীর, এ বিশ্বাস করিও না । প্রার্থনা শুনিগেন যিনি, তিনি ঈশ্বর ; আর প্রার্থনার ফল যাহা হইতে হইল, তিনি মানব ! প্রার্থনার যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা এই—“মন শত শত বার পাপ-পঙ্কে নিপতিত হইলেও প্রার্থনা আবার সে মনকে সবল করে—আবার উদ্ধার করে । আজ প্রার্থনা করিলাম—প্রার্থনার পরেই আবার পাপ করিলাম, মনে অমৃত্যু তাপ হইল, তার পরদিন আবার প্রার্থনা করিলাম ; এই প্রকার হটলে মন কখনই সবল হইবে না । একটু চেষ্টা চাই, একটু ইচ্ছা চাই । আজ পাপ করিলাম—আর কাল বাহাতে না করি, সে ইচ্ছা, সে চেষ্টা মানবের ! ঈশ্বর সে চেষ্টা করেন না ! প্রার্থনার গুণ এই, পাপ হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা, চেষ্টা, এবং শক্তি, প্রার্থনা হতেই পাওয়া যায় । প্রার্থনাই মনকে সবল করে । কিন্তু নীর, ধৈর্য্য চাই । সংসারে পাপের স্রোত এত প্রবল, সংসারের আকর্ষণ শক্তি এমন প্রবল যে, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেও, সেই স্রোত মানুষকে টানিয়া লয় । আমি তুমি কোন্ ছার ! প্রার্থনা কর—বিশ্বাস কর যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ধৈর্য্য ধর যে সহসা মন বিচলিত না হয় ; দেখিবে, অসাধ্য যাহা, তাহাও সাধিত হইয়া আসিবে । আজ যাহা পাইতেছ না, সময়ে তাহাই অভ্যাস হইয়া আসিবে, আর মন এ দিক সে দিক যাইবে না । চিন্তার সময়, ভাবনার সময়, ধ্যান আরাধনার সময়, পাপের সংসার কোথায় যাইবে, আর খুজিয়াও পাইবে না ।

নীরদার মুখ গভীর ভাব ধারণ করিল, কাতর-স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল ;—দাদা ! আপনার নিকট এই কথা গুলি শুনে মন শান্ত হলো । অস্থির মনে কিছুই ঠিক পাই না, চতুর্দিক অন্ধকার দেখি । আপনার নিকটে থাকিলে মন স্থস্থ থাকে । আপনি আর কত দিন বাড়ী আছেন ?

এই সময়ে পত্র বাহক একখানি পত্র আনিয়া শরৎচন্দ্রের হাতে দিল ; শরৎচন্দ্র পত্রখানি দেখিয়াই বিন্দুবাসিনীর পত্র বুঝিতে পারিলেন । উৎসুক মনে পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেন । নীরদা দুই একবার পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতে অমুরোধ করিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র শুনাইলেন না । পত্রখানি সমাধা হইল—শরৎচন্দ্রের মনে গাঢ় চিন্তা উপস্থিত হইল । ক্ষণকাল পরে নীরদা সে স্থান হইতে অগ্রমনস্ক হইয়া উঠিয়া গেল ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

মস্ত্রের সাধনা ।

ঘাত, প্রতিঘাত, মানব-হৃদয়-বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ । আমরা এতক্ষণ পরে যে অধ্যায়ের অবতারণা করিতে বসিয়াছি, ইহা তাহার একটা দৃষ্টান্ত । হৃদয় সংসারতাড়নায় মানব-চরিত্রে প্রতিনিয়ত ঘেঁষাঘাত প্রতিঘাত হইতেছে, তাহা পাঠে নীতি শিক্ষার সহায়তা করে কি না, আমরা সে বিষয়ের আলোচনা এ স্থলে করিব না । যাহারা সমালোচক, তাহারা সে বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতে থাকুন ; আমরা মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব । আমাদের অল্প আন্দোলনে কাজ কি ?

সহানুভূতি, সহৃদয়তা, পরদুঃখ-কাতরতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, এ সকল উৎকৃষ্ট সামাজিকের অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ । যেখানে সমাজ, সেইখানেই অস্ত্রের ছাখে মন গলিয়া যায়, সেইখানেই অস্ত্রের রোদনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় । আর যেখানে রাজনীতি, সেখানে কঠোরতা, সদা কপটতা । রাজনীতি মনের সকল সংস্কৃতিকে সমূলেই নষ্ট করিয়া ফেলে, সহস্র জননেও রাজনীতিজ্ঞের মন বিচলিত হয় না ।

আবার সেই পূর্ব অধ্যায়ের কথা । শরৎচন্দ্রের হাতে বিন্দুবাসিনীর পত্র । শরৎচন্দ্র সমস্ত দিন বিষণ্ণভাবে ভাবিয়াছেন—বিন্দুর অদৃষ্ট এবং আপনীর পরিণাম ; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই । শরৎচন্দ্র কেবল সামাজিক লোক হইলে বিন্দুর বিলাপে গালিয়া যাইতেন, আবার কেবল

রাজনীতিজ্ঞ হইলে, বিন্দুর কথায় কর্ণপাত না করিয়াই স্বীয় মন্ত্র-সাধনার পথে অগ্রসর হইতেন। শরৎচন্দ্র সামাজিকও নহেন, রাজনীতিজ্ঞও নহেন, অথচ, তাঁহাতে এ দুইয়ের অভাব নাই। চিন্তা ও ভাবনা, ঘাত ও প্রতিঘাত, অভাব এই সময়ে অসম্ভব নহে।

শরৎচন্দ্রের মনৈ যখন বিন্দুর পত্রের প্রত্যেক কথা উঠিতে লাগিল, তখন ভাবিলেন, অসহায় বিন্দুকে সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া ধাইব না। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িতে লাগিল, চিরকালের বাসনা এবং জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়, তখনই হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। তখনই মনে হইতে লাগিল, “বিন্দু ভাসিতেছে, ভাসুক”—আমার বাসনা আমি পূরাইব। একটা কথা অবলম্বন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সহস্র সহস্র ভাবনার পথ আবিষ্কার হইতে লাগিল, ভাবিতে লাগিলেন,—

“যদি জানিতাম স্বিহা দাসত্ব, তবে কখনই বিবাহ করিতাম না ; বিবাহ করিতাম না, চিরকাল মনের বাসনা চরিতার্থ করিতাম। সংসারের যে কণ্টকে মনের বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় না, সে কণ্টক পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন ? আর বিন্দু ? বিন্দু জন্মেছে কাঁদিতে,—মরিবে কাঁদিয়া ; সে জন্ম আমার জীবন উৎসর্গ করিব কেন ? উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা বিবাহের সময় জানিতাম না ; জানিলে কোন্ পাপিষ্ঠ ইচ্ছা করিয়া ফাঁদে পা ফেলিত ? আর কোন্ মুঢ়ই বা সংসারের আশ্রয় লইত ? বিন্দু আমার অল্প কাঁদে কেন ? তাহাকে কে জানিত ? ‘আমি তাহার,’ এ কথার সূত্রপাত কে করিল ? বিবাহ কাহাকে বলে, জানি না। যদি জানিতাম, অজানিত বিষপান বিবাহ ;—যদি জানিতাম, লুকায়িত ব্যাধের ফাঁদ বিবাহ, যদি জানিতাম, মন বাসনা পূর্ণ করিবার দারুণ কণ্টক বিবাহ, তবে যে মুহূর্ত্তে বিবাহের কথা কর্ণে প্রবেশ করাইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে আত্মঘাতী হইতাম ! কিন্তু তখন জানি নাই, বিবাহ কি !! তখন শৈশব সময়, সংসার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এই অপরিজ্ঞাত পিঞ্জরে যখন প্রবেশ করি, তখন কিছুই জানিতাম না। ভুলাইয়া আত্মীয় পরিজন এই সর্পবিবরে আমাকে পাঠাইয়াছেন, আর এখন কাল-সর্পদংশনে প্রাণ যার ? হায় আজ কোথায় আত্মীয় পরিজন, কোথায় স্বার্থপর সংসার ?

“না বুঝিয়া কুকার্য করিয়াছি, না বুঝিয়া ফাঁদে পা দিয়াছি, না বুঝিয়া সর্প-বিবরে আসিয়াছি, এখন আমার ক্ষমতা থাকে, আমি অবশ্র রক্ষা

পাইব। সংসার হাঙ্গ, হাঙ্গুক ; নির্লজ্জ স্বার্থপর সংসার মন্দ বলে, বলুক ; কি ভয় ? নিরপরাধিনী বিন্দুর উপায় কি হইবে ? তাহা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! তা আমি কি করিব ; সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা সহজ কথা নহে। পারিব না ; তা প্রাণান্তেও করিব না ; আমি নিশ্চয় জানি পাপের ভাগী আমি হইব না ।

“বিন্দু ! যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, আমি কি করিব ? আমার ক্ষমতা নাই। আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। তোমার জন্ত উৎসৃষ্ট জীবন কাড়িয়া লইতে পারি না। আগে জানিলে তোমাকে ভাল বাসিতাম না ! !

“কত বার বিন্দুকে বুঝাইলাম, সংসারের সূত্র ছুঁই কিছই নহে, কেবল মনের ভাব ; তা বুঝিয়াও সে বুঝে না ! এত দিন বুঝিল না ; নিশ্চয় আর বুঝিবে না। না বুঝিলে, আমি আর তার কি করিব ? এক ক্ষমতা আছে, মরিতে পারি। মরিতে পারি, তবু বিন্দুর সূত্রের জন্ত অর্থের অধেষণে পর-পাছকা মস্তকে বহন করিতে পারি না। মরিলে বিন্দুরও সূত্র হইবে না ; আমার জীবনের উদ্দেশ্য মুকুলেই বিনষ্ট হইবে ; তবে মরিব কার জন্ত ?”

শরৎচন্দ্র আবার ভাবিলেন—“ভাবিয়াছিলাম, আমার জীবনে এই শুভ সময়ে, বিন্দু আমাকে বাধা দিবে না। মনুষ্যের মনে আশাই একমাত্র অবলম্বন। মনুষ্যের মনে যে ভ্রম, এ প্রকার ভ্রম আর কোথাও নাই। বিন্দুকে কত কথা বলি তাম, কত উপদেশ দিতাম, কত দৃষ্টান্ত দেখাইতাম, বঙ্গীয় নারীগণের চরিত্র আলোচনা করিবার ছলনে কত কথা বলিতাম ; ভাবিতাম, আমার আশা চরিতার্থ করিবার সময় বিন্দু আমাকে বাধা দিবে না। এই আশায় এত দিন আহ্লাদে ছিলাম ; অহো দুর্ভাগ্য ! কি বিড়ম্বনা !”

“বিন্দু আমাকে বাধা দিল ; তবে আমার আর মমতা কি ? তবে যাই ! সংসার—থাকুক। আত্মীয় পরিজন, আশীর্বাদ করি, সূত্রে থাক ; যদি আমার প্রত্যাশা করিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও। নীরদা, তোমার সূত্রই বা কি, ছুঁই বা কি ? তোমার হুই সমান। আমার জীবন ছুঁই মম ! যদি বুঝিতাম, আমার দ্বারা তোমার ছুঁই মোচন হইতে পারে, তাহা হইলে আমি বাইতাম না ; কিন্তু ভয়ি ! তাহা হইবে না। যদি বুঝিয়া থাক, আশা করিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও। তুমি ছুঁইয়ের কীট—ছুঁই তোমার সূত্র। নীর ! বুধা সূত্র আশা করিও না ! আমাকে বিদায় দেও !”

এই বার শরৎচন্দ্রের নমন হইতে জল পড়িল ; শরৎচন্দ্রের সংসার

নীরদার মত্ত ভালবাসার আর কেহই ছিল না ; সেই নীরদাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল !

রজনী তৃতীয় প্রহর, গ্রামের কোলাহল অনেকক্ষণ থামিয়াছে, পশু পক্ষী সকলই নীরব, জ্যোৎস্না আর নাই, পঞ্চমীর চাঁদ অন্তমিত ! শিশির বিন্দু বিন্দু পড়িয়া দুর্কাদল সকল সিক্ত করিয়াছে, পুকুরে মৎস্তগণ দুই এক বার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে । শরৎচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সময়, একটা কুকুর এক বার ডাকিতে ডাকিতে শরৎচন্দ্রের নিকটে আসিয়াই যেন কি ভাবিয়া নীরবে ফিরিয়া গেল । পুকুরের ধারে একা শরৎচন্দ্র ! শরৎচন্দ্রের মন উত্তেজিত ; শরৎচন্দ্র ভাবিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন,—“তবে অদ্যই যাই । মন ঠিক করিয়াছি, তবে আর মায়া বাড়াইয়া প্রয়োজন কি ; মধুপুর ! তবে আজ বিদায় হই ! যদি কখনও এমুখ প্রসন্ন হয় ; তবে আবার আসিব । জন্মভূমি ! প্রসন্নচিত্তে আজ বিদায় দাও !”

শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এক খানি ধূতি পরিধান, এক খানি উড়ানী গায়ে, সঙ্গে পাঁচটা মাত্র টাকা ; শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন । গৃহ, পুকুর, মরদান, গ্রাম ক্রমে ক্রমে সকলকে অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যে পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; ইহার পরিণাম কি প্রকার, তাহা কে বলিতে পারে ? শরৎচন্দ্র পরিণাম ভাবেন নাই । ক্রমে মধুপুর অন্ধকারবৎ দেখা যাইতে লাগিল । শরৎচন্দ্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেন ; একবারও ভাবিলেন না,—ভাবিলেন না, নীরদা ঘরে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে, কল্যা তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে !!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

একি স্বপ্ন ?

রজনী প্রভাত হয় নাই ; পাখী কুলায়ে বসিয়া ভ্রমে একবার একবার ডাকিতেছে, আবার নীরব হইতেছে, ক্ষণকাল পরে আবার ডাকিতেছে ।

গ্রাম্য কুকুর কচিং শব্দ শুনিয়া একবার একবার চমকিয়া উঠিয়া ডাকিতেছে, আবার চুপ করিতেছে, পার্শ্ববর্তী কুকুর সকল অমনি ডাকিয়া একতার পরিচয় দিতেছে। দুই এক ঘরে দুই একটা দীপ জ্বলিতেছে, দুই একঘরে শিশু সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে, মাতৃমেহ অমনি ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহা-দিগকে শাস্ত করিতেছে। একঘরে রোগী—সে ঘরে সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিয়াছে, এখনও জ্বলিতেছে। দুই এক ঘরে দুই একটা বালক বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাহারা হর্ষে আমোদ করিয়া গান করিতেছে, আর গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। যে ঘরে স্বামী স্ত্রী শয়ান, সে ঘর এখন নিস্তব্ধ। পূর্ন দিক ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। শীতল সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে। কদলীবৃক্ষ-পত্র বায়ুর সহিত উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। একটা পাখী ডাকিয়া নীরব হইতে না হইতে আর একটা পাখী ডাকিতেছে; এই রূপ পরে পরে কত পাখীই ডাকিতেছে। অনেকক্ষণ পরে আবার সকলে ঘামিতেছে। শরৎচন্দ্রের ঘরে দীপ নির্ঝাঁপিত, গৃহে শুইয়া এক বিছানায় একাকিনী নীরব, আর এক স্থানে দুইজন পরিচারিকা। বারাণ্ডায় এক ধারে শরৎচন্দ্র শুইতেন, সে বিছানা শূন্য; অন্য স্থানে দুইজন আয়ী।

তৃতীয় প্রহরাতে রজনীতে একবার নীরদার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারপর আর গাঢ়তর নিদ্রা আসিল না। নানা ভাবনা একদিকে, নিদ্রা এক দিকে, দুইদলে বৃদ্ধ হইল; কোন দলের কামনা পূর্ণ হইল না। নীরদার চক্ষে গাঢ়তর নিদ্রা বসিল না, চকুর সম্মুখে যেন কি ঘুরিতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে স্বপ্নে দেখিল, শরৎচন্দ্র একটা ময়দানের মধ্য দিয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছেন। নীরদা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু নিদ্রা একেবারে ভঙ্গ হইল না; ক্ষণকাল পরে আবার স্বপ্ন দেখিল, শরৎচন্দ্র যেন নীরদাকে বলিতেছেন,—“নীর! আমি চলিলাম, তুমি থাক।”

এবার নীরদার নিদ্রাভঙ্গ হইল; স্বপ্ন দেখিয়া উঠে:স্বরে চাঁৎকার করিয়া উঠিল ‘দাদা! কোথায় যাবে?’ নীরদার ঘুম ভাঙ্গিল, ‘দাদা দাদা’ বক্তিয়া ডাকিতে লাগিল; দাদা উত্তর করিল না। নীরদা কাঁদিতে আরম্ভ করিল, গৃহের অন্ত লোক জাগিল; অন্য লোক জাগিল; রজনী প্রভাত হইল। শরৎচন্দ্রের খোঁজ নাই। নীরদা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

নদী গর্ভে ।

যখন রজনী প্রভাত হইল, তখন শরৎচন্দ্র মধুমতীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া-
ছেন। বেলা অগ্রসর হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র একটু চলেন, আর একটু
বসেন, এই প্রকার করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; যতই বেলা
বাড়িতে লাগিল, মনের অবস্থা ততই মন্দ ভাব ধারণ করিতে লাগিল।
কেল আসিলাম, কোথায় যাইব ?—এই সকল চিন্তা উঠিতে লাগিল। মন
উত্তর করিতে লাগিল,—‘আসিলে বাসনা চরিতার্থ করিতে’,—উৎসাহ পথ
দেখাইতে লাগিল,—‘চল এই পথে’। শরৎচন্দ্র এতক্ষণ পর্য্যন্তও ক্ষুধার
কাতর হয়েন নাই। উৎসাহ যাই পথ দেখাইতে লাগিল, অমনি অজ্ঞাত
পথে চলিতে লাগিলেন। ছুইএকটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও পথের
কথা জিজ্ঞাসা করেন না, তাহার কারণ, কোন্ পথের কথা জিজ্ঞাসা
করিবেন ? শরৎচন্দ্র একবার ভাবিলেন, ‘কলিকাতায় যাই, তার পর
যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইব।’ কলিকাতায় অবিনাশচন্দ্র আছে, আর
অজ্ঞাত আত্মীয়গণ আছেন, এ কথা যখন মনে পড়িতে লাগিল, তখন
আবার ভাবিতে লাগিলেন, না—সেখানে যাইব না। এই প্রকার একটা
ভাবিয়া ঠিক করেন, আবার সেটাকে খণ্ডন করেন। চঞ্চল মন কোন
বিষয়েই সহজে নিবিষ্ট হইতে চাহে না।

যখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, তখন আবার নীরদার কথা শরৎচন্দ্রের
মনে পড়িল। ভাবিলেন, অসহায় নীরদা এখন কি করিতেছে ? নীরদা-
কে দেখিতে একান্ত ইচ্ছা হইল, আবার ফিরিলেন, ফিরিয়া কতকদূর আসি-
লেন, আবার যেন কি ভাবিয়া অজ্ঞদিকে চলিলেন। একবার বিক্র্যবাসি-
নীকে দেখিবার কথা ভাবিলেন। ভাবিলেন, সহসা বিন্দুর নিকটে যাইয়া
উপস্থিত হইলে, বিন্দু আকাশের চাঁদ হাতে পাইবে, কত আনন্দিত হইবে।
বিন্দুর আনন্দের কথা শরৎচন্দ্রের মনে স্থান পাইল না, অজ্ঞদিকে চলি-
লেন। একবার নদীতীর পর্য্যন্ত আসিয়া আবার ফিরিয়া একটা গ্রামের
নিকট গেলেন, আবার সে স্থান হইতে নদীর তীরে আসিলেন। আবার

সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রসর হইতে, হইতে গ্রাম দৃশ্যের অতীত হইল। একদিকে সূর্য্যের প্রথর তাপে শরীর উত্তপ্ত, ক্ষুধার পাকস্থলী ক্লিষ্ট, —ত্রিবিধ জলীয় পদার্থ পাকস্থলীর দ্বারদেশে আসিয়া তর্ক্কন গর্জন করিতে লাগিল; হৃদয়-ঘরের বলক্ষয় হইতে লাগিল, রক্তবাহিকা প্রণালীর রক্ত ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল; অল্পদিকে শ্বানা প্রকার চিন্তার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান। নদীস্রোত রব করিতেছে, পথ উষ্ণ, বালুকণা বায়ুভরে উড়িয়া শরৎচন্দ্রের নেত্রে আঘাত করিতেছে। শরৎচন্দ্র ক্লান্ত হইলেন, ক্ষুধার অস্থির হইলেন। কিন্তু অন্তমনস্ক হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। বর্তমান অবস্থা মন হইতে চলিয়া গেল। এই প্রকারে কতদূর যাইতে যাইতে যে স্থানে নদী বক্রভাবে অল্প দিকে গিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি খণ্ড মৃত্তিকার উপর দিয়া এবারে যাইতে হইল। মৃত্তিকা খণ্ডের নিম্নে তরঙ্গ-আসিয়া প্রহত হইতেছিল; শরৎচন্দ্র যাই সেই মৃত্তিকা খণ্ড হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া অল্প মৃত্তিকার আশ্রয় লইবেন, এমন সময়ে সেই মৃত্তিকা খণ্ড ভগ্ন হইয়া নদীগর্ভে নিপতিত হইল, শরৎচন্দ্রও তৎসঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িলেন। বলা বাহুল্য যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শরৎচন্দ্র কূলে উঠিতে সমর্থ হইলেন না। তীরস্থ মৃত্তিকারানি লক্ষভাবে যে স্থানে জল স্পর্শ করিয়াছে, সে স্থানে অগাধ সলিল, শরৎচন্দ্র একবার ডুবিয়া ডাসিয়া উঠিলেন, প্রবল স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

এইসময়ে একখানি নৌকা স্রোতান্তিমুখে যাইতেছিল। বাহকেরা শরৎ-চন্দ্রের বিপদ দেখিয়া নৌকা সজ্ঞারে চালাইয়া জলমগ্নোদ্ধ শরৎচন্দ্রকে নৌকার উঠাইল। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র, অত্যন্ত ক্ষুধার পর, অতিরিক্ত জলপানে, অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন; নৌকার বিষয় তিনি কিছুই জানিলেন না।

সেইস্থানে নদীর ত্রিমুখ। নৌকার আরোহীরা সকলে নিদ্রিত, কেবল দাঁড়ীরা দাঁড় বাহিতেছিল, আবার একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া নৌকা চালাইতেছিল। শরৎচন্দ্রকে নৌকার উঠান হঠলে বাহকেরা ভয়ে ভয়ে তরী চালাইয়া নদী পার হইয়া আর একটা ক্ষুদ্র নদীর আশ্রয় লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা শরৎচন্দ্রকে সূতপ্রায় দেখিয়া নদীর তীরে রাখিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহাকে লইয়া চলিল।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

জগদীশ বাবু ।

ঢাকা-নিবাসী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় পাটনায় ৪০০ টাকা বেতনের একটা চাকুরি করিতেন। তিনি অত্যন্ত ভীক। নদীপথে চলিতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। কলিকাতায় তাহার একটা বাড়ী ছিল, শারদীয় পূজার সময় সেই বাড়ীই বিলাস-গৃহ হইত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তাঁহার পিতার মৃত্যুপলক্ষে তিনি স্বদেশে আসিয়াছিলেন। পাটনা হইতে আসিবার সময় তাঁহার সহিত ৪ জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ আসিয়াছিল; হুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার মধ্যে ৩ জনের ঢাকাতে মৃত্যু হয়। কাণী স্থানে যাইবার সময় স্বদেশ হইতে ৮জন দেশীয় সর্দার লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

যে নৌকার দাঁড়ীরা শরৎচন্দ্রকে নৌকায় তুলিয়া লইল, এ সেই জগদীশ বাবুর নৌকা। জগদীশ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। যে সময়ে শরৎচন্দ্রকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া হয়, সে সময়ে তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, উঠিয়া দেখিলেন, একটা অপরিচিত লোক নৌকায় শয়িত, তাহার মুখ হইতে জলের ফেণার ঞায় কি যেন বাহির হইতেছে। কোতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি সর্বিস্ময়ে দাঁড়ীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে যে অবস্থায় পাইয়াছিল, তাহা সমুদয় বলিল। জগদীশ বাবু একটু আশ্লাদিত হইয়া দাঁড়ীদিগকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

জগদীশ বাবু স্বয়ং অপরিচিত শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্মা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে একটু একটু ভাবনা হইতে লাগিল। অপরিচিত অবস্থায় লোকটাকে আমরা লইয়া চলিয়াছি; এ ব্যক্তি কোথায় যাইবে, তাহা আমরা জানি না; এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, জীবনরক্ষা পাইলে যেখানেই থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আর নৌকা রাখিতে বলিলেন না, দাঁড়ীরা বৃষ্ণাক্রমে নৌকা চালাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে শরৎচন্দ্রের চেতনা হইতে লাগিল। উদরস্থ জ্বল, কতক মুখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল, কতক প্রস্রাব-দ্বার দ্বারা নির্গত হইল। শরৎচন্দ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী অপরিচিত ভদ্র লোক উপবিষ্ট। শরৎচন্দ্র কণা বলিলেন না; তাঁহার চক্ষু আবার মুদ্রিত হইল। আবার ক্ষণকাল পরে চৈতন্য হইলে সম্মুখস্থ অপরিচিত জগদীশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘মহাশয়, আপনি যিনিই হউন, আমাকে ক্ষমা করিবেন; ক্ষমায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু আহার করিতে দিন।’

জগদীশ বাবুর নৌকায় আহাণীক দ্রব্যাদির অপকৃত্ত ছিল না; তিনি স্বয়ং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া শরৎচন্দ্রের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শরৎচন্দ্র একটু সুস্থ হইলে পর জগদীশ বাবু সকল বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনার নিকট আমি জীবন পাইয়াছি, আপনার এখানে আমি চিরকালের তরে আবদ্ধ। সংপত্তি আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার সহিত লইয়া গেলে আমি বড় উপকৃত হই।

জগদীশবাবু।—আপনি যখন বলিয়াছেন যে আপনি কলিকাতায় থাকেন, তখনই আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, আপনাকে আমার সহিত যাইতে অনুরোধ করিব। আপনি আমার সহিত যাইতে সন্মত আছেন, ইহাতে আমি খারপর নাই সম্মত হইলাম।

আলাপ পরিচয়ে জগদীশ বাবুর সহিত প্রথম দিনেই শরৎচন্দ্রের হৃদয় জড়িল। জগদীশ বাবুর জীবনের ঘটনা সকলই শরৎচন্দ্রকে পুলিয়া বলিলেন। শরৎচন্দ্রও অতীত ঘটনা সকল বলিলেন। কিছু ভাবীপরিণামের অন্ধকারময় অংশ গোপন করিলেন। জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের তরবারি শিক্ষার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন।

আমরা এই সময়ে বলিয়া রাখি, জগদীশ বাবু একমাত্র স্ত্রী ছিল, তাঁহার নাম মালতী। মালতী দেবীর গর্ভাবস্থা ছিল, তাঁহার পরিচারিকার নাম দিনমণি। জগদীশ বাবু যে নৌকার যাইতেছিলেন, সে নৌকার মালিকের নাম বকাউল্লা, জাতিতে মুসলমান। বকাউল্লার বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দস্যুর হস্তে ।

সে দিন গেল । রজনীযোগে শরৎচন্দ্রের সহিত জগদীশ বাবুর যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা বিবৃত করিব না ; তবে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, জগদীশ বাবু অবিনাশচন্দ্রের মাতুলের একজন বন্ধু, সুতরাং শরৎচন্দ্রের একজন বিশেষ আত্মীয় ।

তার পর দিন নৌকা চলিল । মাঝীদের মন প্রফুল্ল, নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিল । বেলা অগ্রসর হইতে লাগিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাড়িল । জগদীশ বাবুর নৌকা যে দিকে যাইতেছিল, পবন সে দিকের অমুকুল, মাঝীরা পাল তুলিয়া দিল, নৌকা পবনের বেগ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িয়া চলিল । জলের তরঙ্গ জলে মিশিতে লাগিল, নৌকা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল । জগদীশ বাবুর আহাঙ্গাদি ক্রিয়া প্রায়ই নৌকায় সম্পন্ন হইত ; যথা সময়ে আহাঙ্গাদি সম্পন্ন হইয়া গেল । আহাঙ্গান্তে জগদীশ বাবু নিদ্রাভিভূত হইলেন, শরৎচন্দ্র বসিয়া জীবনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন ।

বেলা অবসান হইতে না হইতে নৌকা আসিয়া একস্থানে লাগিল । আকাশে একটু একটু পাতলা মেঘ উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সে সকল ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া ঘনীভূত আকার ধারণ করিল । সামান্য একখানি মেঘ আসিয়া সূর্যকে আবৃত করিল । বৈশাখ মাস, সূর্য লঘুভাবে পশ্চিম গগনে পাতলা মেঘে আবৃত । সূর্যের রশ্মি পূর্বদিকে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছিল । পূর্বদিকে মেঘ, পশ্চিম গগনে মেঘ নাই, পশ্চিমের অর্ধ-পৃথিবী হান্তময়ী । সূর্যের মেঘাবৃত ক্ষীণরশ্মি জলের উপরে বিছাতের ন্যায় চক্ মক্ করিয়া জৌড়া করিতেছিল, সেই চক্মকে বায়ু হিল্লোলোৎপন্ন জল-হিল্লোল আহত হইতেছিল । কোথাও বা বহুদূর-বিস্তীর্ণ মেঘমালার ঘনীভূত ছায়া গলিলোপয়ি কালমেঘ সদৃশ শোভা পাইতেছিল । দেখিতে দেখিতে দিনমণি অন্তিমিত হইলেন । নৌকার মাঝীরা নৌকা বাধিল । একবার সকলে তীরে উঠিয়া আবার নৌকার কিরিয়া আসিল । কণকাল পরে

নৌকার নিকটে সহসা অনেক লোক আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল । শরৎচন্দ্র নৌকার উপবিষ্ট, ভালমন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না ।

সূর্য অস্তমিত হইল । নদীর রূপ পরিবর্তিত হইল । সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর উপর রায় প্রবলবেগে বহিতে লাগিল । তাহাতে তরঙ্গ উত্থিত হইল । তরঙ্গের দ্বারা প্রতিঘাতে আরো তরঙ্গ উঠিতে লাগিল । সেই তরঙ্গ সমূহ পরস্পর প্রহত হইতে হইতে আসিয়া তীরে লীন হইতে লাগিল, নৌকাখানি সেই তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল । নৌকার আন্দোলনে জগদীশ বাবুর নিজাভঙ্গ হইল । শরৎচন্দ্রকে মৌনভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎ ! তুমি কি ভাবিতেছ ?

শরৎচন্দ্রের অহুরোধে জগদীশ বাবু 'তুমি' সম্বোধন করিতেন ।

শরৎচন্দ্রের মন নানা চিন্তায় বিলোড়িত । দহ্যমান জ্বরে পীড়িত লোকের ন্যায় শরৎচন্দ্র উপবিষ্ট হইয়াই নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । জগদীশ বাবুর কথায় সহসা চমকিত হইয়া বলিলেন, অদ্য কি এই স্থানেই নৌকা থাকিবে ? এই কথা ভাবিতেছিলাম ।

জগদীশ বাবু অত্যন্ত ভীত লোক, বলিলেন 'এ কোন্ স্থান ?'

শরৎচন্দ্র যে স্থানের নাম করিলেন, তাহা শুনিয়া জগদীশ বাবু অত্যন্ত ভীত হইয়া মহাবিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ।

এই সময়ে তাঁহারা দুইজনে নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আর একখানিও নৌকা নাই, চতুর্দিকেই নদীর গভীর নীল জলরাশি কলকল রবে ধাইতেছে ; সম্মুখে নদীর ত্রিমুখ—ভয়ানক স্থান ।

জগদীশ বাবু মাঝীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাঝি ! এ স্থলে নৌকা রাখিয়াছ কেন ?

মাঝী ।—আজ্ঞা, আকাশে মেঘ, সম্মুখে বড় নদী, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন, আপনার হুকুম পাইলে এখন নৌকা ছাড়িয়া দেই ।

জগদীশ বাবু একটু বিস্মিত হইলেন । মাঝীর কথায় তাঁহার সন্দেহ একটু কমিয়া আসিল । কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'বখন নৌকা আসিয়াছিল, তখন নৌকা ছাড়িয়া গেলে কোন আপত্তি ছিল না । এখন নৌকা রাখিলেও যে ভয়, ছাড়িলেও তাই, সম্মুখে বড় নদী । আরো বুঝাইয়া বলিলেন, চক্রান্ত মাঝীদের । জগদীশ বাবু মহা ভাবনার পড়িলেন ।

বকাউরা মাঝী জগদীশ বাবুর উত্তর না পাইয়া ভাবিল, বাবুর সম্মতি হই-

যাচ্ছে ; স্মৃতির নৌকা খুলিয়া দিল । ক্ষণকালের মধ্যে নৌকা ত্রিমুখের মধ্যস্থল অতিক্রম করিল । তিনটী নদীর সম্মিলনস্থল,— দুইটী নদীর জল সমভাবে বহিয়া তৃতীয় নদীর শোভে মিশিতেছিল, সেই নদী সাগরের সহিত মিলিয়াছে, স্মৃতির এখন ভাঁটা । ভাঁটায় এস্থলে কলিকাতার পথের উজান । নৌকা বিপরীত দিকে প্রস্রাবের সহিত চলিল, মাঝীদের অভিসন্ধি মন্দ, তাহারা নৌকা ফিরাইল না ।

আর এক খনিও নৌকা নাই । মেঘাচ্ছন্ন রজনী ঘোরতর অন্ধকারাবৃত, টিপ্ টিপ্ একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে ; শরৎচন্দ্র এবং জগদীশ বাবু বৃষ্টির পূর্বেই ছইয়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন । সহসা একখানি নৌকা পাশ কাটিয়া ভীরের ছায় ছুটিয়া গেল, শরৎচন্দ্র বলিলেন, নৌকা কোথায় যাইবে ? কেহই উত্তর করিল না । শরৎচন্দ্রের মন সন্দেহে পূর্ণ, বর্তমান ঘটনায় সেই সন্দেহ ভাবনায় পরিণত হইল, জগদীশ বাবুকে বলিলেন, ‘আমাদের একাকী এ পথে আসা ভাল হয় নাই !’

জগদীশ বাবু ভীত মনে বলিলেন, ‘তবে উপায় ?’

শরৎ।—উপায় দৈব ! আপনি ভয় করিবেন না । বন্দুক কয়েকটা এবং তরবারি কয়েকখানা বাহির করুন । এই বলিয়াই শরৎচন্দ্র মাঝীকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘মাঝি ! আর নৌকা দেখা যায় ? মাঝী কিছুই উত্তর দিল না দেখিয়া, শরৎচন্দ্র আর অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারি লইয়া ছইয়ের বাহিরে আসিলেন । দেখিলেন, নদীর তীর ঘোর অরণ্যময় ; এপথে কখনও আসিয়াছেন, মনে পড়িল না ; মাঝীকে বলিলেন,— “মাঝি, তুই কোথায় লইয়া চলিয়াছিস ?” মাঝী ভীমরবে আকাশ কাঁপাইয়া বলিল, “আল্লা আল্লা হো” । মাঝীর এই ডাকের এক মুহূর্ত্ত পরেই শরৎচন্দ্র দেখিলেন, চতুর্দিক হইতে আর না হইলেও আট নয় খানা নৌকা আসিয়া ঘেরিয়াছে, প্রত্যেক নৌকায় ছয় সাত জন লোক, নৌকাগুলি নিকটে আসিলেই সকলে মিলিয়া ডাক ছাড়িল—‘আল্লা আল্লা হো !’

আর সময় নাই । শরৎচন্দ্র চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না ; সন্দার-দিগকে বন্দুক বাহির করিয়া আনিতে বলিয়াই, স্বীয় অনি নিরূপিত করিয়া মাঝীদিগকে এই ভ্রুংখ পূর্ণ সংসার হইতে বিদায় দিতে লাগিলেন । তরবারি পরিচালনের সময় ফুয়াইল, চতুর্দিক হইতে লাঠীর আঘাত আসিয়া নৌকায় ঞ্জহত হইতে লাগিল ; শরৎচন্দ্র বন্দুক লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় নৌকা রক্ষা

করিতে লাগিলেন । অশ্রান্ত সর্দারেরা প্রথমে একবার চেষ্টা করিয়াই সকলে প্রাণের আশঙ্কায় পলায়ন করিল । একা শরৎচন্দ্র বীর পুরুষের জায় প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন লোককে বাধা দিতে লাগিলেন । জগদীশ বাবু ভয়ে জড়সড় হইয়া মালতী দেবীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অর্দ্ধদণ্ড পর্য্যন্ত এই ভাবেই গেল । দস্যুদিগের সঞ্চল একমাত্র লাঠী ; শরৎচন্দ্র প্রায় অর্ধেক পরিমাণ দস্যু বিনাশ করিলেন ; শরৎচন্দ্রের সাহায্যার্থে একটা লোক পশ্চাতে, সে হিন্দুস্থানী অনবরত শরৎচন্দ্রকে বন্দুকের সারু করিয়া দিতেছিল ।

দস্যুদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, কেহ বলিতে লাগিল, আর কাজ নাই, পলায়ন করি । কেহ দস্ত করিয়া শেষ চেষ্টা করি বলিয়া অক্ষ প্রদান করত জগদীশ বাবুর নৌকায় উঠিয়া সেই হিন্দুস্থানীর মস্তকে আঘাত করিল । সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল । শরৎচন্দ্রও হস্ত প্রসারণ করিয়া যাই অস্ত্র সজ্জিত বন্দুক গ্রহণ করিবেন, এমন সময়ে তাঁহাকে জলে ঠেলিয়া ফেলিল । শরৎচন্দ্র আশ্চর্য্য করিতে পারিলেন না, দস্যুরা 'উঁচঃবরে আবার 'আলা আলা হো,' করিয়া উঠিল । কণ্টক পরিষ্কার হইল, দস্যুরা একে একে জগদীশ বাবুর নৌকায় উঠিয়া লুটপাট করিতে লাগিল । জগদীশ বাবু ও মালতী যে কামরায়, সে ঘরের দরজা বন্ধ ।

দস্যুরা যথেষ্টায় নৌকার সকল দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল ; তাহা-দিগের বৃথা চীৎকার এবং পদভরে নৌকা কম্পিত ।

মালতী দেবী জগদীশ বাবুর কর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—“নাথ ! আর যে উপায় দেখি না ; কি করিব, কি হইবে ? আর বিলম্ব নাই ? ওমা, এই যে এই দিক পানেই আসিতেছে !”

জগদীশ বাবুর শরীর কম্পিত, উত্তেজিত ; সক্রোধস্বরে বলিলেন, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি ?

দিনী একটা জানালার খড়খড়ী খুলিয়া দেখিতেছিল ; সহসা দস্যুদিগকে ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া বলিল, “বাবু ! এই যে ! এখন উপায় ?” জগদীশ বাবু ইহা শুনিয়া হতচেতন হইলেন । দিনী ছইখানি ছুরিকা মালতী দেবীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—“ধর—আর দেখিস্ কি ? শুধু কাঁদলে কি হবে ?”

দস্যুরা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল । তাহা-দিগের মধ্যে একজন

ঝলিল—‘এই জগদীশ বাবু’। দিনী চিনিল, সে নৌকার একজন মাল্লা ।

জগদীশ বাবু নানা প্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন, তোমরা নৌকার সমস্ত লইয়া যাও, ইচ্ছা হয় আমাদের বধ কর, কিন্তু মালতীকে কিছু বলিও না। দস্যুরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জগদীশ বাবুর হস্তপদ দৃঢ়তরূপে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে অস্ত্র ঘরে লইয়া গেল। কতকগুলি দস্যু মালতী দেবীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

দিনীর হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল, বলিল, তোদের সাহস থাকে আমার নিকটে আর, নচেৎ এ ঘর হইতে দূর হ ।

একজন দস্যু সাহস করিয়া দিনীর নিকটে আসিল, কিন্তু আসিয়াই বৃশ্চিক দংশনের আয় দংশিত হইয়া সন্ধিয়া গেল।

কর্ণকাল পরে আর কতকগুলি দস্যু আবার সেই ঘরে ফিরিয়া আসিল। দিনী দেখিতেছিল, জগদীশ বাবুকে কোথায় লইয়া যায়। এ দিকে তাহার মালতীদেবীকে গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

দিনী ফিরিয়া আর মালতীকে দেখিতে পাইল না। নৌকার বাহিরে যাইয়া দেখিল, দস্যুরা মালতীকে লইয়া খলান্ন করিতেছে; দেখিয়া মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

যেখানে দিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই জদীশ বাবু আবদ্ধ। জগদীশ বাবু দিনীকে বলিলেন—“দিনি, আমার হাতের বন্ধন খুলিয়া দে।” দিনী তাহাই করিল। জগদীশ বাবু উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শক্তি হইল না। দিনী সেইখানে বসিয়া রহিল। জগদীশ বাবু নিস্তরুভাবে পড়িয়া রহিলেন।

দিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল;—মালতী না থাকিলে আমি থাকিয়া কি করিব? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ চলিয়া দেখিল, নৌকা তীরে সংলগ্ন, আর বিলম্ব না করিয়া দিনী নৌকা হইতে মালতীর উদ্দেশে সরিয়া পড়িল।

আর লোক নাই, জগদীশ বাবু একা। জোয়ার আসিলে নৌকা ভাসিতে ভাসিতে উত্তর দিকে চলিল।

তার পরদিন যেখানে নৌকা ভাসিতে ভাসিতে যাইয়া লাগিল, সেটা ভদ্রলোকের আবাস স্থান। সেখানে বর্তমান সময়ে একটা মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রহরাভীত বেলায় সময়ে গ্রাম হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক

আসিয়া জগদীশ বাবুকে উপরে তুলিয়া লইল। জগদীশ বাবু সেইখানে আসিয়া, মালতী দেবী এবং শরৎচন্দ্রের অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই গ্রামের লোকেরা জগদীশ বাবুকে মোকদ্দমা করিতে বলিল। মোকদ্দমায় দস্যুদিগের উপযুক্ত শাস্তি হইল, কিন্তু মালতী এবং শরৎচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল না। একমাস পরে জগদীশ বাবু অল্প ঐকুখানি নৌকা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। কলিকাতায় যাইয়া শরৎচন্দ্রকে অহু-সন্ধান করিবার সময় হইল না, অবিলম্বে রাণীগঞ্জের ট্রেনে পাটনান্তিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র জলমগ্ন হইয়া কশকাল সন্দরণের পর একটু আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নদীর তীর অরণ্যময়, সে রজনী সেইখানেই অবস্থিতি করেন। তার পরদিন কতকগুলি কাঠুরিয়ার সহিত অরণ্যের মধ্যে একটা আশ্রয়ে গমন করেন। আর সঙ্গতি না পাওয়ার সেইখানেই কতক দিন অবস্থিতি করেন। সময়ক্রমে যখন কাঠুরিয়ারদিগের কাষ্ঠ কাটা সমাপ্ত হইল, তখন তিনি তাহাদিগের নৌকায় উঠিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, প্রায় দুই মাস পর্যন্ত জগদীশ বাবুর অহুসন্ধান করিয়াছিলেন।

মালতী দেবী এবং দিনীর কি হইল, সে ঘটনা পরে বিবৃত হইবে। অগ্রে আমরা বিদ্যাবাসিনীর কথা বলিব।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

যাহার বেদনা সেই বুকে ।

সংসার সূখ কোথায় ? অর্থাৎ সংসারের অনেক লোক সূখের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু যাহার অর্থ আছে, তাঁহার মনে প্রবেশ করিবার যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে অহুসন্ধান করিয়া দেখ, বুঝিবে, তাঁহার মত অসুখী জীব আর নাই। তবে সূখ কোথায় ? নির্ধনের মনে সূখ

নাট, কারণ তাহার অর্থ নাই ; আবার ধর্মের স্মৃতি নাই, কারণ ধর্মের তৃষ্ণা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সদৃশ অনবরত জ্বলিতে থাকে, কখনও নির্দীপিত হয় না। তবে স্মৃতি কোথায় ? নীরদার স্মৃতি নাই, তাহার পতি নাই ; বিদ্যাবাসিনীর পতি আছে, কিন্তু স্মৃতি কোথায় ? বিন্দুর স্মৃতি—শরৎচন্দ্র, স্মৃতির শরৎচন্দ্রের অদর্শনে, বিন্দুর কষ্ট। গ্রহকার বলেন, বাহার মনে স্মৃতি নাই, এ পৃথিবী তাহার নিকট ছুঃখের আলয় !

আশাই মানবের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। বাহার আশা নাই, সে জীবন-শূন্য ; শরীর ধারণ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, সে প্রাণ থাকিতে মৃত। ঐ যে পুত্র-শোক কাতরা বৃদ্ধ-রমণী অহোরাত্র ধূলয় লুপ্তিতা, ক্ষমতা থাকিলে যাইয়া দেখ, উহাকেও আশা স্বপ্ন দেখাইতেছে। বিদ্যাবাসিনী, শরৎচন্দ্রের পত্র পাঠিয়া দিব্যানিধি আশা মুছিতেছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন, জীবনে স্মৃতি নাই ; কিন্তু ঐ যে আবার ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর দেখিতেছ, উহা কি জ্ঞান ? উহাই আশার স্বপ্ন। শরৎচন্দ্রের পত্রে বিদ্যাবাসিনীর আশালতা বিলোড়িত হইয়াছিল মাত্র, একেবারে মূলে ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু যখন শরৎচন্দ্রের দেশ-তাগের বার্তা বিন্দুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন বিন্দুর আর কি আশা ছিল ?

স্ত্রীলোকের নিকটে শুনিয়াছি—‘স্ত্রীজাতির যদি কিছু স্মৃতি থাকে, সে স্মৃতি যৌবনে স্বামী সহবাস।’ এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের ভাগ্যে স্মৃতি নাই। বাঙ্গালার বাল্য বিবাহ প্রচলিত, বাহার হৃদ্বপোষ্য বালিকাগণকে বিবাহ করে, তাহার স্কুলের ছাত্র ; বালিকাগণের যৌবন অতিবাহিত না হইলে আর বালকগণের পাঠ্যাবস্থা শেষ হয় না। পাঠ্যাবস্থায় বাহার স্ত্রীকে স্মৃতি করিবার জন্ত ব্যস্ত হয়েন, তাঁহার স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা পাইলে পাইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত নহি। আর বাহার তাহা না করেন, তাঁহার স্ত্রীর অভিশাপে পরজীবনে দাসত্ব ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন। সংক্ষেপে পাঠ্যাবস্থার বিবাহের জায় অন্যায় কার্য আর পৃথিবীতে নাই।

বিদ্যাবাসিনীর এমন সাধের যৌবনফুল, বাহা জীবনে একবার ভিন্ন আর ফুটে না, অল্পশু ভাবে মলিন হইল ; ভ্রমর গুঞ্জরিল না, মধুকর মধু পান করিল না, বিদ্যাবাসিনীর যৌবনফুল ফুটিয়াও স্মৃতি দিল না। বিদ্যাবাসিনী

নীর ঘোবন মলিন হইয়া আসিল, কিন্তু আশা ত মলিন হয় না, আশার চিরদিনই নবজীবন ; আশা ত বিন্দুকে ঘোবনহীন বলে না। বিন্দু দিন গণে, মাস গণে, বৎসর গণে। ভাবে আর বিলম্ব নাই, শরত্তের চাকুরি হইলেই সকল কষ্ট বাইবে। বিদ্যাবাসিনী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, কত দিনে পড়া শেষ হইবে। শরৎচন্দ্র বৎসরের মধ্যে একবছরের অধিক ঝড়ী আসিতেন না, তাহাও সকল বৎসর নহে ; আবার সকল বারই বিদ্যাবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইত না। যে বারে হইত, সেবারেও চারি পাচ দিনের অধিক নয়। সমস্ত ঘোবন এই প্রকারে গত হইয়াছে। বিন্দুর কষ্ট কি, তাহা বিন্দুই জানে।

সৌন্দর্য্য ঘোবনের সহচর। তুমি চেষ্টা কর আর না কর, প্রণয়িনীকে প্রেম-ডোরে বাধিবার জন্ত যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমার ঘোবনে বিকশিত হইবেই হইবে। এই জনাই অনেকে বলিয়া থাকেন, আদান প্রদান জীবনের সুখ। আমার মন তোমাকে দিলাম, তোমার মন আমাকে দিলে ; দুই জনে অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলাম, তবে কি আমরা সুখী ? ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দেখিবে, বিচ্ছেদে এ মন-মিলন আবার ভাঙ্গিয়া যাইবে ; আর ইচ্ছা করিয়াও তোমার মন গ্রহণ করিতে পারিব না। সেই জন্তই প্রণয়িনীর বিলাপধ্বনি অনবরত স্বর্গের বায়ুকে উষ্ণ করিতেছে ; যুবক, যুবতীর বিচ্ছেদানলে সংসার পুড়িয়া ছার খার হইতেছে। আমরা বলি, ষাঁহার আদানের আশা ছাড়িয়া প্রদান করিতে পারেন, সংসারে যদি সুখ দুর্লভনা হয়, তবে সে সুখ তাঁহাদের। তুমি আমাকে মন দেও আর না দেও, আমার মন তোমাকে দান করিলাম, ইহাতে যদি সুখ না থাকে, তবে সংসারে আর সুখ নাই।

পুরাকাল হইতে এই উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রবট শুনিয়া আসিতেছি, বিচ্ছেদ সহ হয় না। ইহার কারণ কি ? যে প্রণয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রলয় দেখে, সে প্রণয় প্রগাঢ় নহে ; যে প্রণয়ে অন্তলম্পর্শ ব্যরিধির স্রাব গভীরতা নাই, যে প্রণয়ে অল্প বাতাসে তরঙ্গ উঠে, সে প্রণয় বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইলেও দেশের অমঙ্গল নাই।

যে কথা বলিতেছিলান্ন,—লোকের সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের আবশ্যক কেন, তাহা আমরা এখন বলিব না। বলিবনা, কিন্তু জানি, আধুনিক বঙ্গে প্রণয়ের মূলে সৌন্দর্য্য চাই। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, নবদম্পতি-

গণের এই বাঞ্ছিত সৌন্দর্যের অভাব হইলে, তাঁহারা কৃত্রিম সৌন্দর্যে ভূষিত হইয়া এক প্রকার পশুর স্তায় সংসারে ভ্রমণ করেন। কিন্তু কেবল রমণীগণই কি সৌন্দর্য্যপ্রিয় ? না—তাহা নহে। তবে এ সব কথা বলি কেন ? আমাদের মনে পড়ে বিদ্যাবাসিনীর সৌন্দর্য্য। যাহার ইচ্ছা হয়, একবার বিন্দুর দিকে চাহিয়া দেখুন।

যে দিন শরৎচন্দ্রের পলায়নের সংবাদ বিন্দুর শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত। রমণীকূলের চিরশোভা, চিকণ কবরীপুঞ্জ আলুলায়িত হইয়া সমস্ত পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মস্তকে তৈল নাই, কপালে সিন্দুর ষ্ণোঁটা নাই, ইচ্ছা করিয়া বিদ্যাবাসিনী আর তাশুল দ্বারা অধর রঞ্জিত করেন না। যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, কাহারও কথা শুনে ন। ইচ্ছা হইলে আহা করেন, নচেৎ উপবাস। শরীর ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল ; তাহার সহিত তেজ ও ক্ষুণ্ণিও বিলীন হইতে লাগিল। বিন্দুর পিতা মাতা তাঁহাকে কত বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের কথা বিন্দুর কর্ণশ্রবণ বোধ হয়, তাহা শুনে ন। সরলা বিদ্যাবাসিনী এখন অসরল ভাব ধারণ করিয়াছেন,—কাহারও নিঃশব্দ মনের কথা খুলিয়া বলেন না, অনবরত চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, উন্নত অবস্থার পূর্ব লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই প্রকারে ছয় সাত দিন গত হইল।

একদিন অপরাহ্নে বিদ্যাবাসিনী একাকিনী নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছিলেন ;—‘জল তুই চূপ করিয়া থাকিস্ কেন ? আমার ছবি তুই চুরি করিয়াছিস্ ; অতএব তোকে মারিব। মাথা কামড়ায় কেন, তা তুই কি জানিস্ ? না জানিস না জানিস, আমি তোকে ভালবাসি,’ ইত্যাদি কত অশ্লীল কথা বলিতে-ছিলেন। বিদ্যাবাসিনীর মাতা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাবাসিনী সে স্থান হইতে ছুটিয়া একটা বনে প্রবেশ করিলেন, তাহার মাতা কুল-বধু, পশ্চাৎগামিনী হইতে পারিলেন না।

বিদ্যাবাসিনীর সময়ে সময়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখনই শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে, আর মস্তিষ্ক ঘূর্ণিতে থাকে, আর উন্নতের স্তায় অস্থির হইয়া পড়েন। যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন মনটা একটু ভাল ভাবে ছিল, ভাবিতে লাগিলেন, ‘গৃহবাসে অনেক

যন্ত্রণা, না হইলে আমার এ প্রকার দশা হইবে কেন ? সংসার বিষময়, না হইলে আমার হৃদয় অস্থির হয় কেন ? আমার কি দুঃখ ? ধনের কষ্ট নাই, মা বাপের অদৃশ্য-যন্ত্রণা সহ করিতে হয় নাই, তজ্জাচ আমার প্রাণ অস্থির। প্রাণ অস্থির হয় কার জন্য ? শরৎচন্দ্র ? আহা, নামটা কি মধুর ! দুর্ হউক, তাহাকে কে চিনিত ? শরৎচন্দ্র কাহার ? শরৎ যদি আমার হয়, তবে আমার কষ্ট কি ! ‘শরৎকে কি আর দেখিব না ?’ শরৎচন্দ্রের প্রতিবিম্ব বিদ্যাবাসিনীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, বিদ্যাবাসিনী অস্থির হইলেন, এবং স্ত্রী-গৌরব কেশপুঞ্জকে ভূমি স্পর্শ করাইয়া নৈসর্গিক ব্যাপারে ভগ্নমান বৃক্ষের আয় হঠাৎ ভূতলশায়িনী হইলেন ।

শরৎচন্দ্রের কথা মন হইতে অপসৃত হইল ; কাননের কথা স্মরণ হইল । কাননের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভূপতিতা বিদ্যাবাসিনীর একটু নিদ্রাবেশ হইল । নিদ্রাবস্থায় যত্র দেখিলেন,—“তিনি যেন এক অপূর্ণ কাননে ভ্রমণ করিতেছেন ; সেখানে নানা প্রকার বৃক্ষ, ফল এবং ফুলভরে অবনত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর নয়ন মনকে তৃপ্ত করিতেছে । অনেক বৃক্ষে নানা প্রকার লতা বেঠন করিয়া রহিয়াছে । দেখিতে দেখিতে বিন্দুর যেন ভাবাস্তর উপস্থিত হইল ।”

দেখিলেন—“কত নব প্রফুটিত, সুগন্ধযুক্ত পুষ্পকে কণ্টকারিত দুর্গন্ধময় লতার ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বৃক্ষের অপূর্ণ শোভাকে স্বীয় তীক্ষ্ণ কণ্টকের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ; বৃক্ষে এমন স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না, যে স্থান লতা-বেঠন-চিহ্ন হইতে রক্ষিত আছে । আবার কত সুন্দর দতা, যাহাকে একবার দেখিলে, যাহার ফুলের ত্রাণ একবার নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে, সংসার ছাড়িয়া তাহার আশ্রয়ে যাইতে অভিলাষ হয়, এমন কত লতিকাকে কত কদর্যা বৃক্ষ, একেবারে রসহীন শুকপ্রায় করিয়া ফেলিতেছে ।”

আবার দেখিলেন—“সহসা যেন এ বন নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, আর একটা কানন দৃষ্টির সম্মুখে পড়িল । এ কাননে অনেক সুন্দর বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল আছে, শোভা আছে, ফল আছে ; কিন্তু লতা নাই, কণ্টক নাই । কোন কোন বৃক্ষের পাতা নানা মধুর স্বরে গান করিতেছে । বিদ্যাবাসিনী যেন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, পক্ষীদিগের কথা শুনিবার জন্য যাত্র হইয়া নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট পক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘কুঞ্জবিহারী পাতী

সকল, তোমরা রব করিতেছে না কেন ?' তাহারা যেন উত্তর করিল ;—
 'আমরা পক্ষীজাতি, বৃক্ষের ফলে আমরা উদর পূর্ণ করি ; আমরা চেষ্টা
 করি না, এইখানে বসিয়া থাকি, বৃক্ষ আমাদেরকে ফল যোগায়, আমরা
 আনন্দে আহার করি ; স্থানান্তরে বাই না। অনেক দিন আমরা এই
 ভাবে সুখে আছি'; কিন্তু দিন কয়েক পর্যান্ত একটা রব উঠিয়াছে, এই
 সকল বৃক্ষে লতা বেঠন করিবে। তাই আমরা নিরানন্দে নিস্তরুভাবে
 বসিয়া রহিয়াছি।' বিদ্যাবাসিনী অন্তান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া যেন জিজ্ঞাসা
 করিলেন, 'লতিকা বেঠন করিবে, তাহাতে তোমাদের নিরানন্দ কেন ?
 পক্ষিগণ যেন উত্তর করিল, 'বৃক্ষে লতিকা বেঠন করিলে, প্রায়ই ফলের
 মিষ্টতা অপহৃত হয়। সময়ে সময়ে উভয়ের মিলনে ভাল ফল হয় বটে,
 কিন্তু প্রায়ই বিষময় ফল উৎপন্ন হয় ; আমরা তাহা ভক্ষণ করিলে মরিয়া
 যাইব, তাই নিরানন্দ।'

দেখিতে দেখিতে একটি মনোহার বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল ; বিন্দুর হৃদয়-
 সাগরের লীনতরঙ্গ সহসা উখলিয়া উঠিল—ভাবিলেন, আমি অনেক সহ্য
 করিয়াছি, অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াছি, তত্রাচ বিশ্রাম করি নাই। ভাবিতে
 ভাবিতে বিদ্যাবাসিনী সেই বৃক্ষ সন্নিধানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন ; সুমিষ্ট
 বায়ু বহিতে লাগিল, শরীর শীতল হইল ; সেই বৃক্ষের পরিপক্ক ফল আহার
 করিবার জন্ত যেন তিনি অস্থির হইলেন। বিদ্যাবাসিনী আর ধৈর্য ধরিতে
 পারিলেন না ; অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মভয় এবং সমাজের ভয় তিরোহিত
 হইল, সেই ফল পাড়িতে অভিলাষ জন্মিল।

ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না, তিনি বাহু বিস্তার পূর্বক যেন বৃক্ষে আরোহণ
 করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য—পঞ্চাৎ দিক হইতে অন্ননিই কর্ণে শব্দ
 প্রবেশ করিল। বিদ্যাবাসিনীর মনে ভয় হইল, সহসা যেন অবতরণ করিলেন,
 ক্ষণকাল পরে শুনিলেন কে যেন বলিতেছে, 'বিন্দু! তুমি যে এত অল্প
 সময়ের মধ্যে সংসার-মায়ায় এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সংসারের
 বিষফল ভোজনে অভিলষিতা হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাহা
 হউক, জানিলাম, এ সংসারণ্যে সতী নারী অতি বিরল।'

বিদ্যাবাসিনীর বাক্য ফুটল না, লজ্জিতা হইয়া অনিমেষ লোচনে, শব্দের
 উৎপত্তি স্থান লক্ষ্য করিয়া চাহিলেন—বাহা দেখিলেন, তাহা ভাল বুঝিতে
 পারিলেন না। মনের মধ্যে একটা চিন্তা ছিল, সেই চিন্তার রেখা

কল্পনায় উদ্ভিত হইল, দেখিলেন, শরৎচন্দ্র যেন দূরে পলায়ন করিতেছেন ।
দেখিয়াই উন্নতের আয় ধাবিতা হইলেন ; বর্তমান অবস্থা তাঁহার মনে
ছিল না । অরণ্য হইতে ছুটিয়া যাই লোকালয়ের দিকে যাইতেছিলেন,
এমন সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া বিন্দুকে ধরিল । বিদ্যাবাসিনী
অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমরা আমাকে ধরিলে কেন ?

উত্তর হইল—কেন ? তুমি দোড়িয়া কোথায় যাইবে ?

আমি পুড়িয়া মরিতে যাইব ।

কোথায় পুড়িয়া মরিতে চলিয়াছ ?

বহ্নিতে ।

‘বহ্নি কি আমরা বুঝি না । যদি আগুনে এই দেহ পোড়াইতে
ইচ্ছা থাকে, তবে ঘরে চল, আগুন জালিয়া দেওয়া যাইবে ।’

‘আমি যে বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাই, তাহা ঘরে নাই । ঘরে থাকিলে
আমি কি ছুখে ঘর ছাড়িব ?’

তবে তোমার সে বহ্নি কোথায় ?

সে রূপ-বহ্নি আমার হৃদয়ে ।

তোমার হৃদয়ে, তবে পুড়িয়া মর না কেন ?

আমিও এই বহ্নিতেই পুড়িয়া মরিতে চাই, কিন্তু মরিতে পারি না ।
আমার একমাত্র ছুঃখ এই, হৃদয়ে বহ্নি থাকিতেও পুড়িয়া মরিতে পারি না,
সে বহ্নি আমার হৃদয়ে প্রচ্ছলিত হয় না । তোমরা আমাকে ধরিলে কেন ?
ছাড়িয়া দেও—আমি যাই—যাইবই যাইব ।

‘বিন্দু ! তুমি কি উন্মত্ত হইলে । ছি ছি—তোমাকে দেশ স্তর লোকে
নিন্দা করিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না ? চল, এখন ঘরে চল ।’

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাবাসিনী একটু লজ্জিত হইলেন ! শরৎচন্দ্রের রূপ
তাঁহার মন হইতে বিদায় হইল ; বলিলেন চল, ঘরেই যাইতেছি । এই কথা
বলিয়া বিদ্যাবাসিনী গৃহাভিমুখে চলিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অজ্ঞাত
স্ত্রীলোকেরা সারি দিয়া যাইতে লাগিল ।

মেয়ে-স্বভাব এই, দুই তিন জন একত্রিত হইলে আর তাহারা নিস্তক-
ভাবে থাকিতে পারে না, কথায় কথায় তাহারা সামাজ্য ঘটনাকে সূহৎ
করিয়া তুলে । এই ঘটনার পর দেশময় রাষ্ট্র হইল যে, বিদ্যাবাসিনী উন্মত্ত

হইয়াছে। যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল। অনেকে বিদ্যাবাসিনীকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

এদিকে বিদ্যাবাসিনী ঘরে আসিয়া কতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, পূর্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিল; আবার স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নের কথা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণা হইল না; হঠাৎ বিদ্যাবাসিনীর মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“বিন্দু—বিন্দু! তুমি একবারে অর্ধৈর্ষ্য হইলে? ছি! তোমাকে সকলেই মন্দ বলিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?”

অঁপার ঘরে দীপ জলিয়া উঠিল, বিদ্যাবাসিনীর চেতনা হইল; মাসীকে সম্মুখে দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইল; আবার সহসা সে আনন্দ নিরানন্দে মিশিল। বিদ্যাবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে যে বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহার কিছু সন্ধান পাইয়াছ?

মাসী।—না বিন্দু! আমি তোমার এই প্রকার অবস্থার কথা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি; তাঁহার কিছুই সন্ধান করিতে পারি নাই।

বিদ্যাবাসিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল, আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু বাক্য ফুটিল না।

মাসী বলিলেন, “বিন্দু ওরকম কর কেন, ও কি?” বিদ্যাবাসিনী নিরুত্তর, তাঁহার মাসীর ক্রোড়ে পড়িয়া গেলেন; পড়িতে পড়িতে চক্ষু মুদ্রিত হইল, আবার দেখিলেন—“তিনি যেন একটা সুদীর্ঘ প্রাস্তরের মধ্যে দিয়া বাইতেছেন। প্রাস্তরের মধ্যস্থান অতি রমণীয়। সেই রমণীয় স্থানে তিনি যেন প্রথমে একটা মাত্র সুদীর্ঘ পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথ অবলম্বন করিয়া বাইতে বাইতে পথিমধ্যে একটা অপূর্ণ বিড়াল দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার মন ভুলিয়া গেল, তিনি বিড়ালটির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বিড়ালটা তাঁহার পোষ্য হইল, তাঁহার প্রিয় হইল। সেই পথের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, সেই ধারা-বাহী অবক্র পথ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কোন্ পথে যাইবেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অবাক হইলেন। সেই বিড়ালটা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়া বাইতে লাগিল; তাই বিড়ালকে মনে মনে একটু একটু ভাল বাসিলেন। তিনি অল্প দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে-

ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বিড়ালটি অল্প এক পথে চলিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিলেন না। ফিরিয়া বিড়ালটিকে না দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়া যাই পাশ ফিরিতে লাগিলেন, অমনি কর্ণে প্রবেশ করিল, 'বিন্দু! বিন্দু!' বিদ্যাবাসিনী বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। মাসী বলিতে লাগিল; 'বিন্দু! তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে অস্থির হইলে? তোমাদের মধ্যে যে প্রকার ভালবাসা, তাহাতে আমার বেশ বিশ্বাস আছে, শরৎচন্দ্র তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না।

বিদ্যাবাসিনী বলিলেন—'মাসি! আমি তোমাকে সংক্ষেপে পত্র লিখিয়াছিলাম, 'এই পত্র দেখ' বলিয়া শরৎচন্দ্রের পরধানি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মাসী পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন—'দেখ বিন্দু! তোমাকে উপদেশ দেই—এমন আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তবে একবার তোমার নিকটে যাহা উপদেশ স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি। সংসার-সমুদ্রে জ্বালোকের ঐর্ষ্যা চাই, তাহা কি তুমি জাননা? স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে, তরী অনায়াসে বায়ু ভেদ করিয়া, তুফান কাটিয়া চলিয়া যাইবে। দেখ যখন পাল ছিঁড়িয়া যান, তখন কি করা উচিত? পাল ছিঁড়িলে নৌকা আপনি নড়িয়া উঠে, তুফানে কাঁপিতে থাকে। যদি তুমি এই সময় ঐর্ষ্যা ধরিয়া স্থির ভাবে থাকিতে পার, তাহা হইলে নৌকা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু যদি চঞ্চল হও, জীবন-তরী জলমগ্ন হইবে। তোমার এইক্ষণ পাল ছিঁড়িয়াছে, তুমি কি ঐর্ষ্যা ধরিবে না?'

বিন্দু।—মাসি! আমি বাঁচিব না, মরিব, এ প্রাণে আর কাজ কি?

মাসী।—'বিন্দু! তোমার কথা শুনলে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হয়। দেখ, তোমার সম্বন্ধে কত মেয়ে বিধবা হইয়া চিরকালের মত সুখাশায় বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! তাহাদের বাঁচিয়া কি সুখ? সুখ নাই, তবুও তাহার বাঁচিতেছে। তোমার কি? তোমার সুখের দিন এখনও আসিতে পারে। 'শরৎচন্দ্র বিদেশে গিয়াছেন, তাহাতে তোমারই শেষে সুখ হইবে। শরৎচন্দ্র বিচক্ষণ লোক; জানেন, জ্বালোকের স্বভাব বড় মন্দ; বড় মায়ী বাধাইতে পারে, তাই তোমাকে ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছেন; তাহাতে তুমি ব্যস্ত হও কেন?'

বিন্দু।—‘মাসি ! তুমি আমাকে যাহা যাহা বলিলে, তা সকলি বুঝি ; কিন্তু এবার আমি কার্য্যে কিছুই করিতে পারি না, মানুষ আমাকে পাগল বলিতেছে, কিন্তু তাহা বুঝিয়াও সারিয়া চলিতে পারিতেছি না। যখন আমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তখন আমি অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু স্থির ভাবে থাকিতে পারি না। যখন অট্টেতন্ত্র হইয়া পড়ি, তখনই স্বপ্ন দেখি। মাসি ! এবার আর আমার উপায় নাই !

মাসী।—‘দেখ বিন্দু ! দিন যাইতেছে ও যাইবে। তুমি কষ্ট পাইতেছ, তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু মানুষে তাহা বুঝিতেছে না। তাহার কেহ তোমাকে পাগল বলিতেছে, কেহ বলিতেছে, তোমাকে ভুতে পাইয়াছে। তুমি যে যন্ত্রণা সহ করিতেছ, এ যন্ত্রণা সকল সতীরাই সহ করেন। বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সকলকেই সহ করিতে হয় ; কিন্তু অনেকেই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন। জোয়ারের পর ভাটা এবং ভাটার পর জোয়ার আসিবে, ইহা তাঁহার জ্ঞানেন, তাই সহ করেন। দুঃখ সহ না করিলে সুখ হয় না, ইহা জানিয়াই তাঁহার সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে মস্তকে বহন করেন। তাঁহার জ্ঞানেন, পিঞ্জরের পাখীর মনোদুঃখ এবং বেদনা কেহই বুঝিতে পারে না, তাই সহ করেন। সহ করিবে না, তবে কি করিবে ? অস্থির-চিন্তকে লোকে পাগল বলে। দেখ, তুমি পিঞ্জরের পাখী, অস্থির হয়েছ, তোমার এত কষ্ট বোধ হইতেছে যে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছ না, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহার তোমাকে পাগল বলিতেছে। তোমার কষ্ট তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিতেছে ? দিন যাইবে, কিন্তু ছর্নাম ঘুচিবে না ; এমন স্থলে ধৈর্য্য ধরিবে না ত আর কি করিবে ?”

বিন্দুবাসিনীর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, আবার অস্থির হইয়া পড়িলেন ; মাসী তাঁহার গুঞ্জন করিতে লাগিলেন, বিন্দুবাসিনী আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—“একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তিনি যেন একটা পাখী পাইলেন, পাখিটা অতি সুন্দর। সেই পাখীর স্বর তাঁহার নিকট বড়ই মিষ্ট বোধ হইত। পাখিটা ও তাঁহার কাছে কাছেই থাকিত। এই প্রকারে বৃক্ষের অনেক দূর উঠিলেন, এমন সময়ে ব্যাধ আসিয়া ফাঁদ পাতিল ; বৃক্ষস্থ সকল পাখী উঠিয়া গেল ; সেই সময় হইতে তাঁহার সেই সুন্দর পাখিটা ও আর নয়নগোচর হইল না।”

পাখিটিকে দেখিতে না পাইয়া বিন্দু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন ।

মাসী বলিলেন, বিন্দু ! ভয় পাইয়াছ ?

বিন্দুবাসিনীর চেতনা হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—“এই দেখ মাসি, আবার স্বপ্ন দেখিলাম ; আমার আর উপায় নাই । আমি স্বপ্নেও যাহা যাহা দেখি, জীবনেও তাই । আমার জীবনের শেষাংশ বিচ্ছেদানল জ্বলিতেছে, আবার স্বপ্নেও তাই । আমার আর উপায় নাই । আর সহ হয় না, আমি মরিব, জলে ডুবিব—স্রোতে ভাসিব, শরীর জুড়াইবে ।”

মাসী।—বিন্দু ! আর কেন ? লোকে তোমাকে ঘৃণা করে, পাগল বলে, ছি একটু ধৈর্য্য ধর না কেন ?

বিন্দু।—ঘৃণা কি ? যাহার ইচ্ছা সে ঘৃণা করুক । লোকের কথায় আমার কি ? আমার ঘৃণার ভয় নাই ; না থাকিলেও মাসি, আমি আর এখানে থাকিব না । বাবা বড় বিরক্ত হয়েছেন ; তাঁহাকে যে যা বলে, তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন । মাসি ! অন্যে যে যা বলে বলুক, বাবাও যখন আমাকে বলেন, তখন আমার আর সহ হয় না । মাসি ! আমাকে বুঝাইলে কি হইবে ? তুমি আমার জন্ত অনেক কষ্ট সহ করিয়াছ, আমি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি । আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মনের বেদনা আর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না । সহ করা উচিত, তা জানি, কিন্তু এখন সহ করিতে পারি না । আমার মন ধৈর্য্য ধরিতে চায় না । আমি কি করিব ? তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর কাহাকেও বলিও না ; আমাকে বাধাও দিও না । আমি এবার পিঞ্জরা ভাঙ্গিব, তুমি বলিবে, তাহা হইলে আমাকে লোকে হুশ্চরিত্রা মনে ভাবিবে ; ভাবে ভাবুক, লোকের কথায় আমার ভয় নাই । শরৎকালে আমাকে কখনই দোষী মনে করিবেন না, অন্যের কথায় আমার কি ? তিনি বেশ জানেন, আমি তাঁহার চরণ ভিন্ন অন্য কিছু জানি না । আমাকে আর উপদেশ দিও না । আমার মন যাহা চায়, তাহা না পাইলে সামান্য উপদেশে আমার কিছুই হইবে না । আমি এবার নিশ্চয় পিঞ্জরা ভাঙ্গিব ।

মাসী বিন্দুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন । অনেকরূপ ভাবিয়া বলিলেন, তবে আমাদের সহিত এই শেষ দেখা ?

বিন্দু।—না মাসি ! বাঁচিয়া থাকিলে আবারও দেখা হইবে ।

মাসী।—আর কি বলিব ! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ।

এই বলিয়া মাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন ।

বিক্র্যবাসিনীও সেই দিন বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার পিত্রালয় ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অল্পে অল্পে—পথে পথে ।

যে রজনীতে বিক্র্যবাসিনী তাঁহার পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সে রজনী সময়ানুসারে পোহাইল । পাখীরা ডাকিল । জলীয় বাষ্প জলের উপরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, শীতল বায়ু তাহা-
দিগকে লইয়া ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, বৌ-কথা-কও পাখীরা ঘাটের ধারে বৃক্ষোপরি বসিয়া বিবাদে, ঘাটে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । আর এক প্রকার পাখী, বিলাসপ্রিয় লোকদিগকে ‘চোকগেল চোকগেল’ বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে লাগিল । যবনের বাড়ীর ঘরের পার্শ্বে, কংশের ছুংখে ছুংখিত হইয়া কুক্কট সকল ‘কংসার সার সার’ করিয়া মিনতি করিতে আরম্ভ করিল । পথিকেরা পথে চলিতে আরম্ভ করিল ; বৃক্ষেরা ছুংখের জলে তাহাদিগকে সিক্ত করিতে লাগিল । ফুলের বাগানে কুমারীগণ দেবার্চানার জন্ত ফুল তুলিয়া ডালা পূরিতে লাগিল, ফুলের গাছ ক্রোধে তাহাদিগের গায় জল ছড়াইয়া দিতে লাগিল । ফর্সা হইল, গৃহ-কোণের বোরা বাসন মাজিতে ঘাটে চলিল । নব বিবাহিত বর লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া নববিরহিণীকে বিবাদ সাগরে তাসাইয়া দ্রুতবেগে ছুটিল । দাসীরা হাঁড়ি হাতে করিয়া গোমাই-ছড়া দিয়া পথের অপবিত্রতা দূর করিতে লাগিল । পুকুরের ধারে ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্যের উপযোগী হইতে লাগিল । কৃষকেরা প্রাতঃভোজন লইয়া আফ্লাদে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিল । রাখালের গরু ছাড়িল । গ্রাম্য জমিদার ‘কাহার সর্বনাশ করিবেন’-এই কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিলেন । গ্রাম জাগিল—নিকটবর্তী ক্ষুদ্র নদীর স্রোতে বুক দিয়া আস্তে আস্তে নৌকা সকল ভাসিয়া বাইতে লাগিল, মাঝীরা আমোদে স্তম্ভর টপ্পা গাইতে লাগিল । প্রভাত কাল, সকলেই

কার্যে তৎপর হইল, আর এদিকে বিদ্যাবাসিনীর কারাগার স্বরূপ শয়ন গৃহ ছুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল ।

আন্তে আন্তে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া তীক্ষ্ণতর দীপ্তিরাশি ঢালিতে লাগিলেন । বিন্দুর ঘরের দরজা আবদ্ধ, প্রথমে কেহই এঘরের দিকে চাহিয়া দেখে নাই । কতকগুলি স্ত্রীলোক বিদ্যাবাসিনীকে দেখিতে আসিয়া গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল, দরজা আবদ্ধ দেখিয়া যাহার মনে যা উঠিতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল । যাহারা লেখাপড়া জানিত, তাহারা আসিয়া দরজার গায়ে লেখা দেখিয়া বিস্মিত হইল ।

বিদ্যাবাসিনী যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন দরজার গায়ে এই পদটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

“ভাসানু জীবন-তরী, ছুঃখরূপ সাগরে ।

পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু, মনে রেখ আমারে ॥”

ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাসিনীর আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইল । যাহারা পড়িতে জানিত, তাহারা পড়িয়া দেখিল, যাহারা পড়িতে জানিত না, তাহারাও অস্ত্রের নিকট গুলিল । কেহ কেহ ছুঃখিত হইল, কেহ ক্রকুণ্ণিত করিয়া চলিয়া গেল, কেহ তামাসা দেখিতে পারিল না বলিয়া ক্ষুঃচিত্ত হইল ; আর কাহারও মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ।

হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি গগনভেদ করিয়া চতুর্দিক ছড়াইয়া পড়িল ।

মাতৃ-স্নেহ তুল্য জগতে আর অকৃত্রিম ভালবাসার দ্বিতীয় উদাহরণ নাই ; ইহার নিকটে সকলি পরাস্ত ; পৃথিবীর সকলেই এক জনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং একজনের বিরোধ-যন্ত্রণা সহ করিতে পারে, কিন্তু মাতা পারেন না । সন্তান মূর্খ হউক, পাগল হউক, বুদ্ধি এবং জ্ঞানহীন হউক, কিম্বা পৃথিবীস্থ সকল প্রকার দোষে দূষিত হউক, মাতার নিকটে তাহাই আদরের । সংক্ষেপে পৃথিবীর সকলেই মাতার নিকট সন্তানের কল্যাণের জন্ত পরিহার্য্য । বিদ্যাবাসিনীর মাতার কর্ণে যখন তাঁহার পলায়ন-বার্তা প্রবেশ করিল, তখন তিনি একেবারে অস্থির হইলেন । ক্ষণকাল স্থির ভাবে থাকিয়া, তারপর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

প্রতিবাসিনীদিগের মধ্যে যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ক্ষুঃচিত্ত হইয়া ফিরিয়া গেল ; আর কেহ কেহ আত্মীয়তা দেখাই-

বার জ্ঞাত বিদ্যাবাসিনীর মাতাকে সাস্থনা করিতে লাগিল। বিষয়মানে কোন বালসহচরী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর বিছানায় এক খানি পত্র দেখিতে পাষ্টল এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে পত্র লইয়া শীঘ্রই গৃহ হইতে অপসৃত হইল। শিরোনামায় নীরদার নাম। বাহিরে আসিয়া পত্র খানি খুলিল। পত্রখানি এই—

“আমি চলিলাম। পতি-অনুসরণে যদি স্থখ না পাই, তবে এদেহ পরিত্যাগ করিব। বাঁচিয়া কাজ কি? কার জ্ঞাত প্রাণ রাখিব?”

তোমারই—বিদ্যাবাসিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

রাজনীতি কি ?

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অগীত হইল, শরৎচন্দ্র তবু জগদীশ বাবুর কোন সংবাদ পাইলেন না; আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, হয় জগদীশ বাবুকে দস্তারা হত্যা করিয়াছে, নচেৎ তিনি পাটনায় গিয়াছেন। পাটনা শরৎচন্দ্রের গম্য স্থানের পথ; শরৎচন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া গম্য স্থানে বাসনা চরিতার্থ করিতে যাইবেন, ঠিক করিলেন।

শরৎচন্দ্রের বাসনা কি, তাহা তাঁহার পত্রে পূর্নই ব্যক্ত হইয়াছে, গম্যস্থান কোথায়? কে বলিবে?

আমীর খাঁর অন্তরে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাও একদিন প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্ট পুরস্কার আশ্রয়! হতভাগ্য নেপোলিয়নের চিরকীর্তি সেন্টহেলেনায় ভস্মীভূত হইয়াছিল; তাঁহার জীবনের গম্যস্থান কি হেলেনা? রাজনীতির বিড়ম্বনা! রণজিৎসিংহের বিধবা-মহিষী কিন্দনের নির্বাসন বারাগসীতে। এ সকল স্মরণ করিলে কি হইবে? ইংলণ্ডে প্রথম জেম্‌সের সময়ে চক্রান্তকারীগণের শেষ পুরস্কার!—স্মরণ করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের মনে প্রবেশ করিবার যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে সে-ই বুদ্ধিতে পারে, শরৎচন্দ্রের গম্যস্থান

কোথায়, এবং তাহার জীবনে পুরস্কার কি ? আমরা যখন শরৎচন্দ্রের মনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবনের ভাবী অন্ধের অভিনয়ের পর্য্যালোচনা করি, তখন আমাদের মনে পড়ে বৃটিশ গবর্নমেন্ট—আর মনে পড়ে সেন্টহেলেনা। আমরা ক্ষীণদেহধারী বাঙ্গালী, আমরা রাজনীতির গূঢ়ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না ; শরীর বিকম্পিত হয়।

রাজনীতির মূলমন্ত্র কপটতা। তোমার মনে যাহা জলিতেছে, তাহা বাহিরে প্রকাশিত না হইলেই তুমি রাজনীতিজ্ঞ, পৃথিবীর স্বর্ণমুকুট তোমার মস্তকে শোভা পাইবে ; আর প্রকাশ কর,—ঐ আশুমানদ্বীপ তোমার আবাস স্থান !! প্রবঞ্চনা করিতে শিখিয়া থাক আর না থাক, কপটী হইতে না শিখিলে, রাজনীতির উপযুক্ত তুমি নহ ! এই রাজনীতির কথা মনে পড়িলে আমাদের শরীর বিকম্পিত হয়। ঐ যে যুবক পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনের আশুনে অস্ত্র হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার মানসে মনের কথা সরল প্রাণে খুলিয়া বলিতেছে, সাবধান, রাজনীতি উহার জন্ত নহে। উহার দেশহিতৈষণা কারাবাসেই নিঃশেষিত হইবে ! আর ঐ যে পুকুরের ধারে ছইটী যুবক উপবিষ্ট হইয়া মনের কথা বলিতেছে, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, একবার পশ্চিমে চাহিতেছে, আর হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে, উহাদের গম্যস্থান ভাবিলে আমাদের হৃদয় হঃখে অবসন্ন হয়। তাই বলি, রাজনীতির শিক্ষা বিড়ম্বনার একশেষ ; বাঙ্গালীর সরল মন রাজনীতির উপযুক্ত নহে !

যাহা বলিতেছিলাম, ঐ বে পুকুরের ধারে ছইটী যুবক। একটা গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, আর একটা কতই কি বলিতেছে। শেষোক্ত যুবকটী যাহা বলিতেছিল, তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, সে সকল কবির কল্পনা, যেন ভাসিয়া ভাসিয়া হৃদয়-সরসীতে তরঙ্গ তুলিতেছিল। আর একটা ছই একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল, আর মনের আশুনে দক্ষীভূত হইতেছিল। কলিকাতা মহানগরী পশ্চিম দিকে বৃটিশ শাসনের জয়পতাকা বক্ষে ধারণ করিয়া মহা ধুমধামে মত্ত, অস্ত্রদিকে নির্জীব বাঙ্গালীর আবাস-স্থান, সে গুলী পল্লী।

যুবক ছইটী যেখানে উপবিষ্ট, সে স্থান বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত ; রাত্রি প্রহরাভীত, সে স্থানে আর লোক ছিল না। শেষোক্ত যুবকটী বলিতেছে,—
'আমার মতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। যে পাঁচ বৎসরের কথা বলিলে, এই পাঁচ বৎসরে হরত আরো পঁচিশ জন লোক যাইবে ; কিন্তু তুমি যদি

পথ না দেখাও, তাহা হইলে আর পাঁচ বৎসর পরে কেবল মাত্র একা তুমি । আবার দেখ, সেখানে গেলে হয়ত তুমি সুস্থ শরীরে থাকিবে, কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবেই ; কিন্তু এখানে থাকিলে, কে জানে যে এই পাঁচ বৎসর পরেও তোমার স্বাস্থ্যের কোন বিপ্লব ঘটিবে না ? নয় ধরিলাম, সেখানে গেলেও তোমার পীড়া হইতে পারে, এখানেও পারে, কিন্তু সেখানে গেলে তোমার মনের বাসনা চরিতার্থ হইবে, তাহাতে তোমার মনে যে সুখ হইবে, এখানে তাহা কখনই হইবে না ;—এখানে থাকিলে তুমি মৃতবৎ থাকিবে। তাই বলিতেছিলাম, যত শীঘ্র পার যাও । আর সয় না । মুসলমানদিগের রাজত্ব অত্যাচারময় ছিল, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তখনকার অর্থ বিদেশে যাইত না ; ভারতবর্ষের অর্থ ভারতবর্ষেই থাকিত । আবার দেখ, এদেশীয়দিগকে তাহার। কতদূর বিশ্বাস করিত ! আকবরের সৈন্যধ্যক্ষ মানসিংহ, কোষাধ্যক্ষ এদেশীয়, প্রধান মন্ত্রী তোদারমল্ল । সেরাজদৌলার সময় দেশ অত্যাচারে পীড়িত ছিল ; কিন্তু মোহনলাল, বিরবল, এবং জগৎসেট প্রভৃতিকে যে প্রকার বিশ্বাস করিত, এইরূপ এদেশীয়দিগকে সে প্রকার বিশ্বাস করে কে ? উচ্চ উচ্চ পদ সকলই বিদেশীয়দিগের ! আমাদিগের দেশ, আমরা তাহার শাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না ! আর হতভাগা বঙ্গালী—দেশের জন্ত রক্তপাত করা ইহাদিগের অদৃষ্টে নাই ।’ বলিতে বলিতে যুবকের নিস্তেজ শরীর উৎসাহে কম্পিত হইয়া উঠিল, বলিল, ইচ্ছা করে আমিও তোমার সঙ্গে যাই । আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা করে না ।

প্রথমোক্ত যুবকটি গভীর ভাবে বলিলেন, “স্থির হও । তুমি আমি কি করিতে পারি ? আমাদিগের আক্ষালন, উদ্ভীর্ণমান পিপীলিকার স্তায় । ইংরাজদিগের যে প্রকার দ্রুতগতিতে রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ইহাদের চরম সীমা কি, কে জানে ? যখন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মনে পড়ে—তখন স্বপ্নবৎ দেখি, সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া ইংরাজের প্রবল প্রতাপের বিজয় ভেরী নিনাদিত হইতেছে । ভাই ! অর্ধেক হইও না । তুমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—কি করিবে বল ? এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে বিশকোটি অধিবাসী, সকলেই নিস্ত্রিত ; তুমি কি করিতে পার ? আমাদের আশা কি ? এ জীবন থাকিতে কিছু দেখিব না, ভাবী কোন বংশ আবার ভারতকে স্বাধীন দেখিবে কি না, তাহাই বা কে জানে ? তবে যাই কেন ? শ্মশান ছাড়িয়া যাই কেন ?

জিজ্ঞাসা করিও না। উত্তর শাইবে না। কি উত্তর দিব ? এ মনে অহর্নিশি যে আশুনে জলিতেছে, তাহা প্রকাশ করিলে যাহারা বুঝিবে, তাহারা পুরস্কার দিবে,—কারাবাস, নয় স্বীপাস্তুর; আর যাহারা বুঝিবে না, তাহারা কিছু বলিবে না, বরং আমার এ আশুনে নির্দোষিত করিবার জন্ত বড়বস্ত্র করিবে।”

বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দ্বিতীয় যুবকের গলা ধরিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; বোধ হইল যেন নিশ্বাসের সহিত অগ্নিক্ষু লিঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় যুবকটা বলিলেন—‘দাদা, তোমার মনে প্রবেশ করিবার আমার ক্ষমতা নাই, হিমাদ্রিশেখর হইতেও তোমার মন উচ্চ। ঈশ্বর অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। সম্প্রতি তুমি কোথায় যাইবে ঠিক করিয়াছ ?’

প্রথম যুবক বলিলেন,—‘ভাই ! তুমি কোথায় যাইবে ? সংসারে কষ্ট যাহাদের সম্পৃক্ত, তাহাদের এই কার্যে প্রতী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের মন পাষণ হইতেও কঠিন এবং দৃঢ়, যাহারা পৃথিবীর দয়া মায়াকে বিসর্জন দিতে পারে, এ ভীষণ পথ তাহাদেরই জন্ত; তুমি যাইয়া কি করিবে ? চতুর্দশবর্ষীয় বালিকা তোমার সহধর্মিনী, বৃদ্ধ মাতা এখনো তোমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন, সংসার তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তুমি সংসার ছাড়িবে কেন ? আজ তুমি সংসার ছাড়িয়া দেও, কাল হু পা অগ্রসর হইতে না হইতেই ভাবিবে, সংসারে থাকিলে যে স্মৃৎ হইত, সে স্মৃৎ কোথায়, —আত্মীয়পরিজন কোথায়—স্বথের স্বপ্ন কোথায় ? তবে আমি যাইতেছি কেন ? আমি সংসারকে চিনিয়াছি, বিষময় সংসারের বিষের জালায় শরীর অস্থির। তাহার মধ্যে আবার আশুনে জলিতেছে, এ আশুনে যে দিন নির্দোষিত হইবে, সেই দিন আবার সংসারে প্রবেশ করিব। যাইব কোথায় ? ভাই আবারও জিজ্ঞাসা করিলে ? যাইব শ্মশান ছাড়িয়া। যেখানে শ্মশান নাই,—যেখানে শ্মশানের ভূতপ্রেত নাই,—যেখানে ইংরাজ নাই, যেখানে ইংরাজের রাজত্ব নাই। সে স্থান কোথায় ? সেই হিমালয়ের ধবল শিখর,—যে আজও স্বাধীন ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া কত রাজ্য উপরাজ্যের উখান্ন পতন দেখিতেছে, যে আজও ভারতীকে অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া অশ্রুপ্লাবনে সিক্ত হইতেছে, আর উৎ-

সাহ ও আশাকে বুকে বাঁধিয়া আজ্ঞাভাবী পরিণামের দিন গণিতেছে । আমি সেইখানেই যাইব । ভাই ! নীরদা এবং বিদ্যাবাসিনীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম, নীরদা জন্মভূমিনী, বিন্দুর জীবনের ভাবী অঙ্কে সুখ নাই ; ইহাদিগকে দেখিও ।’

দ্বিতীয় যুবকটী আবার বলিলেন—‘দাদা ! তুমি আর কত দিন পরে ফিরিবে ?’

উত্তর হইল ‘কে জানে, কতদিন পরে আসিব ?’ ‘ভাই এ সকল কথা প্রাণান্তেও কাহাকে বলিবে না ।’

‘বলিলে কি হইবে ? দাদাদিগের নিকটও বলিব না ? ভাল, তুমি মধ্যম দাদা মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া যাইবে না ?’

‘না, আমি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না । স্বেচ্ছায় কে অঙ্গীকারকে বিসর্জন দিতে চায় ? শ্বশুরের কথা মনেই রাখিও ; কাহাকেও বলিও না ।’

এই প্রকার কথোপকথনের পর, বাহারা যুবক ছুটীকে জানিত, তাহারা আর শরৎচন্দ্রকে পরদিন দেখিতে পাইল না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সতীত্বের আদর্শ ।

কি দেখিলাম, আরও কত কি দেখিব । বাল্যকাল হইতে এই পর্যন্ত সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সংসারের সুখ,—আর দেখিলাম সংসারের অসুখ । পূর্বে স্নানিতাম, বিরহিনীগণ অধৈর্য্য হইয়া বিষম অনলকুণ্ডে শরীর বিসর্জন দিয়া স্বামীসহ স্বর্গারোহণ করিতেন, আর এখন দেখি, পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানিনী বান্ধালির ললনা, বৈধব্যদশারও ভোগবিলাসে বীতশুঁহ নহেন । আর পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকিলে দেখিব, সেই সাহেব আর এই বান্ধালী, সেই সাহেবের ললনা আর এই বান্ধালীর সহ-ধর্ম্মিনী । এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এখন বান্ধালীর পরিণাম ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন সতীত্ব বিস্মৃত হই,—মনে হয় সতীত্বই যেন সংসারের অসুখ,—এই সতীত্বের দশা ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে ?

বাক্যলীর বর্তমান সামাজিক অবস্থার ছায় শোচনীয় অবস্থা আর কখনও হয় নাই । অবগুষ্ঠনবতী সতীগণ অবগুষ্ঠন ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে অভিলাষিনী, পুরুষগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, ভয়ে, বিবাদে এবং আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে আবার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে মন্থ-শীল । লজ্জা সতীর অঙ্গের ভূষণ ; যে সতী, সে-ই লজ্জাশীলী, কিন্তু এখন তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে । বঙ্গে সভ্যতার স্রোত যে প্রকার বিপরীত গতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, কালে সতীত্ব বজায় থাকিবে কি না, কে জানে ? যদি সতীত্ব না থাকে, তবে মহত্ত্বও যে থাকিবে না, তাহাও ধ্বংস নিশ্চয় ।

এক বৎসর হইল অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে ; সহধর্মিণী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা,—তাহার বয়স এখন চতুর্দশ বৎসর ;—অতি পবিত্র, অতি নিষ্কলঙ্ক ; রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত ধবল পদ্মের ছায় । সেই বালিকাটী অবিনাশকে অত্যন্ত ভালবাসিত, এক দণ্ডও অবিনাশকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না । বিবাহের পর অবিনাশ স্বপ্নের বাড়ীতেই থাকিতেন । তিনি যখন স্কুলে যাইতেন, তখন সেই বালিকাটী পথপানে চাহিয়া থাকিত, বাড়ী আসিলেই অবিনাশের নিকটে যাইয়া তৃষিত হৃদয়কে শীতল করিত । বালিকার মনে লজ্জা ছিল না, অবিনাশচন্দ্রকে অবিনাশ বলিয়া ডাকিত । প্রথমতঃ অবিনাশচন্দ্র তাহাতে একটু একটু লজ্জিত হইতেন, কিছুদিন পরে সে ভাব গেল । ক্রমে ক্রমে অবিনাশচন্দ্রও সেই বালিকাটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন ।

যে দিন বিদ্যাবাসিনীর পলায়নের সংবাদ অবিনাশচন্দ্রের কর্ণে গেল, সে দিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া অবিনাশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে বালিকাটী আসিয়া অবিনাশের নিস্তব্ধতাব দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—‘অবিনাশ ! কি ভাবিতেছ ?’ এই বলিয়া অবিনাশের সম্মুখস্থ পুস্তকখানি অপসৃত করিয়া বলিল, অবিনাশ ! কথা বল না কেন ?

অবিনাশ চন্দ্র আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন ‘নলিনি ! হৃৎখের কথা শুনিয়া কি করিবে ? আমার মন আজ অস্থির হয়েছে ; আমি নীড়ই বাড়ীতে যাইব ।

বালিকাটী সহদয়ে করুণস্বরে বলিল—‘তোমার হৃৎখের কথা শুনিয়া কি করিব ?—হৃদয় থাকে কাঁদিব, তোমার হৃৎখের শেল যদি এ হৃদয়ে না বিধিল, তবে অবিনাশ, আমার জীবনে কাছ কি ?

অবিনাশচন্দ্র অকৃত্রিম ভালবাসার পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । নলিনী বলিতে লাগিল—‘তুমি বাড়ী যাবে আর আমি কি এখানে থাকিব ? আমিও তোমার সহিত যাইব ।’

অবিনাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তুমি যাইবে কোথায় ? হুঃখ তোমার অস্পৃশ্য—সুখ-শয্যা’তোমার জীবন-সহায় ; তুমি কণ্টকময় পথে আমার সহিত যাইবে কেন ? তুমি তোমার পিতা মাতার একমাত্র আদরের বস্তু, আদরে রক্ষিত, অমূল্য-প্রতিপালিত এই অধমকে তুমি যে কেন ভালবাস, আমি জানি না । কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে তোমার যখন কষ্ট হইবে, তখন আমি কি করিব নলিনি ? তখন কি প্রকারে তোমার কষ্ট দূর করিব ?

নলিনীর ঈষৎ রক্তিম মুখ আরো রক্তবর্ণ হইল, হুঃখে বলিল—সুখশয্যাঃ শুই বটে, কিন্তু তোমার আশা ছাড়িয়া এক দিনও থাকিতে পারি না । আমি পিতা মাতার আদরের ধন, তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তুমি আমার জীবনের আদরের ধন, আমি তোমাকে ছাড়িব কেন ? কষ্টের কথা বলিলে ? ছার কথা ! আমি তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়াছি, তুমি যে পথে যাইবে, আমিও সেই পথে যাইব । অবিনাশ আমি কখনও কি তোমার কোন কথা অবহেলা করিয়াছি ? তবে তুমি আমাকে এমন কথা বলিলে কেন ? তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই খানে যাইব ; কি ভয় ? তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমি কাহাকেও ভয় করি না । ।

শরৎচন্দ্রের সেই রজনীর কথা অবিনাশচন্দ্রের মনে জাগিল,—‘চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা তোমার সহধর্মিণী, হুঃখ তোমার অস্পৃশ্য, তুমি সংসার ছাড়িবে কেন ?’ ভাবিতে লাগিলেন, চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকার মনে যে তেজ দেখিতেছি, বিদ্যাসিনী মনে তাহা দেখি নাই । সহসা মনে এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হইল, শরৎচন্দ্রের জীবনের কণ্টকায়ুত পথের কথা স্মৃতি-পথকে অবরুদ্ধ করিল, যে কথার প্রসঙ্গে এত কথার সূত্রপাত হইল, সে সকল মন হইতে চলিয়া গেল, বলিলেন ‘নলিনি ! তোমার মদয়ে যে শক্তি, ইহা নারী চরিত্রের গৌরব, সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থির হও, একটু ভাবিয়া দেখ । আমার সহিত যাইবে ?—মনে কর, আমি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দেশান্তরে যাইতেছি, মনে কর সময়ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছি ; এমন সময়ে তুমি আমার সঙ্গে, তোমার মনে ভয় হয় না ?

নলিনী উত্তেজিত হইয়া পত্নীরভাবে বলিল ;—

“যে পথে যাইবে তুমি, যাইবে সে পথে,
বিজন কাননে কিবা জীষণ সমরে ।
কে ডরে সমর ক্ষেত্র ? কি ভয় আমার
তব সহ প্রবেশিতে সমর-অনলে ?
নলিনী-জীবন, প্রাণ, তুমি অবিনাশ
বাঁচিলে বাঁচিব, নয় মরিব নিশ্চয় ;
কি ভয় আমার তবে, যাব তব সাথে ।
মাতিলে সমর ক্ষেত্রে, মাতিব তখনি,
শোভিবে কোমল করে বীর-অহঙ্কার ;
কাঁপিবে সুরম্য পৃথী মম পদ ভরে ।
সাজিলে তপস্বী তুমি, সাজিব তখনি,
কি কাজ ভূষণে আর, নব তপস্বিনী ।
যাবে দেশে ? যাও তবে, চলিব এখনি
তব সঙ্গে, স্নুখ আশে জলাঞ্জলি দিয়া ;
পিতার অপার ধন, ঐশ্বর্য্য বিস্তর
মানি তাহা, কিন্তু জীবনের পরিণাম
নহে স্নুখশয্যা মম ; জানিও নিশ্চয়,
তুমিই সর্ব্বস্ব মম, নলিনী-জীবন ।
বিজলিয়া ঘনঘটা সৌমামিনী প্রায়,
মাতিয়া মাতাব সবে, তব সহ পশি
সমরে, খেলিবে বাহু, যদিও নিজীব,
বলশূন্য ক্ষীণকায়, তব বলে বলী,
যথা বৈশ্বানর খেলে প্রবল পবনে ।
না পারি সহিতে কষ্ট, মরিব, কি ভয় ?
সন্মুখ মরণ মোর যেন স্বর্গবাস !
চল তবে অবিনাশ ! যে পথে মানস !”

অবিনাশচন্দ্র স্বীর উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এমন সঙ্গিনী পাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া জীবনকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন । বাঙ্গালায় এমন রত্ন মিলে, পূর্বে তাঁহার এ ধারণা ছিল না ; নলিনীর অলস জীবন কথায় সে সংস্কার দূর হইল । তিনিও সানন্দে উত্তেজিত ভাষায় বলিলেন,—

“ধন্য নারী তুমি বন্ধে, সার্থক জনম
তব, ধন্য তব মাতা, যে মহা মানবী
ধরিলা যতনে গর্ভে, তোমা হেন ধনে ।

ধন্থ আমি পতি তব, বাসনা-মন্দিরে
 শুভফল ফলিবেক তব সহবাসে ।
 আমি ক্ষুদ্র স্বামী তব জানিলাম এবে,
 জীবন-বাসনা মম, মিটাইবে তুমি ।
 রপিত বিবাহ-সূত্রে, অধীন শূণ্যালে,
 কতু আমি ভাবি নাই, স্বাধীন রতন
 মিলে বঙ্গে, মিলে হায় বঙ্গাঙ্গনাসনে ।
 জীবন মৃণালে হায় ফুটিবে যে তুমি,
 কে জানিত ? ভাগ্যবলে নলিনী-জীবন
 মম, যাই তবে, যাই শরতের সনে ।
 যাবে তুমি প্রিয়তম চল তবে যাই,
 স্বাধীনতা অন্বেষণে জীবন ভাসাই ;
 যদি বুঝিয়াছ শার, স্বামীর জীবন
 আদর্শ সতীর বঙ্গে, চল এইক্ষণ ।

এই বলিয়া উৎসাহ মনে অবিনাশচন্দ্র যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগি-
 লেন, নলিনীও অবিনাশচন্দ্রের অনুসরণ করিবেন, এই মানসে আত্মানুভূতি
 মনে, সঙ্গে যাইবার দ্রব্যাদি একত্র করিতে লাগিলেন । সূর্য্য অস্ত গেল ।
 রজনীযোগে অবিনাশচন্দ্র নলিনীর হস্ত ধারণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন ।
 কিন্তু নিকটস্থ প্রহরী দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল । বিক্র্য-
 বাসিনীর অনুসন্ধানই অবিনাশের গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আড়ম্বরে
 তাহাও পূর্ণ হইল না, অনেক দিন পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবে থাকিতেই
 বাধ্য হইলেন । অবিনাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের অনুরোধ পালন করিতে পারিলেন
 না বলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন ।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিজন অরণ্যে ।

লেখকেরা কল্পনায় না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই । জীবনের
 বিগত ঘটনা তাঁহাদের কর্তৃত্ব, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বর্তমান জীবনের
 সামান্য ঘটনাও এড়াইতে পারে না ; ভাবী জীবন তাঁহাদের একচেটিয়া
 মহল ! অন্ধকারময় রজনীতে তরীকে অনির্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দেও, লেখকেরা
 তরীর পরিণাম বালিয়া দিবে । বাহা ঘটে, তাহা যিনি বলিতে পারেন, তিনি

কবি নহেন, অসাধারণ কল্পনার পথ অবলম্বন করিয়া যিনি অমানুষী প্রতাপের জ্বাল লোক সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই কবি। জন্মান্তর চক্ষু ফুটাইয়া যিনি অসম্পূর্ণ অঙ্গহীন কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে পারেন, তিনি উপজ্ঞান-লেখক হইলেও কবি, আর যাহাদের এ পথ কল্পনার অতীত, তাহারা কবিতা লিখিলেও কবি নহেন।

বিপদে আশ্রয়, রোগে আরোগ্য, হৃৎথের পরই সুখ, এই প্রকার ঘটনা লেখকপণের প্রধান অবলম্বন। যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তাহার যত বিপদে আশ্রয়, লেখকগণ মিলন পর্য্যন্ত তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া পুস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিবেনই করিবেন। এই জন্ত সুখ ও হৃৎথের স্বায়ীভাবে আধুনিক বাঙ্গালার পুস্তক পাঠে আমাদের মনে স্থান পায় না। যখন পুস্তকে লিখিত ব্যক্তি বিশেষের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া চক্ষু হইতে জল বাহির করিবার সময় হয়, তখনই মৃদু মধুর স্বরে কে যেন বলিয়া দেয়, “এ দিন যাইবে, ভান্দয় হইবে।” দিন যায়, রোগে আরোগ্য হয়, বিপদে আশ্রয় পাওয়া যায়, এ সকল কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এমন দিন কি ঘটে না, যে দিনের হাত আর এড়ান যায় না? এই প্রশস্ত জীবনক্ষেত্রে কেহই কি বিপদে পড়িয়া সময়-শ্রোতে মিশাইয়া যায় নাই? রোগে কত লোক মরে, কিন্তু পুস্তকে অল্পেরই দৃষ্টান্ত আছে, মহৌষধ নাগরিক নাগরিকার ঘোরতর পীড়াও আরাম করিয়া দেয়। এ সংসারে সকলেরই কি দিন যায়, কেহই কি দিনের সহিত মিশাইয়া যায় না? মিথ্যা কথা। বিশ্বাস করিতে পারি না, —যে চৈত্র-বায়ু-বিলোড়িত-তরঙ্গমালায় কপালকুণ্ডলাকে অগাধ-সলিলে ডুবাইল, সেই তরঙ্গ আবার তাহাকে বাঁচাইল। আধুনিক বঙ্গে স্বায়ীভাবে উদ্দীপক পুস্তক নিতান্ত অল্প। তাই বলিতেছিলাম, লেখকেরা কল্পনার না পারেন, এমন কার্য্যই নাই।

আমরা কবি নহি। সামান্য নৌকা বাহিয়া চলিয়াছি, যখন প্রতিকূল বায়ুতে সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠিবে, যখন দৈব বিপাকে নৌকা ডুবিবে, কিন্তু নৌকার সরঞ্জাম তরঙ্গে বিলীন হইবে, তখন আমরা আর তাহা তুলিব না, কাল-শ্রোত হইতে তুলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নৌকা চলিতেছে, তাই তরঙ্গ গণিতেছি, আশার চক্ষে সূদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। দিন না আসিলে,—তরঙ্গে তরী ডুবিবে,—আমরা হাইল ছাড়িয়া পলায়ন করিব, নৌকা বাহিবার সাধ একবার মিটিবে, আবার অন্ত নৌকা বাহিব। সংক্ষেপে

বিপদে আমাদের ভয় নাই; যাহা দেখিয়া আর দেখি না, তাহা দেখিবার জ্ঞান আমাদের মন ব্যাকুল নহে; যাহা দেখি নাই, তাহা দেখাইতেও বাসনা নাই; যাহা ডুবিয়া যায়, তাহা তুলিবার আমাদের সাধ নাই। সংসারের মতে আমাদের মত না মিলিলেও আমাদের পথ আমরা ছাড়িব না।

বিদ্যাবাসিনী সুংসার জাল ছিঁড়িয়াছেন,—উন্মত্তা বিন্দু সংসার-সমুদ্রে ভাসিতেছেন। সমুদ্রে ভাসিতেছেন,—কিন্তু তরঙ্গ বিন্দুকে ডুবার না, বিন্দুর ডুবিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তরঙ্গ ডুবাইল না। ডুবাইলে সংসারের হৃৎকোণ কে করিবে? বুঝিবা এইজন্তই বিন্দু সমুদ্রেও আশ্রয় পাইলেন, সে আশ্রয় কি, তাহা আমরা এখন ধিবৃত করিব।

অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে ফলে। কণ্টকিত সংসারে অধীনতার কঠোর শৃঙ্খলের ছায় কষ্টদায়ক বস্তু আর নাই। কিন্তু যাহারা অপরিণত অবস্থায় সেই পিঞ্জর তান্নিতে যত্ন করে, তাহাদের পরিণাম অন্ধকারময়—হৃৎকোণ-উদ্দীপক।

কয়েক দিন অপরিচিত গণ্ডে অনাহারে ভ্রমণ করিয়া আজ বিদ্যাবাসিনী যে স্থানে উপস্থিত, সে বিজন বন, ব্যাঘ্র এবং অন্তান্ত তরঙ্গর জন্তুগণের আবাসস্থান। সেই স্থানের:ছই দিকে নদী, একদিকে জঙ্গলময় ক্ষুদ্র প্রান্তর, প্রান্তরের অপর পার্শ্বে আবার অরণ্য, জানবের বসতিস্থান অনেক দূরে। এমন স্থানে বিদ্যাবাসিনী কেন আসিলেন? মরিবার জ্ঞান! অকৃত্রিম শ্রমের শেষ চিহ্ন মন হইতে অপসৃত করিবার জন্য কি?

বিজনবন, মধ্যাহ্ন সময়,—লীলাময় সূর্য্যদেবের রশ্মি কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া মৃত্তিকা সংস্পর্শ করিয়াছে, অন্য স্থানে রশ্মি নাই—অন্ন আলোকময়; কবির সৌন্দর্য্য, সাধকের সাধনার উপযুক্ত স্থান। বিদ্যাবাসিনী এই স্থানে আসিয়াছেন। অন্যদিন যেখানে যাহা পাইতেন, তাহাই উদরসাৎ করিতেন, অথা আর কিছু না পাইয়া কয়েকটা অপরিচিত ফল সংগ্রহ করিয়া তাহাই আহার করিলেন। ফলের মধ্যে একটা ফলে মাদকতাগুণ অধিক ছিল, খাইতে না খাইতে বিদ্যাবাসিনী এই স্থানে চলিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্নে বিদ্যাবাসিনী একটু সুস্থ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কয়েক জন শিকারী-ব্যাঘ্র অন্বেষণ করিতে করিতে আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। শিকারীগণের পশ্চাতে একটা বৃদ্ধ সাধক, ব্যাঘ্র-চর্কের জন্য শিকারী-গণের সহিত ছিলেন। শিকারীগণ বন্য পশুবাৎ। তাহারা বিদ্যাবাসিনীর

প্রতি তীর লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে অহুমতির জন্য ক্ষিয়রা চাহিলে সাধক বলিলেন—‘স্থির হ, প্রাণসংহার করিস্নে ।’ শিকারীরা তীর রাখিয়া পার্শ্বসিয়রা দাঁড়াইল, সাধক যাইয়া বিদ্যাবাসিনীর হস্ত ধরিয়৷ তুলিয়া বলিলেন, ‘মা ! তুমি এই অন্ন বয়সে কেন একাকিনী এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি, সংসারে আত্ম-হত্যার জায় আর পাপ নাই, তুমি স্মরিও না, আমার সহিত আইস ।’

বিদ্যাবাসিনী কথা বলিলেন না, সাধক হাত ধরিয়৷ লইয়া চলিলেন । অনতিদূরে একটা ব্যাঘ্রের গর্জন কর্ণে প্রবেশ করিল, শিকারীরা সাবধান হইয়া প্রস্তুত হইল, সাধক বিদ্যাবাসিনীকে বলিলেন ‘মা ! যে গর্জন শুনিলে উহা ব্যাঘ্রের রব, আমরা না আসিলে ঐ ব্যাঘ্র তোমার প্রাণ সংহার করিত, এখন আর ভয় নাই, আমার সহিত আইস ।’ ক্ষণকাল মধ্যে শিকারীগণের তীক্ষ্ণ শরে ব্যাঘ্রের মৃত্যু হইল, শিকারীরা সেই স্থানেই চৰ্ম্ম খুলিয়া লইল । সাধক বিদ্যাবাসিনীর হাত ধরিয়৷ লইয়া যাইতে লাগিলেন, শিকারীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ।

বন অতিক্রান্ত হইলে একটা ক্ষুদ্র নদী দেখা গেল, সেইখানে ছইখানি নৌকা সংলগ্ন ছিল ; সাধক একখানিতে বিদ্যাবাসিনীকে লইয়া উঠিলেন, শিকারীরা ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম নৌকায় উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেল । বিদ্যাবাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘পিত ! আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন ? আমি অবলা, আপনার ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছি—আপনার সহিত কোথায় যাইব ?’

সাধক বলিলেন ‘মা !—আমার সহিত যাইতে তোমার ভয় হইতেছে ? তবে তোমাকে ঐ নৌকায় দি, সংসারে যাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিও । যদি বিপদে পড়, তবে আমাকে স্মরণ করিও । তোমার শরীর ক্লিষ্ট, মস্তিষ্ক উষ্ণ বোধ হইতেছে, এই ফলটা খাও, স্নান হইবে ।’ বিদ্যাবাসিনী তাহাই করিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার পূৰ্ব্ব স্বাস্থ্য উপস্থিত হইল ; সসম্মে বলিলেন—‘পিত ! আমি আপনার সহিতই যাইব । আপনি আমার মনের কথা বুঝিয়াছেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার ঔষধ কি আপনার নিকটে নাই ।’

সাধক বলিলেন, মা ! আপাততঃ তুমি ঐ নৌকাতেই যাও ; আমি আর এক বৎসর বনে থাকিব, তার পর একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইব ; এই এক বৎসর পরে তোমাকে লইয়া যাইব ।

বিদ্যাবাসিনী আর কিছুই বলিলেন না । সে রাজ্যে সাধকের সহিত

রহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে সাধক উত্তর নোকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। যেখানে নদীর ত্রিকুণ্ড, সেইখানে যাইয়া অল্প নৌকার দাঁড়ী-দিগকে বলিলেন—‘তোমরা এই পথে যাইয়া ক্রমে দক্ষিণদিকে গেলে, একটা ক্ষুদ্র খাল দেখিবে, সেই খাল ধরিয়া গেলেই গোবিন্দপুরের নদী পাইবে।’

এই কথা শুনিয়া ছইয়ের ভিতর হইতে একটা লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; সাধক বলিলেন, রজনী! তবে এখন যাই; যে পথের কথা বলিলাম, এই পথে গেলেই গোবিন্দপুরের নদী পাইবে। এই অল্প বয়স্ক জ্ঞানলোকটাকে তোমার সহিত লইয়া যাও, এক বৎসর পরে আমি গোবিন্দপুরে যাইয়া ইহাকে লইয়া যাইব। বিদ্যাবাসিনীকে বলিলেন, “মা, এই লোকটাকে অপরিচিত ভাবিতেছ? আশঙ্কা নাই; ইহার সহিত যাও।” বিদ্যাবাসিনী সাষ্টাঙ্গে জ্ঞাপিত করিলে, সাধক আশীর্বাদ করিলেন; রজনী হস্ত ধরিয়া বিদ্যাবাসিনীকে তাঁহার নৌকার তুলিয়া লইলেন। সাধক আবার পথ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় নৌকা বিপরীত দিকে চালাইতে বলিলেন; সাধকের নৌকা নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

সাধকের নৌকা দৃশ্যের অতীত হইলে, রজনীবাবুর আদেশানুসারে তাঁহার নৌকা চলিল। প্রবাহিত জলভরঙ্গ ভেদ করিয়া তরী সম্বন্ধে ধাবিত হইল। তীর অরণ্যময়। সাধক যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি কতক দূর যাইয়া একটা ক্ষুদ্র খাল দেখা গেল, সেই খাল অবলম্বন করিয়া মাঝীরা নৌকা বাহিয়া চলিল। খালটা প্রশস্ত, কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম নহে; প্রায় একদিনের পথ হইবে। ছই প্রহর বেলায় সময় আকাশে সাদা মেঘ উড়িতেছিল; যাই বেলা পড়িয়া আসিল, অমনিই সেই সকল একত্রিত হইতে লাগিল। সূর্য মেঘে আবৃত হইল। উত্তরদিকে প্রথম লাল, তারপর দ্বয়ংকাল, অবশেষে কাকের ডিম যেন আকাশ ভরিয়া ছড়াইয়া পড়িল। পক্ষীগণ ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষ ছাড়িল—উড়িতে লাগিল। তীরস্থ জল কল কল করিয়া উঠিল। মেঘের ছায়া নদীতে পড়িল, নদীর জল নীলবর্ণ হইল। মাঝীরা বিপদের আশঙ্কা করিয়া জোরে দাঁড় টানিতে

লাগিল। নৌকা তীরে সংলগ্ন হইতে না হইতে ঝড় উঠিল, গাছের পাতা উড়িল—তীর হইতে ধূলা উড়িল। জল নাচিয়া উঠিল, তরঙ্গ উঠিল, এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গে গ্রহত হইয়া সজোরে ধাবিত হইল। জলের ভীষণ পর্জনে কর্ণ বধির হইল, ধূলা বর্ষণে দিক্‌ সঁাধার হইতে লাগিল। মাঝী-দের চেষ্টা বিফল হইল, তরী বেগে ধাবিত হইয়া স্থানান্তরে লাগিল। বিদ্যা-বাসিনী এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়াছিলেন, এখন ভীত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘এ কোন্‌ স্থান ? আপনি কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছেন ?

রজনী বাবু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—‘ভয় নাই, আমাদের তরী রক্ষা পাইবে। এই বলিয়া ছইয়ের বাহিরে যাইয়া নৌকা তীরে বাঁধিতে বলিলেন। কতক্ষণ পর্যন্ত প্রবলবেগে বায়ু বহিতে বহিতে আকাশের মেঘ উড়িয়া গেল, বৃষ্টি পড়িল না, বায়ুর বেগও থামিয়া আসিল, আদেশানুসারে খুলিয়া দেওয়া হইলে নৌকা আবার চলিল। রজনী বাবু ছইয়ের তিতরে আশ্রয় লইলেন।

বিদ্যাবাসিনী বলিলেন—‘সাধককে আপনি জানেন ?

রজনী বাবু বলিলেন—না; আমি বিশেষ কিছুই জানি না; ছই দিন হইল আমরা পথ ভুলিয়া অত্র পথে আসিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তিনি এক জন সিদ্ধ মহাপুরুষ। আপনার সহিত কি প্রকারে সাক্ষাৎ হইল ?

বিদ্যাবাসিনী সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রজনী বাবু শুনিয়া বলিলেন, ‘সাধকের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হইত।’

বিন্দু—আপনি কোথায় যাইতেছেন ? আমাকেই বা কোথায় লইয়া যাইবেন ?

রজনী—আমি গোবিন্দপুরে যাইব; গোবিন্দপুরে আমার মাতুলের বিষয়ের আমিই উত্তরাধিকারী; আমার নিবাস কৃষ্ণপুর। আপনাকে সাধকের আদেশানুসারে আমার সহিত গোবিন্দপুরেই লইয়া যাইব। এক বৎসর পর আবার সাধক আসিলে আপনি তাঁহার সহিত যাইবেন। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার আশঙ্কা হয়। সাধক মহাপুরুষ, তাঁহার আদেশ আমার পক্ষে দৈববাণীর স্তায়; আপনার পরিচয় না পাইলেও আমার ঘরেই আপনাকে রাখিব। কিন্তু আপনার পরিচয় দিলে বড়ই সুখী হইব।

বিদ্যাবাসিনী জীবনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। অপ্রাপ্ত বয়সে শরৎ-

চন্দ্রের সহিত বিবাহ, বিবাহের পূর্বের স্নেহ ; বিবাহের পরের অকৃত্রিম প্রণয়, শরৎচন্দ্রের পলায়ন, তাঁহার পত্র, এ সকলি বলিলেন। তারপর তাহার উন্নততা—পিতার কঠোর ব্যবহার, গৃহত্যাগ, পথের কষ্ট, সকলি বলিলেন।

রজনী বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“আপনি এত অস্থির হয়েছেন কেন ? সময় মত দ্ব্যবশ্যই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।”

বিন্দু।—জ্ঞানবুদ্ধিহীনা অবলা জাতি, কি বুঝে ? এ পথে আসিলে এত কষ্ট পাইব, পূর্বে জানিলে আমি এ পথে আসিতাম না।

রজনী বাবু।—আপনি যখন উন্নত হইয়াছিলেন, তখন আপনার কেমন বোধ হইত ? এখন আপনার আর কোন উদ্বেগ নাই ত ?

বিন্দু।—তখনকার কথা বলিতে পারি না। কল্যা সাধক আমাকে একটা ফল দিয়াছিলেন, সেই ফল খাইয়া অবধি একটু ভাল আছি ; কিন্তু ক্রমেই যেন আবার কেমন কেমন বোধ হইতেছে।

রজনী বাবু।—আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সংসার বিষময়। সুখই বা কি, দুঃখই বা কি ? দুই সমান। দুঃখ যদি এত কষ্টদায়ক না হইত, তাহা হইলে সুখও এত তৃপ্তি-প্রদ হইত না। যাহারা অনবরত সুখ সন্ধানেরে রত, তাঁহারা দুঃখের পর সুখ, কত সুখের, তাহা জানেন না। জগতে অন্ধকার না থাকিলে আলোকের এত আদর হইত না। অভাব না হইলে কোন বস্তুই মধুর বোধ হয় না। শৈশবে আমার জীবনতরী এক স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, জানিতাম না, উজানে তরী চালান কত কষ্টকর ব্যাপার। যৌবনে যাই তরী ভিন্ন স্রোতে ফিরিল, অমনিই হৃদয়-যন্ত্রে আঘাত পাইলাম, বুঝিলাম, কষ্ট কি ? ভাবিলাম, দুঃখ ভিন্ন সুখ, সুখপ্রদ নহে। তাই বলি, দুঃখই সুখ। আপনি দুঃখে পড়িয়াছেন, প্রকৃত সুখ-আপনার। আর আমি ? আর আমি যে এই ক্ষুদ্র জীবন-তরী লইয়া সংসার-সমুদ্রে কাঁপ দিয়াছি, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্মও সুখ নাই। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য এ সকল থাকিতেও আমার মনে সুখ নাই,—সুখ নাই,—বাল্যকাল আর আসে না, জীবনের অন্ধকারময় অংশ দিন দিন যেন নিকটবর্তী হইতেছে। বাল্যকালে যে সুখ ছিল, তাহা এখন নাই ; যৌবনে বাহা ছিল, এখন তাহাও নাই। প্রহরকার বলিয়াছেন,—“সকলের সুখই সীমা-বিশিষ্ট। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, নিয়মিত সুখের অধিক কখনই পাইবে না। কাহার সুখের সীমা নাই ? শরৎকাল,

—শরৎসুলভরী শোভায় শোভাযিত, কিন্তু এ শোভা কদিনের ?—পক্ষান্তরে আবার অন্ধকার হইবে। ফুলের বাগানে কত শত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অন্যের মন হরণ করিতেছে, কিন্তু এ শোভা কতক্ষণের, ক্ষণকাল পরেই আবার মলিন হইবে, ফুলের ভ্রাণ বায়ুতে মিশাইবে। সংসার-প্রান্তরের পথিক ! তুমি বলিবে, আবার নূতন ফুল ফুটিবে। তাহাতে তোমার অধিকার কি ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও অগ্রসর হইতেছ, এ বাগানের ফুলের ভ্রাণ তুমি আর কদিন ভোগ করিবে ? দিন যাইতেছে, তুমিও অগ্রসর হইতেছ, এ বাগানের অন্য ফুলে আর তোমার অধিকার কি ? অধিকার নাই—জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, কালের অবিশ্রান্ত গতি তোমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে ? দেখ—তোমার ঘোবন-ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, আর ফুটিবে না। সময়ের গতিতে মাহুষ যে স্থান অতিক্রম করে, তাহা আর ফিরে না, কিরে না—যে সময় অতীত হয়, তাহা আর নয়ন মনকে ডুলাইতে আসে না। কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ, আবার কিছু দিন পরে কোথায় যাইবে ? গত জীবন স্মরণ কর, সাবধান হও, বৃথা আশা করিও না ; তুমি কি করিতে পার ? ক্রন্দন করিলে কি হইবে,—অধীর হইলে কি হইবে, তুমি সামান্য সীমাবিশিষ্ট মানব, তুমি কি করিতে পার ? সৃষ্টির কোণল কে বুঝিতে পারে ? তবে আফালন কর কেন ? তবে গত সুখ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন কর কেন ? তবে যাহা গত হইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া থাক কেন ? ভ্রান্ত মানব ! আর কত দিনে তোমার ভ্রম দূর হইবে ?”

রজনী বাবু দেখিলেন, বিদ্যাবাসিনীর চক্ষুর প্রান্তভাগ দিয়া অবিশ্রান্ত জল নির্গত হইতেছে। দেখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, গত কথা স্মরণ করিলে যদি আপনার কষ্ট হয়, তবে আমি আর কিছুই বলিব না ; আপনি সমস্ত বিন্মত হউন।

বিদ্যাবাসিনী বলিতে লাগিলেন,—অস্তরের হ্রঃখ বাহির হইলে হ্রঃখ উপশম হয়। সে সকল কথা স্মরণ না করিলেও অস্তর গুপ্তভাবে দক্ষিণা যায়। হৃদয়ের কথা স্মরণ না করিলে যদি কষ্টের ভ্রাস হইত, তাহা হইলেও বরং বিগত কথা গোপনে রাখিতাম ; বিন্মত হইতে পারি না। গোপনে রাখিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে যন্ত্রণার একশেষ, মাথার বেদনার শরীর অস্থির।

রজনী বাবু সাত্বনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিদ্যাবাসিনীর

মস্তিক উষ্ণতর হইল; উন্নতের ন্যায় এই প্রকার প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন :—

ওলো সই—কিসের কথা, মাথার ব্যথা, বড়ই যাতনা,

বাসর ঘরে, প্রাণ বিদরে, বিধির ঘটনা ।

দেখ—নারীর প্রাণ, এমনি যান, শব্দ করে ধায়,

যবে,—বিরহবান হয়ে শতখান, সজোরেতে যায় ।

কার বা কে—তবে কেন হে এতই চঞ্চল,

বিধির খেলা, সকালবেলা—তাই—তাই—তাই ।

তাই—উঃ মাথা কামড়ানিতে যে আর বাঁচিনে, শরীর জলে যায় যে—

রজনীবাবু মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; বিদ্যাবাসিনী আবার বলিতে লাগিলেন—

কার জন্তে মঙ্গ-ভঙ্গ, হইলে চঞ্চল,

ইচ্ছা হয় উড়ে যাও, নিবাতে অনল,

আর যে সহেনা প্রাণে, বিরহ-যন্ত্রণা,

পরপ্রমে ভুলে মন, মিছে আর মজোনা ।

হায় জগদীশ্বর! অভাগিনীর প্রতি একটুও দয়া হলো না! দিনে দিনে কি ছিলেম, আবার কি হলেম। বিধাত! তোর মনে কি এই ছিল? এত যত্ন করে যে ধন হৃদয়ে পুষেছিলাম—শরৎ—তোর মনে কি এই ছিল? আমার দশা কি হলো! উঃ প্রাণ যায়! থাক—থাক—থাক—হিঃ—হিঃ আমি কাঁদিব কেন? একটা গান গাই—“সই—কেন আবার মনের আগুন জ্বলিলো;”

রজনী বাবু বিস্মিত হইয়া বিদ্যাবাসিনীর সকল কথা শুনিতে লাগিলেন এবং ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—‘পতি-পরায়ণা সতী—নারীর চঞ্চল মন সাগরের জল, অল্পেই তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়—বিচ্ছেদানল ভয়ানক, একবার জ্বলিয়া উঠিলে নিক্রম হয় না,—দ্রৌ লোকের উন্নততা—কি প্রকারে তিরোহিত হয়।’ এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল; সন্ধ্যায় প্রাকালে নৌকা গোবিন্দপুরের নদীর সন্মুখে আসিল। মাঝীদের আহ্লাদে শরীর নাচিয়া উঠিল, তাহারা পরিচিত পথ দিয়া গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। প্রায় এক প্রহর রাত্রিতে নৌকা গোবিন্দপুরের ঘাটে লাগিলে, রজনী বাবু উন্নত বিদ্যাবাসিনীকে লইয়া বাটীতে উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আরোগ্য ।

রজনী বাবু গোবিন্দপুরে পৌছিয়া প্রাণপণ করিয়া বিদ্যাবাসিনীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বিন্দুকে অল্পমনস্ক রাখিবার জন্ত লোক নিযুক্ত হইল; ভাল আহার, ভাল পরিচ্ছন্ন যোগান হইতে লাগিল, উপযুক্ত চিকিৎসক আসিয়া মস্তিষ্কের পীড়া আরোগ্য করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। বিদ্যাবাসিনীর জন্ত রজনীবাবু যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দপুরের স্নিগ্ধ জল বায়ুতে এবং চিকিৎসকের উৎকৃষ্ট ঔষধে বিদ্যাবাসিনী দিন দিন আরোগ্য হইতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়া গেলেন, দিন দিন তাঁহার উন্নততার লক্ষণ তিরোহিত হইতে লাগিল।

রজনীবাবু বিদ্যাবাসিনীকে স্বীয় কস্তার ছায় পালন করিতে লাগিলেন; বিন্দুর রোগ আরোগ্য হইলে রজনীবাবুর বিমল আনন্দ হইতে লাগিল। পীড়া আরোগ্য হইতে তিন মাস লাগিল। এই তিন মাসের মধ্যে এক দিনও শরৎচন্দ্রের কথা মনে উঠে নাই।

এক দিন বিদ্যাবাসিনী রজনী বাবুর বাটার একটা নিষ্করন কামরায় হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে দুইটা মাত্র ঘর, একটা নিকটবর্তী পুষ্পোদ্যানের দিকে, অপরটা অন্তঃপুরের দিকে। বিদ্যাবাসিনী প্রথম-বাতায়নে বসিয়া চতুর্দিক দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, বাগানটা অপূর্ণ, চতুর্দিকে নানা রকমের বৃক্ষের সারি, মধ্যে একটা পুকুর। পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ভ্রঙ্গণ অভিমান সহকারে সঞ্চিত মধু চয়ন করিতেছে,—শরোজিনীর মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেছে। জলে মৎস্যগণ ক্রীড়া করিতেছে, সাঁতার দিতেছে, আফ্লাদে পুকুরের জল নাচাইতেছে। জল ঘন অভিমান-শূল হইয়া নাচিতেছে, এক তরঙ্গে অল্প তরঙ্গ গ্রহণ করাইয়া তাহাদের হর্ষ বৃদ্ধি করিতেছে। জল বিলোড়িত হইতেছে, শৈবালসমূহ তৎসঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে এক ধারে সরিয়া যাইতেছে। নলিনীগণ জলের সহিত হেলিয়া

ছলিয়া নৃত্য করিতেছে, ভ্রমরগণ তাহাদিগকে মানিনী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে,—নিকটে যাইতেছে না। কিরংকণ পর বিদ্যাবাসিনীর দৃষ্টি জ্বায়াস্তরে পড়িল। তিনি দেখিলেন, বৃক্ষগণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ছুই একটা পাতা বৃক্ষ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে। অজ্ঞাতে স্ত্রীতল বায়ু মৃদু মৃদু ভাবে বৃক্ষগণের মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে পল্লব সমূহ কম্পিত হইতেছিল; বিকম্পিত পল্লবপুঞ্জের প্রতিঘাতে এক প্রকার শব্দ হইতেছিল, আর সেই শব্দে দূরবর্তী নির্জজন কলকণ্ঠের মধুর স্বর মিশিয়া আশ্চর্য্য ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছিল! সেই মধুর শব্দ লইয়া বায়ু আসিতে আসিতে আবার বিন্দুর শরীরে বিলীন হইতেছিল,—নিঃস্বার্থভাবে যেন আবার দূরবর্তী পুষ্পনিচয়ের সূত্রাণ আনিয়া নামারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেছিল! ফুলের গন্ধ তাঁহার নামারন্ধ্রে অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল; সূত্র-সংযুক্ত মলয়ানিল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; রমণীয় বিচিত্র শোভাবিশিষ্ট কত প্রকার দৃশ্য চক্ষুর দৃষ্টিকে অজ্ঞাতসারে অবরুদ্ধ করিতে লাগিল! এ সকলই বিদ্যাবাসিনী ভুলিলেন; সহসা তাঁহার মনে চিন্তার বেগ উদ্ভিত হইল, তাঁহার মন অন্যদিকে ধাবিত হইল, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের ঐক্য না হইলে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না; তাঁহার মন অন্যদিকে, স্মরণ্য সকলই বিস্মৃত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে আরো ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; ইচ্ছা অপূর্ণ অবস্থায় হৃদয়ে বিলীন হইল না, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—গাছ,—ভৃঙ্গ—পদ্ম—কোকিল। আবার একদিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াও মন ভাবনা ছাড়িল না, আবার ভাবনা উঠিল, বসন্ত, মলয়ানিল, আবার কোকিল। মন তৃপ্ত হইল না; আবার ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

মন তৃপ্ত হইতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কেন তৃপ্ত হইতেছে না? দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইল; সূত্র গুণিতে গুণিতে কর্ণ বধির হইল, সূত্রাণে সূত্রাণে মাসিকা আনন্দন শক্তি হইতে বঞ্চিত হইল, ভাবিতে ভাবিতে মন নিস্তেজ হইল, কিন্তু তবুও পোড়া মন তৃপ্ত হয় না! তৃপ্ত হয় না কেন? বিদ্যাবাসিনী বুঝিতে পারিলেন না; বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিত না; আবার ভাবনার ভয়ঙ্কর অঙ্গ ঢালিয়া, আন্দোলিত হইতে লাগিলেন।

দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব আরক্তলোচনে পশ্চিম শেখরে আরোহণ করিয়া, তদীয় গম্ভীর ভাব জগতে প্রচার করিতে লাগিলেন। রশ্মি উজ্জল অথচ মলিন; তীক্ষ্ণ অথচ কোমল; উত্তম্ভ অথচ শীতল, আলোকময় অথচ নির্ঝাঁপোনুধ হইয়া পৃথিবীস্থ সকলকে মাতাইতে লাগিল। অন্তর্মিত সূর্য্যের সেই রশ্মি, বৃক্ষগণকে অতিক্রম করিয়া পুকুরে পড়িল, পুকুর অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। সরোজিনীগণ, সেই রশ্মিতে শোভিত হইয়া নির্ঝাঁপোনুধ প্রদীপের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। মৎস্যগণ জলের উপরে উঠিয়া সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উজ্জলতা আরো মলিন হইয়া আসিতে লাগিল; পৃথিবী সমরাসুসারিণী সাজে সজ্জিত হইল।

বিন্দ্যবাসিনী একাগ্রমনে দেখিতে লাগিলেন, সূর্য্যের শেষরশ্মি জলের উপরে ছড়াইয়া পড়িতেছে; জল ঈষৎ পবনে বিকম্পিত, সেই কম্পিত জল মুক্তা সদৃশ টলমল করিতেছে। হঠাৎ এতাব তিরোহিত হইল। গোধূলি উপস্থিত! পৃথিবী হৃঃখের সাজ পরিল। পঙ্কোজিনী মলিন হইল। পুকুরের আনন্দ-লহরী জলে বিলীন হইয়া গেল। গম্ভীর ভাব চতুর্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। পক্ষীসকল হঠাৎ একবার কলবর করিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল। জগৎ নীরব, প্রকৃতি দেবীর শান্তি কোথায়ও ভঙ্গ হইতেছে না। বিন্দ্যবাসিনীর মনে কি ভাব উপস্থিত হইল, তিনি গাইতে লাগিলেন—
‘দীনদয়াল, কোথায় তুমি। একবার এসে দেখে প্রভু, যে হৃঃখে দিন কাটাই আমি।’

গীত সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। দাসী অজ্ঞাতসারে ঘর আলোকময় করিয়া চলিয়া গেল। রজনী বাবু সাক্ষ্য-সমীরণ সেবন করিতে করিতে বিন্দ্যবাসিনীর স্তমধুর স্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে পাদনিক্ষেপ করিয়া নিকটবর্তী একটি ফুলের ঝোপের মধ্যে অপ্ৰকাশিত ভাবে দাঁড়াইলেন।

সঙ্গীত সমাধা হইল; বিন্দ্যবাসিনী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—
‘জগৎজীবন! দাসীর সাধ মিটালে না? দিনে দিনে দিন চলিল, কিন্তু অন্তর অদ্যাবধিও পরিপূর্ণ হইলোনা, পাপলিপ্সা স্বদয় হইতে তিরোহিত হইলোনা, তোমার নিকটে কতবার কাঁদলেম, কিন্তু জন্মহৃঃখিনীর প্রতি সদয় হলে না! জগদীশ! আমার এ শুক স্বদয় লইয়া প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে

ধাকাতের আর ফল কি ? দয়াময় ! অধিনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেও করিলে না, আমার মনকে কিরাইয়াও কিরাইলে না। দুঃখে দিন গেলেও যদি এ মন অস্বপ্নী হতো, তা হলেও মনকে প্রবেশ দিতে পারিতাম ; কিন্তু কই তাত হয় না ? তবে আমার এত কষ্ট কেন ? নাথ ! তবে তোমার প্রতি মন ধাবিত হয়না কেন ? সংসার-সেবার অমুরোধে তোমাকে ভুলিয়া যাই কেন ? তোমাতে যে সুখ-প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাহাতে নিমগ্ন না হইয়া পাপ-পঙ্কযুক্ত সংসার-সলিলে আয়-বিসর্জন করিয়া সুখী হই কেন ? সংসারে সুখ নাই, ইহা কতবার প্রত্যক্ষ করিলাম, তবু মন ভুলে কেন ? দীনবন্ধু ! দীনীর আর উপায় নাই, তুমিই একমাত্র ভরসা ।’

বিদ্যাবাসিনীর বাক্য অক্ষুট হইয়া আসিল। হৃদয়ের প্রেম-উৎস সজোরে ধাবিত হইল। বাক্য সৌম্যবিশিষ্ট, স্তবরাং বাক্যের অতীত ভাব প্রকাশিত হইল না। বিদ্যাবাসিনী অবনত হইলেন, মুদিত নয়ন হইতে অবিরল ধারে প্রেম-উৎস ঝরিতে লাগিল। রজনীবাণ্ডু সেইখানে বসিয়া নির্জন স্থানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

এদিকে সংসার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। আকাশে নক্ষত্রগণ চন্দ্রমার সহিত দেদীপ্যমান হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। কোমল জ্যোতি সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া পড়িল। দিমের উজ্জল, উত্তপ্ত, প্রথর সূর্য্য-কিরণের পরিবর্তে, পবিত্র, শীতল, কোমল চন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, পৃথিবীর শরীর জুড়াইল। কত শত অনির্করনীয় শোভা রূপে রূপে প্রকাশিত হইয়া জগতের মনকে ভুলাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে বিদ্যাবাসিনীর চক্ষু উন্মীলিত হইল ; চন্দ্রের প্রতিভা তাঁহার নয়ন সম্মুখে পতিত হইল, হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। গভ কথ্য একে একে সকলই তাঁহার স্মৃতি-পথে পড়িতে লাগিল ; অভাব-পূর্ণ হইল ; হঠাৎ বলিলেন—‘এই কি শরৎচন্দ্র ।’

‘শরৎচন্দ্র’ নামটা মধুর বোধ হইল না। নামটা মনে পড়িতে পড়িতেই তাঁহার হৃদয় কল্পিত হইতে লাগিল। রক্ত-ধমনীর মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। নাম বিশ্বৃত হইয়া যে সুখ পাইতেছিলেন, তাহার সহিত ভুলনা করিতে লাগিলেন ; সুখ আরম্ভ হইল না। নামটা ভুলিয়া বাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন হইতে অপমৃত হইল না। অপমৃত হইল না—

বিন্দুর প্রধান অভাব পূর্ণ হইল। বিন্দুর শরৎচন্দ্র পুন বিন্দুর হৃদয়ে স্থান পাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সমছুঃখিনী ।

মালতী দেবী এখন পরিচারিকা। দম্পাদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ার এবং মকদ্দমার আশঙ্কার বকাউল্লা মাসী মালতীদেবীকে বিক্রয় করে। যেখানে দম্পা কর্তৃক জগদীশ বাবুর নৌকা দৃষ্টিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে দুই প্রহর অন্তরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের হরগোবিন্দ চক্রবর্তী নামক জর্নৈক ব্রাহ্মণ ঠাঁহাকে ক্রয় করেন। হরগোবিন্দ গোবিন্দপুরের কাছারীর নায়েব; মালতী দাসীকে বাড়ীতে রাখিলে লোকে মন্দ বলিবে, এই ভয়ে তিনি ঠাঁহাকে কাছারীতে আনিয়া রাখেন। মালতী দেবীর রূপ দেখিয়া অনেকেই বলিত—‘ভদ্র বংশীয়া কুলবধু দৈব বিপাকে দাসী হইয়াছে।’ সপ্তম অধ্যায়ে এক স্থানে যে দাসীর কথা উল্লেখ হইয়াছে, ঐ দাসীই হরগোবিন্দের ক্রীতা দাসী মালতী। মালতী স্বীয় অবস্থার কথা এ পর্যান্ত কাছারীও নিকট খুলিয়া বলেন নাই, কেহ এ পর্যান্ত ভাল করিয়া শুনিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করে নাই।

এক দিন আহাৱাস্তে বিদ্যাবাসিনী বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতে- ছিলেন, দাসী আসিয়া বলিল—‘ঠাকুরণ! আপনার এ প্রকার ভাব দেখি কেন? সর্বদাই অজ্ঞমনস্ক থাকেন, মুখে হাসি নাই, যেন কোন তাতেই কিছু সাধ নাই। আপনি এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আপনার প্রকৃত স্তরের সময়, আপনি এত মলিন ভাবে দিন অতিবাহিত করেন কেন?’

বিদ্যাবাসিনী দাসীকে অশ্রদ্ধা করিতেন না; স্বীয় অবস্থায় কাঠাকেও অশ্রদ্ধা করিতে দিত না, বলিলেন—আমি কান্দালিনী, তাই এই প্রকার মলিন ভাবে দিন কাটাই।

দাসী উত্তর করিল—আমার নিকটে প্রবঞ্চনার আবশ্যক কি? ‘বলিব না,’ বলিলে আমি আর দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিতাম না।

বিদ্যাবাসিনী।—তোমাকে বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? আমি

এই অট্টালিকার মধ্যে আছি, রজনী বাবু আমাকে অত্যন্ত ভাগবাসেন, তুমি মনে ভাবিতে পার, আমিই প্রকৃত স্ত্রী, বাস্তবিক আমার জীবনের কথা যে জানে, সেই বন্ধিতে পারে, আমার জায় হুঃখিনী আর সংসারে নাই। গত জীবনের কথা স্মরণে বিদ্যাবাসিনীর নয়ন জলে বন্ধ প্রাবিত হইল।*

দাসী বলিল।—আপনার জীবনের কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যদি কষ্ট হয়, তবে আর বলিবেন না। দেখুন আমার জায় হতভাগিনী আর নাই; আমি পূর্বে বা কি ছিলাম, এখন বা কি হয়েছি! কিন্তু কি করিব, অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কে খণ্ডন করিবে?

বিদ্যাবাসিনী পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্কর জল মুছিয়া বলিলেন—তোমার কথা শুনে বোধ হলো, তুমিও আমার জায় হতভাগিনী; তোমার জীবনের কথা বলিতে যদি বাধা না থাকে, তবে বল, আমার হৃদয় সম-হুঃখিনীর কথায় শীতল হইবে।

দাসী বিষাদ-ভারে বলিল—দেখ বোন!

হুঃখিনী মালতী লতা, অকালে শুকায়,
কি ভাবে যাপিছে দিন; কি স্নেহ না ছিল
অভাগিনী মালতীর হৃদয় নিলয়ে?
উদিলে সৌরীর কর সর সন্নিধানে
পঙ্কোজিনী থাকে কিলো অক্ষুট বলিলে?
কিঞ্চা যবে দিবানাথ, বিষাদিত মনে
আঁধারিমা দশদিক, প্রবেশে আলয়ে,
এ সময়ে কলঙ্কিনী হইলে উদিত,
থাকে কি নলিনীচয় আবরিত হয়ে?
হায় আমি কিবা স্বপ্ন দেখিছি ভূতলে!
কে কবে আমার ন্যায় বঞ্চিতা সে স্নেহে?
সহসা আকাশ মেঘে হলে আবরিত,
মলিন বদন সম কোমল কমল!
কিঞ্চা কাদম্বিনী হায়, উদিয়া অধরে
যবে চাকে কলঙ্কিনী, এমন সময়
কি দশা লো হয় খনি সরসোহাগিনী?
দেখিয়া তাদের দশা কাঁদিতাম আগে;

মম ভাগ্যে এবে হায় সকলি ঘটিল !
 জগদীশ প্রাণপতি ; সুখের সাগরে
 দিয়াছিল সুসময়ে সুখের সাঁতার ;
 কিন্তু হুঃখে কাটেপ্রাণ, অরিলে সে কথা,
 অসময়ে শুকাইল, সে সুখ-সাগর
 মম, মরুভূমি হায় এবে তথা বিরাজিত ।
 কত যে ভুলিল হায়, কি কব তা তোরে
 মৃগ-ভৃক্ষিকায় দেখে, এমরু প্রদেশে !
 দারুণ হুঃখের কথা, বলিতে হৃদয়
 ফাটিয়া বিদীর্ণ হয়, করে অশ্রুজল ;
 কিন্তু দেখ তেবে তবু রয়েছে এ প্রাণ ।
 ভেবেছিল তেয়াগিব এ পোড়া জীবন
 শীতল সরসী জলে ; উঠিল না মন ;
 সংসারে ঢুকিল পুনঃ সুখ-অশ্বেষণে ।
 আর কি সে সুখদিন, উজলিবে আর
 হুঃখ সস্তাপিত হৃদে, হায় পুনঃ কিলো
 মম নাখে দেখা পাবো, আর এ হৃদয়ে
 পুনঃ কি হাসিয়া পাত্তি বসিবেন আর ?
 অভাগিনী আমি হায়, তাই গর্ভবতী,
 না হলে কলক সুখ, চির অন্ধকারে
 লুকাতেম মনোসাখে, ভুলিয়া সে আশা !
 পতিবিনে সতী প্রাণে কি কাজ জগতে ?
 বসন্ত বিহনে হায়, কভু কি সম্ভবে
 আদর কোকিল করে, নিকুঞ্জ কাননে ?
 বারি-শূন্য জলাশয়ে কে করে আদর ।
 রমণী—সতীরপ্রাণ, বড়ই কঠিন,
 তাই দ্যাখ কাঁদিত্তেছি এ বিয়হ সনে,
 মণিহারী কণী হলে এসংসার মাঝে !
 শুনেছি পুরাণে নাকি, জনকনন্দিনী
 সরেছিল এ ব্রহ্মণা, সরল হৃদয়ে,

ধন্ত নারী সেই ভবে, ধন্ত নাম তার।
 যে অনল জ্বলিতেছে, এ পোড়া হৃদয়ে
 অহর্নিশ ; সাধ করে ত্যজিতে জীবন ।
 আশা করে ধৈর্য্য-সেতু বেঁধেছি এবার,
 ক্ষেত্রিব পতির মুখ, স্মৃথ অবলার ।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন 'তোমার কথা শুনে বোধ হয়, কোন এক দৈব
 বিপাকে পড়িয়া তোনার এই দশা হয়েছে, শুনিতে হৃদয় বড়ই উৎসুক, যদি
 কোন বাধা না থাকে, তবে সমস্ত কথা বল ।

দাসী পুনরায় বলিতে লাগিল,—

একদা সায়াক্কালে, বসিয়া বিরলে
 স্মৃথের সাগরে ঝাঁপ দিতেছিলাম যবে,
 কত যে লহরী-লীলা প্রেম-সরোবরে,
 বিনীত হইতেছিল, কত বা উথিত ;
 ভুলিলাম অবস্থা মম, সে স্মৃথ-সস্তোগে ।
 জগদীশ প্রাণপতি, ছিল সন্নিধানে,
 কত স্মৃথ (হায় আজ স্মরিলে সে সব
 বিষাদ-সাগরে ডুবি নিরাশ অন্তরে)
 কতরূপে উথলিতে ছিল এ হৃদয়ে
 মম, সহসা নিদ্রায় মুদিল নয়ন ;
 স্মৃথ-সূর্য্য অন্তর্মিত, সে কাল নিদ্রায়
 হইল জীবনে মোর, দেখিলাম স্বপন,
 কে যেন হৃদয়-মণি করিল হরণ ।
 আচম্বিতে উন্মীলিলাম এ ছার নয়ন
 (দেখিতে আঁধার হায় অসার সংসার)
 কিন্তু আর নাহি হায় হেরিলাম নয়নে
 সে নয়নে, নয়নের তারা মম এবে
 হরিয়াছে গুপ্তভাবে, অন্তর অন্তরে ।
 কত যে কাঁদিলাম বোন্, কি কব তোমারে ?
 জিজ্ঞাসিলাম প্রকৃতিকে, ময়ল বচনে,
 কিন্তু দুঃখিনীয়ে নাহি উত্তরিল কেহ

তথা, বিবাদে ফিরিছু নির্জন কাননে ।
 সরসীর তীরে বসে, চাতকিনী প্রায়
 কত যে ডাকিছু হায়, কিন্তু বৃথা সব !!

বলিতে বলিতে দুঃখিনী দাসীর কথা খামিয়া আসিল, নিস্তরুভাবে
 বলিল, আপনার দুঃখের কথা বলিতে যদি বাধা না থাকে, তবে ততক্ষণ
 আপনার কথা বলুন, আমার কথা আবার পরে বলিব ।

বিন্দ্যবাসিনী মুহূর্ত্তেরে বলিলেন—কি বলিব ?

পাগলিনী আমি, সতি ! কি কব তোমারে ?

কি কব কেন যে হায় মলিন বদন
 মম, অজ্ঞান অবলা, জানিনা অত্যাধা,
 পতিবিনে এ সংসার দুঃখের আলায় ;
 জানিনা কি কব আজ তোমার নিকটে ।

ছিল ভাল ছোট কাল—শৈশব সময়,
 ছিল ভাল না ফুটিয়া যৌবন-মুকুলে,
 ছিল ভাল না দেখিয়া সে শরত-টাদে,
 ফুটাইল যে নিষ্ঠুর এহুদ-কুমুদে !

সুকাইত যদি এবে প্রেম-সরোবরে,
 স্মুকুলে সে কুমুদ, তবে কিলো হায়,
 সহিতাম এত আলা এ মর-ভবনে ?
 যদি নাহি মনে মন অর্পিতাম আমি,
 তবে কিলো পুড়িতাম এ বিরহানলে ?

বালাকালে সে কলঙ্কে, অসময়ে হায়,
 ফুটাইল প্রেমকলি, হরিল অন্তর,
 কাড়িয়া লইল মম জীবন চঞ্চল !

সকলি ভুলিছু বৃথা, কপালের দোষে,
 ভুলিলাম বাঁধিবারে প্রণয়ের পাশে
 সে শরতে, মন প্রাণ সকলি অর্পিছু
 কৃষ্ণে তাঁহারে সতি, প্রেম ভরে মেতে ।

নিষ্ঠুর পুরুষ প্রাণ যদি জানিতাম
 আগে, তবে কিলো হ'ত এই দশা মম ?

যে স্নেহে ছিলাম স্নেহী, সেই স্নেহ মোর
 আর যে দেখিনা তাই পাগলিনী আমি,
 ইচ্ছা করে মরিবারে ; দেশত্যাগী হার
 হয়েছি অকালে ; আর পশিব না ঘরে,
 যতদিন উদিবে না, এ মন-অঘরে
 সর-কুমুদ-রঞ্জিনী, এই সাধ মনে ।
 কি কাজ সংসার স্নেহে, কি কাজ যৌবনে,
 যেই জন্ম হারাইলু সে কোমল করে,
 যাহা স্পর্শে স্বর্গ-স্নেহ পাইতাম মনে ?
 প্রতিজ্ঞা করেছি সতি, যতদিন আর,
 না পাইব সে জীবনে, ভ্রমিব বিদেশে,
 বিদেশিনী সাজ ধরে কাঞ্চালিনী বেশে ;
 পতি বিনে সতী প্রাণে কি কাজ লো স্নেহে ?
 শরচ্চন্দ্র মম পতি,—স্নেহের আধার
 গিয়াছেন দেশান্তরে করি অন্ধকার,
 এ হৃদয় অবলার ; না দেখে উপায়
 ভাঙ্গিয়াছি গৃহবাঁধ, বিরহ জ্বালায় ।
 করেছি জীবনে পণ, লভিব জীবনে,
 না হলে ত্যজিব প্রাণ জাহ্নবী জীবনে ।

মালতীদেবী বিদ্যাবাসিনীর জীবনের সকল কথা শুনিয়া, মনে মনে
 বলিতে লাগিলেন—ঈশ্বর, তোমার বিচিত্রলীলা কেহই বুঝিতে পারে না ।
 তুমি একাধারে স্নেহ ছুঃখ দেখিয়া স্নেহী হও । পদ্মকে এত কোমল করিয়াও
 তাহাতে আবার কণ্টক সৃজন করিয়াছ, চন্দ্রকে এত পবিত্র করিয়াও তাহাতে
 আবার কলঙ্কের রেখা রাখিয়াছ । আমরা অবলা, জ্ঞানহীনা, তোমার
 অপার লীলা-তত্ত্ব কি বুঝিব ?

বিদ্যাবাসিনী আর কথা বলিলেন না । অতি অল্প সময়ের ভিতরে
 উভয়ের মধ্যে গাঢ় ভালবাসা জন্মিল । মালতী দেবী বুঝিলেন, যে শরৎ-
 চন্দ্র নৌকায় দস্যুনিগের হস্তে পড়িয়াছিলেন, তিনিই বিন্দুর প্রাণ-পতি,
 বুঝিয়াও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই ; মনের আশুখে মনেই পুঙ্ক্তিতে

লাগিলেন । হুঃখিনী বিম্বু জীবনের আর এক অধ্যায় অতিবাহিত করিবার একটা অবলম্বন পাইলেন ; সে অবলম্বন—এই দাসী—এই মালতী ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

—:o:—

ললনা চতুর্দশ ।

স্বেচ্ছাচারিতা, বর্তমান শতাব্দীর বঙ্গবাসীগণের একটা মহৎ রোগ । স্বাধীন মত ও কর্তব্যজ্ঞান এবং স্বেচ্ছাচারিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ ! যাঁহার স্বাধীন মত নাই, কর্তব্য জ্ঞান নাই, তিনিই স্বেচ্ছাচারী । হুঃখর স্বাধীন প্রকৃতি মানবের মহাবল, কর্তব্যজ্ঞান সুদূর রাজনীতিজ্ঞের অল্পভূষণ, স্বেচ্ছাচারিতা সামাজিকগণের হৃদয়ের আত্মরিক দুর্বলতা । যে আর্ঘ্য, দ্রৌপদীর অপমানে অপমানিত হইয়া, মহাবিক্রমশালী কামী কীচককে চপটাঘাতে সমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই আর্ঘ্যের কর্তব্যজ্ঞান পৃথিবীর রাজনীতির আদর্শ । স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হইয়া যে রাবণ, দেবতাগণকে অবনানিত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার মহৎ রোগের ফল, রামের হাতে অসময়ে মৃত্যু । বর্তমান শতাব্দীর বঙ্গবাসীগণ স্বেচ্ছাচারী,—কিন্তু স্বাধীন মত নাই ; মনে বল নাই, কর্তব্যজ্ঞান নাই । সমাজের অধিনায়ক বীর্ঘ্যশালী পুরুষগণ এই প্রকৃতির, এমত স্থলে ললনাগণ যে একেবারে নির্জীবের স্তায় থাকিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ?

প্রমীলার স্তায় বীরনারী বঙ্গে দেখা যায় না ; সাবিত্রীর ন্যায় সতী কোথায় মিলে ? কুন্তী এবং দ্রৌপদীর স্তায় রাজনীতি-জ্ঞানে পণ্ডিতা রমণী সমস্ত বঙ্গ ভ্রমণ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না । দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে আর কিছু হুঁটুক, বা না হুঁটুক, এ কথা নিশ্চয় বলা যায়, স্বেচ্ছাচারী বঙ্গের স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত ফিরিবে না । যতদিন না ফিরিবে, ততদিন দেশ যেমন আছে, তেমনি থাকিবে ॥

আমরা বঙ্গের চারিটা ললনার চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ইহাদিগের মধ্যে অক্ষুট কিম্বা অর্ধক্ষুট ভাবে যদি কোন গুণ থাকে, তাহাও সম্যক বিকশিত নহে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার তাহা বিকশিত হইতে

পারে নাই ; যদি পারিত, তাহা হইলে এ সংসার সোণার সংসার হইত, এ বঙ্গ সোণার বঙ্গ হইত ।

মহাপরাজাস্ত ভীম, ভ্রাতার আজ্ঞাপালনে রত থাকিয়া দ্রৌপদীর অবমাননায় ক্রক্ষেপ না করিয়া, সময়তিপাত করিতেছিলেন, তখন সহসা যে তাঁহার হৃদয়ে দৈহ্যতি ছুটিল, সে বৈদ্যতি কাহার কথায় ? পুরাণ পাঠ কর, বুঝিবে, দ্রৌপদী না থাকিলে কীচক বধের অধ্যায় মহাভারতে স্থান পাইত না । আমরা জানি, চিরকাল বিশ্বাস করি, পুরুষের হৃদয়ে যদি কাহারও দৈহ্যতিক প্রবাহ ছুটাইবার ক্ষমতা থাকে, তবে সে ক্ষমতা ললনার । কিন্তু বঙ্গের ললনাগণ, বর্তমান শতাব্দীর ক্রীড়ার সামগ্রী,—স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ক্রীড়া দাসী । যতদিন পর্য্যন্ত এই ভাব সমাজে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন আর আমরা সমাজের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইব না ।

মানব প্রকৃতি স্ত্রী পুরুষে গঠিত । যেখানে এ দুইয়ের সম্যক বিকাশ, যেখানে এই দুইয়ের ছুশ্চেষ্টা মিলন, সেই খানেই সামাজ্যের সূত্রী ; ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকা তাহার উদাহরণ । কিন্তু যেখানে পুরুষ স্বেচ্ছাচারী,—দ্বায়ে পড়িয়া স্ত্রীও স্বেচ্ছাচারিণী হইতে বাধ্য, যেখানে পুরুষগণ স্ত্রীকে সংসার হইতে দূরে রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক, সে সমাজের অবনতির দৃষ্টান্ত আধুনিক বঙ্গদেশ । পুরাকালে স্ত্রী পুরুষের স্নন্দর মিলন ছিল, সেই সময়ে উজ্জল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আদর্শ, ভারতের গৌরব । যতদিন স্বেচ্ছাচারী স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া স্বাধীন মতাবলম্বী না হইবেন, যে পর্য্যন্ত এই দুয়ের সম্মিলনে আশাতীত মহাবল হৃদয়ে সঞ্চারিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত এ দুয়ের কর্তব্যজ্ঞান মিলিয়া একই কর্তব্যে পরিণত না হইবে, তাবৎ ধর্মের কথাই বল, আর রাজনীতির অহুসকানেই রত হও, সকলি ভস্মে স্মৃত নিক্ষেপ হইবে । অর্দ্ধ মানব পুরুষ,—অর্দ্ধ মানবী স্ত্রী ; এ দুইয়ের মিলনে পূর্ণ মানব ; যতদিন এই দুই হৃদয় এক না হইবে, তাবৎ বঙ্গ বিদেশীয়গণের ক্রীড়ার সামগ্রী থাকিবে ।

বঙ্গের ললনাগণ সৌন্দর্য্য-প্রিয় । পৃথিবীর কথা আমরা বলিব না, আমাদের লক্ষ্য কেবল বঙ্গ প্রদেশ । বঙ্গদেশের ললনাগণ অলঙ্কার-প্রিয় । সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা শ্রেণ্যের অধঃতম অংশ । পুস্তকে ললনাগণকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া জানি, সমাজে যাহা দেখি, তাহাও তাই । যেখানে সৌন্দর্য্য নাই, সেখানকার কথা পুস্তকে দেখি না, যে ললনা স্নন্দরী নামের অহুগযুক্ত,

তাহার কথা পুস্তকে শোভা পায় না। ইহা অল্প বিদ্বেষের কথা নহে। ফলে সুন্দরী রমণীগণই এখনকার পুস্তকের নাগ্নিকার আদর্শ। আমরা ললনা-চতুর্দশের স্বভাব এবং আকৃতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব, সমাজের নিয়মালুসারে আমরাদিগকে কুৎসিত ললনাকেও সুন্দরী করিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত ছিগ, আমরা এ স্থলে ধর্মকে ভয় অধিক করি, সমাজের কথা প্রতিপালন করিয়া অসত্য প্রচার করিতে পারি না।

আমাদিগের চারিটা ললনা—বিদ্ধাবাসিনী, মালতীদেবী, নলিনী সুন্দরী এবং নীরদা। পৃথিবীর সৌন্দর্য, সংসারের রূপ কুরূপ, বয়স ভেদে চারি-জনের চারি প্রকার। মালতীর স্বভাব, আকৃতির পরিচায়ক। এক স্থানে চারি-জন সমবেত হইলে, চেহারার বলিয়া দিবে,—নীরদার গম্ভীর মূর্তি, অদভেদী গিরিশঙ্করের আঁয় অটল মন ধর্মের প্রকৃত আশ্রয়। নীরদা বঙ্গ বিধবা—অঙ্গে ভ্রূষণ নাই, বস্ত্রের চাকচিক্য নাই, চিকুর বন্ধনের পারিপাঠ্য নাই, কপালে সিদ্ধুর ফোঁটা নাই; পবিত্রতা, সরলতা, গাম্ভীর্য এবং স্বভাবের অটল ও সুদৃঢ় বন্ধনী দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়, মনের অপবিত্রতা দূর হয়, ধর্মের বিমল প্রভা ক্ষণকালের জন্ত মনে উদ্ভিত হইয়া সংসার-অধৈর্যের পরিচয় দেয়। ক্ষণকালের জন্ত নীরদার মনে প্রবেশ কর,—দেখিবে, সেখানে ভক্তি, ধৈর্য, বিনয়, বিশ্বাস অটল ভাবে বিরাজমান; অনিত্য সংসারের ভোগবিলাসের জন্ত ব্যাকুলতা, কুটিল প্রেম, কুহকিনী হিংসা বা দেব, সেখানে ক্ষণকালের জন্তও স্থান পায় না। কুটিলচক্ষে নীরদার প্রতি তাকাও, চক্ষু পরাস্ত হইবে, লজ্জিত হইয়া সেই কুটিল অপবিত্র ভাব পরিহার করিয়া তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ধর্ম সঙ্ঘের জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা নীরদাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু সমাজগঠনের জন্ত যাহা প্রয়োজন, তাহা নাই; আত্মীয় স্বজনে মিলিয়া যত্বারা ধর্ম পরিবার গঠন করা যায়, তাহা নীরদার নাই; পূর্ণ মানব-চরিত্র-গঠনের আবশ্যকীয় দ্রব্য নাই, সেটা কি? প্রণয়। প্রণয় কি, নীরদা বুঝে না, শৈশব অবস্থার নীরদা প্রণয়ের শিক্ষা পায় নাই, নীরদা প্রণয়-শূন্য; নীরদার এই এক অভাবে নীরদা অর্ধ মানবী।

পুরুষের কুটিল মন যুবতীর প্রতি ষেকরূপ ধাবিত হয়, একরূপ আর কিছুতেই নয়। একটা বালক এবং একটা বালিকাকে ভালবাসিতে আরম্ভ কর, দশ, বার বৎসর পরে দেখিবে, সে ভালবাসা দুইজনের প্রতি দুই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া মনকে হরণ করিবে। পথপার্শ্বে একটা যুবক আর একটা যুবতী

যাইতেছে, নব্য পাঠক ! বলত, তোমার চক্ষু কোন্ দিকে ? সন্ধ্যার সময় ঘাটস্থিত পাষাণের উপরে বসিয়া বুদ্ধ কপটী ধার্মিক সন্ধ্যা করিতেছেন, ঘাটে দুইটা যুবতী জল লইবার জন্ত আসীনা, যদি উঁহার মনে প্রবেশ করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে সে বুঝিবে, বিষনয়নে যুবতীদ্বয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। নব্য যুবতীকে দেখিয়াও বাঁহার মন অটল থাকে, বিন্দু মাত্রও কুভাব উঠে না, বিন্দু মাত্রও মন বিচলিত হয় না, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। কিন্তু এ প্রকার ধার্মিক সমাজে অতি অল্প মিলে। সুন্দরী যুবতী দেখিয়াও মন অবিচলিত থাকে, এ প্রকার লোক নিতান্ত অল্প। তজ্জগুই বলি, যুবতীর শ্রায় মনস্তাব-উদ্দীপক পদার্থ আর নাই। এই বক্র দৃষ্টির ভয়ে আমরা অস্পষ্ট-ভাবে স্বভাব এবং রূপ বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় ললনা, বালিকা নলিনী সুন্দরী। নলিনীর সৌন্দর্য্য পূর্ণ-বিকশিত নহে, অর্দ্ধ-বিকশিত, যেন মৃদু মৃদু জোয়ার আসিতেছে, এখনও পূর্ণ জোয়ারের অনেক বিলম্ব। যে পূর্ণ জোয়ার আসিলে, ভাঁটার অগোণ সময় স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার অনেক বিলম্ব। ফল সম্পূর্ণ পরিপক হইলে পচিয়া যায়, সম্পূর্ণ বিকশিত ফুল অল্পক্ষণ পরেই মলিন হয়। নলিনী সম্পূর্ণ পরিপক নহেন, পূর্ণ বিকশিত নহেন। সংসারের ফুটিবার পূর্ব্বের শ্রী অতুলনীয়, এখানে সঙ্কুচিত ভাব আছে, উদারতা নাই, এমত নহে; এখানে লজ্জা আছে, আত্মাভিমান আছে,—কারণ ফুটিলে মলিন হইবে। এ সময়ে অঙ্গের বাঁধনি অটল, অঙ্গের বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হয় না। নলিনীর অঙ্গে আর ভূষণ নহে, কেবল নাসিকায় একটা মুক্তার নলক শোভা পাইতেছিল। ভূষণের আদর যে সময়ে, নলিনীর সে সময় এ নহে। রূপের কথা কি বলিব—যেন ধবল পদ্ম প্রক্ষুটিত; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধর, কপোল প্রদেশ, কোথায়ও কোন খুঁত নাই; নলিনী ঈষৎ রক্তিমবর্ণা—ঈষৎ গৌরবর্ণা। তাঁহুল দ্বারা অধর রঞ্জিত নহে—তথাচ রক্তিম। প্রণয়-স্রোত মৃদু মৃদু বহিতেছে, বসন্তের কোকিল একটু একটু করিয়া যেন বুলি ফুটাইতেছে,—মন চঞ্চল, রূপ চঞ্চল, বালিকার মন এই হাশে, এই কাঁদে, এই গায়, এই নীরব। নলিনীকে নাচাও নাচিবে, হাসাও হাসিবে, কাঁদাও কাঁদিবে। স্বভাব গঠনের প্রকৃত সময় এই। এই সময়ে জীলোকেরা প্রায়ই স্বামীর মন যোগাইয়া চলে, স্বামীর অনুকরণ সতী জীর প্রধান কাজ। স্বামী ধার্মিক হইলে, এই সময়ে জী অধার্মিকা থাকে না, স্বামী তপস্বী হইলে, জী অপার ঐশ্বর্যের আশা ছাড়িয়া দিতেও কুণ্ঠিতা হয় না ;

আর স্বামী সমরক্ষেত্রে ভীষণ তরবারি লইয়া প্রবেশ করিলে, ভার্য্যাও অমান-বদনে তাহার অহুসরণ করে । নলিনীর স্বভাব-গঠনের সময় এই ; এখন পর্য্যন্ত নলিনী ধার্মিক নহেন, সংসারী নহেন, তপস্বিনী নহেন, উনাসিনী নহেন । অবিনাশচন্দ্র যে পথে যাইবেন, তিনিও সেই পথে যাইবেন । নলিনী,—বালিকা বটে, কিন্তু স্বামীর অহুরক্তা ; সময়ে ভীষণ সমরে যাইতেও কুঞ্জিত হইবেন না, কারণ অবিনাশের উপদেশ সেই প্রকারের ।

তৃতীয় ললনা মালতী দেবী ;—পূর্ণ বিকশিতা । সৌন্দর্য্যের পূর্ণ শোভা বলিয়া দিতেছে,—আর অনেক দিন নহে, ভাঁটার সময় হইয়া আসিয়াছে । মালতী প্রকৃত বুদ্ধিমতী, রাজনীতির উপযোগিনী ; এখন পরিচারিকা, অঙ্গে ভূষণ নাই, হাতে ছু গাছি বালা । বোর বিচ্ছেদেও মন অটল ; এক দিনের তরেও মন নৈরাশ্রের স্বপ্ন দেখে নাই । মালতীর মন যেন অগাধ সমুদ্র ; প্রবল ঝঞ্জায়ও তরঙ্গ উঠে না, নিস্তরঙ্গ ; মনের কথা অগাধ সলিলে নিমগ্ন । সময় হইলে সে কথায় সফল ফলিবে, নচেৎ অরণ্যেই গুপ্ত হইবে,—কেহ দেখিবে না, কাহাকেও দেখাইতে মালতীর সাধ নাই । আকাশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য আলিত হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মালতীর মনের আশ্রয় বাহির হইবার নহে । অটল ভাব, দিন যাইতেছে, যাইবে ; ভাল, মন্দ, সকল সময়ই যাইবে । বর্তমান অবস্থায় মালতী সন্তুষ্টা,—কল্পনার সুখ ও ভোগ-লালসার জন্য অস্থিরা নহেন । মন এত দৃঢ় যে প্রণয়ের চঞ্চলতায় নৃত্য করে না ; ধর্ম্মের আধিপত্য হৃদয়ে স্থান পায় না । এতদিনেও ধর্ম্ম মালতীর মন অধিকার করিতে পারে নাই ! মালতী দেবী প্রণয়িনী নহেন, ধার্মিক নহেন ; তিনি রাজনীতির উপযোগিনী ।

চতুর্থ ললনা আমাদের নাগিকা, উন্মাদিনী, প্রণয়ের বিষ-পোকা ; অল্প হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রকাশ করিবার জন্ত পাগলিনী । রূপের বাহার নাই, অলঙ্কারের আদর নাই, বেশভূষার প্রতি মন নাই, মন আছে প্রণয়পাত্রে । প্রণয়পাত্র একটু ধার্মিক, তাই বিন্দুর মনে একটু ধর্ম্মভাব আছে ; কিন্তু প্রণয়পাত্রে আর যে গুণ আছে, তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ্য, পক্ষান্তরে স্বীয় কদর্য্যবৃত্তি দ্বারা সেই পাত্রের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত পাগলিনী । বিন্দুর ভালবাসার বিষ ঠাঁহার অসহ ; বিন্দুর প্রণয় 'নয়ন ভরিয়া দেখিতে চায়' অল্প কিছুই চাহে না,—এই এক প্রণয় পাত্র বিহনে সংসার অসুখের আধার,—

আত্মীয় বান্ধব সকলি পরিত্যজ্য । প্রণয়-পাত্র তুলিয়া সাগরে ফেলিয়া দাও, বিন্দু সাগরে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইতে যাইবে । বিন্দু সমস্ত সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের হৃদয় স্বামী দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে না । মনের বলই বল, আর যাহাই বল, বিদ্যাবাসিনীর প্রণয় সৈকতময় ত্রালির বাঁধের ন্যায় নহে, দণ্ডে দণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায় না ; সৌন্দর্য্যে গঠিত হয় না ; যে ভাবে আছে, তাহার বিশ্বাস, তাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে । প্রণয় পাত্রের জন্য বিন্দুর এত সাধের মানব জীবনও পরিত্যজ্য ।

আমরা সংক্ষেপে অক্ষুট ভাবে ললনা চতুর্দয়ের স্বভাব বর্ণনা করিলাম । প্রত্যেকের মধ্যে যে যে গুণ আছে, এই সকল গুণ যদি একটা ললনাতে সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে মহাশয়ানেও আবার স্বর্গের দূরশ্রুত হৃদু-ভিনাদ প্রতিক্ষণিত হইবে,—চিরদাসত্বেও অকৃত্রিম সুখের অভ্যুদয় হইবে । বিন্দুর অকৃত্রিম প্রণয়, নীরদার ধর্ম্মভাব, মালতীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যদি বালিকা নলিনীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিত, তাহা হইলে অবিনাশচন্দ্রের জীবন নির্জীব হইলেও, সজীবের ন্যায়, এই সংসারের যশঃ-মন্দিরে উচ্চ আসন পাইত এবং নলিনীর জীবন ভারতের আদর্শ হইত । সময়ে নলিনী কি হইবেন, কে জানে ? নলিনী-জীবন অবিনাশের জীবনে মিশিলে যে শোভা হইবে, তাহা পূর্ণ মানবের অবয়ব । সমাজে এইরূপ পূর্ণ বিকশিত মানব-জীবন কয়টা আছে ? আমরা একটাও দেখিতে পাই না । এই বঙ্গপ্রদেশে যে গুণ থাকিলে পুরুষ বলা যায়, তাহা অনেক আছে, এবং যে গুণ থাকিলে স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে জগৎ উজ্জ্বল হয়, তাহাও অনেকের মধ্যে আছে । অনেক রামচন্দ্র, অনেক যুধিষ্ঠির, অনেক ভীম, অনেক কণিক, অনেক চানক্য, অনেক চৈতন্য এখনও থাকিতে পারেন, অপ্রচ্ছন্ন ভাবে যদি ইহাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লও, ক্ষতি কি ? আবার অন্য দিকে সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রোপদী, প্রমীলা এবং বিমলার শ্রায় স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বল, করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি হইবে ? হৃদয়ের পূর্ণ মিলন চাই ; অর্দ্ধ পুরুষ এবং স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন আকারে থাকিয়া কিছুই করিতে পারিবে না ; হৃদয় জনের মিলন হউক, দেখিবে, মানবের পূর্ণ বল, পূর্ণ বীর্য্য, পূর্ণ সাহস, হৃদয়ের পূর্ণ তেজের বিকশিত ভাবে জগৎ বিকম্পিত হইবে । এই রূপ মিলনে একটা বাধা আছে, সেটা স্বেচ্ছাচারিতা । এই স্বেচ্ছাচারিতা যে দিন তিরোহিত হইবে, সেই দিন

অর্ধ পরিপক্ক পুরুষের মন অর্ধ-পরিষ্কৃত স্ত্রীর মনের সহিত মিলিয়া পূর্ণ মানবের শোভা দ্বারা দেশকে আলোকিত করিবে। ঈশ্বর সে দিন কি আনিবেন ?

দশম পরিচ্ছেদ ।

কলঙ্ক-রেখা ।

কুক্ষণে রজনী বাবু পথহারা হইয়া, দিগন্তব্যাপিনী ক্ষুদ্র শ্রোতপতীর আশ্রয় লইয়া সাগর-সঙ্গিহিত বনরাজি অতিক্রম করিয়া, প্রদোষ-কালে, সেই পুরোপকার-রত, নির্মলচিত্ত সাধু মহাপুরুষের সাফাৎ পাইয়াছিলেন ; কুক্ষণে হতভাগিনী, কালসপিণী সদৃশ বিন্দু তাহার নোকায় পা তুলিয়া-ছিলেন। আর অনাথা মালতী ? হরগোবিন্দ চক্রবর্তী কুক্ষণে সংসারের গরল অর্থ দ্বারা ক্রম করিয়া রজনী বাবুর ঘরে সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মালতী দেবীর গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মিল ! গোবিন্দপুরের সমস্ত লোক রজনী বাবুর বিরোধী হইয়া উঠিল। দূরস্থ আশ্রয় স্বজন, বাহারা সবিশেষ ঘটনা জানিত না, তাহারাও রজনী বাবুর প্রতি সন্দেহ-যুক্ত পত্রে তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল। ভদ্রলোক হইতে ইতর প্রজা পর্যন্ত, সকলেই তাঁহার পবিত্র, পুরোপকার-রত চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে লাগিল। রজনী বাবু কণকালের জন্তও স্বীয় চরিত্রের প্রতি দোবারোপের ভার বহনে বিরক্ত হয়েন নাই ; অম্লান বদনে লোকের ঠাট্টা, তিরস্কার এবং গল্পনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞাবাসিনীর নিকটে রজনী বাবু যে দিন মালতী দেবীর পূর্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে দাসীর বেশ পরিবর্তন করিয়া ভদ্রমহিলার ভায় থাকিতে বলেন, এবং সেই দিন হইতেই ভদ্রভাবে মালতী দেবীর সহিত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কুসংস্কারাবৃত দেশ, সহসা পূর্ব ভাবের পরিবর্তন দেখিয়া রজনী বাবুর প্রতি ঘোরতর সন্দেহযুক্ত হইল ; সেই সন্দেহ, মালতী দেবীর পুত্র শ্রমবের পর, ঘোরতর কালিমাযুক্ত ধারণ করিল। স্বীয় ক্রটিতে এই সকল কার্য ঘটতেছে,

দেখিয়া, হরগোবিন্দ চক্রবর্তী ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন, তিনি জানিতেন, রজনী বাবুর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ; তিনিই মাত্র জানিতেন, মালতীকে ক্রয় করিবার সময়ে তাঁহার গর্ভাবস্থা ছিল । কিন্তু তাঁহার কথা কে বিশ্বাস করিবে ? তিনি রজনী বাবুর আশ্রিত বেতনভোগী কর্মচারী ; তাঁহার সত্য কথায় কাহার সন্দেহ দূর হইবে ? অল্পকাল মধ্যে দেশশুক লোক রজনী বাবুর প্রতি খঙ্গ-হস্ত হইয়া উঠিল । অনেকে রজনী বাবুকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় রত হইল ।

ধীশক্তি-সম্পন্ন মালতী অস্তঃপুরে থাকিয়াই রজনী বাবুর আশু-বিপদের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন,—বুঝিলেন, এই হুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে হতভাগিনী মালতী দেবীর দ্বিহস্ত পরিমিত একটু স্থানই রজনী বাবুর এই বিপদের হেতু । কে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় কস্মৌচিত্র পাপের ফল কিম্বা অদৃষ্ট-নেমির ছরপনেয় কলঙ্কের অংশ অন্যের মস্তকে অর্পণ করিয়া স্মৃখে সময়াতিপাত করিতে পারে ? কে স্বীয় জীবন ধারণে অন্যের মহাবিপদ দেখিয়া অক্ষুর হৃদয়ে সংসারে তিষ্ঠিতে পারে ? যে পারে, সে রমণী নহে, সে এই বিহ্বী, নীতি-শাস্ত্রজ্ঞা, পরহুঃখ-কাতরা, নিরপরাধিনী, পতি-শোক-বিহ্বলা মালতী দেবী নহে ; সে এই অদৃষ্ট-চক্রের আবর্তনের হুঃখ তরঙ্গ-গণনাকারিণী, অতল জলদগম্ভীরা মালতী নহে । মালতীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল ; যে মন মুহুঃ দস্যু-অত্যাচারেও অটল ছিল, সেই অটল মন আজ পরহুঃখে গলিয়া গেল, মালতীদেবীই রজনী বাবুর এই পবিত্র স্বভাবের কালিমা—এ কথা মালতীর হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইল ।

মালতী দেবী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“স্বীলোকের মন দর্পণ-স্থিত স্বচ্ছমলিলবৎ চঞ্চল । যে মনে হুঃখের লহরী, মুহুঃ মুহুঃ ভাবে, অজানিত রূপে, অপ্রকাশ্যভাবে বিলীন না হইল, সে মন রমণীর । যে প্রজ্জলিত হতাশন হৃদয়-ভস্মে দীর্ঘকাল আবৃত্তি থাকিয়া, অলঙ্কিতভাবে নির্দীপিত না হইল, সে প্রজ্জলিত হতাশন রমণীর হৃদয়ে ! কি অপরিণামদর্শিতা ! হৃদয়ের অগ্নি কি জন্য বাহির করিলাম ? যে শরীর অনন্ত সময়-শ্রোতে মিশিয়া যাইবে—সেই শরীরের মায়ায় আমি এই ক্ষুদ্র অনলকণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপ্রচ্ছন্ন-ভাবে পতিরূপ জপ করিতে করিতে, জীবনশ্রোতের এক ক্ষুদ্রতম প্রবাহও কাটাইতে পারিলাম না ? ধিক্ আমাকে ! ধিক্ আমার মনকে ! অস্তরের হুঃখের কথা বাহিরে কেন প্রকাশ করিলাম ? কেন দাসী-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া

আবার স্নেহের অনুসরণ করিলাম ? এই ছরপনের কলঙ্ক বিদূরিত হইবে না । আজ ইচ্ছা করিলে এই সংসারকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু রজনী বাবুর এ কলঙ্ক চিরকাল থাকিবে । আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ? করিলে আজ জগতে স্বীয় জীবনের পরীক্ষা দিতে কৃষ্টিতা হইতাম না ; কিন্তু আমি হতভাগিনী—আমার কথা টেক শুনিবে ? হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কেন ? নিফলক চরিত্রের আদর্শ নিরপরাধী রজনী বাবু ! তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ,—প্রাণ, এখনও রয়েছ কেন ? সরলা বিন্দু সংসারের কিছুই বুঝে না । অপ্রচ্ছন্ন ভাবে কতলোক আসিতেছে, কতলোক যাইতেছে, মনের কথা সকলকেই খুলিয়া দিতেছে । কত দিন বারণ করিয়াছি, তা শুনে না ; সংসার বিন্দুর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ।”

ছুঃখিনী বিদ্যাবাসিনী দিন গণে, মাস গণে, কবে সাধক আসিবেন, কবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ? রজনী বাবুর এই প্রকার বিপদের সময় বিন্দুর হৃদয় মন আশ্রিত হইল ; সংসারে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না ; কি করেন, সাধক বলিয়াছেন,— “আত্মহত্যা মহাপাপ” সেই কথা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে । এতদিন মালতীর সহিত আলাপে মন স্নহ ছিল, এই ঘটনার উত্তয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল । মালতীদেবী বিদ্যাবাসিনীকে মনের সাধ ভরিয়া তিরস্কার করেন, বিন্দু ষাড় পাতিয়া সকল দোষ নিজের মাথায় লয় ; একটুও কৃষ্টিত হয় না ; তবু মালতীর মন স্নহ হয় না ; বিন্দু আবার দিন গণে । এই রকম করিতে করিতে এক বৎসর পূর্ণ হইল । এই এক বৎসরের মধ্যে রজনী বাবুর মন এক দিনের জন্যও বিরক্ত হয় নাই ; মস্তক পাতিয়া সকল নিন্দা, তিরস্কার মাথায় লইয়াছেন । এক বৎসর পূর্ণ হইল, বিদ্যাবাসিনী এবং মালতী সাধকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; মনে মনে ভাবেন, সাধক আসিলে রজনী বাবুর এই কলঙ্ক অপনীত হইবে । এক বৎসর পূর্ণ হইয়া সপ্তাহ হইল, তবুও সাধক আসিলেন না ; বিদ্যাবাসিনী আবার উন্নতের স্তায় হইয়া উঠিলেন ; রজনী বাবু একটু বিস্মিত হইলেন ।

সাধকের আসিতে বিলম্ব হইল, কিন্তু দিন বসিয়া থাকিল না, পৃথিবী অনবরত আবর্তিত হইয়া দিনের উপর দিনের লীলাখেলা দেখিতে লাগিল । এইরূপে আর এক মাস গত হইলে, সাধক আসিয়া সহসা উপস্থিত

হইলেন। যখন সাধক আসিলেন, তখন ঘোরতর বিপদ-সাগরের এক ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়া রজনী বাবুকে, মালতীদেবীকে এবং বিদ্যাবাসিনীকে সংসারের বিভিন্ন প্রণালীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক মহাচেষ্টা করিয়াও তরঙ্গের বেগ থামাইয়া আবার সকলকে একত্রিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

প্রণয় নহে ! প্রেম ।

চিত্রছাখিনী নীরদার জীবনের দুই অধ্যায় পর্যালোচনা করিয়াছি, ভূতীয় অধ্যায়ে তাঁহার মনের অবস্থা কি প্রকার ?

সংসারে ফুল ফুটে কেন ? জড়-প্রকৃতি পরমাণু মিলনে সৃষ্ট, পরমাণু-সম্মিলনে মৃত্তিকার আভ্যন্তরীণ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, সেই বৃক্ষে ফুল ফুটিল ; কোন ফুলে আবার বীজ অঙ্কুরিত হইল, কোন ফুল অসময়ে ফুটিয়া মলিন হইয়া মাটিতে মিশাইল। মানবের সুকোমল করস্পর্শে অসময়ে যে ফুল প্রক্ষুটিত হয়, সে ফুলের কথা বলিতেছি না। যে ফুলে করের স্পর্শ হয় নাই, যে পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরিয়া মধুচয়ন করে নাই, সেই ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিবে—সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয় না, একটা শুকায়, একটাতে ফল হয়, একটা ভূতে মিশায়, একটা স্থায়ী হইলে বীজ উৎপন্ন করে। এই যে দুই রকমের ফুল আমরা দেখিতে পাই,—ইহারা ফুটে কেন ? আমরা বলি, একটা ফুটে সংসারের উপকারের জন্ম ; অত্রটা ফুটে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ম। এ দুইটা ফুলেরই সূত্র আছে, দুইটারই বাসনা পূর্ণ হয়। যে ফুলটা অকালে শুকায়, সেটা দেবার্জন্য লাগে, আর যেটা ফল উৎপন্ন করে, সে কখনও দেব-অঙ্গে শোভা পায় না। কোন্ ফুলটার জন্ম সার্থক, আমরা জানি না।

হংসে ডিঘ পাড়ে। কিন্তু সকল ডিমে বাচ্ছা হয় না, কতকগুলি নষ্ট হইয়া যায়, মানুষে খায় ; কতকগুলি ফুটলে বাচ্ছা বাহির হয়। এই দুই প্রকার ডিমের মধ্যে কোন্ গুলির জন্ম সার্থক, আমরা জানি না।

জড়জগৎ ছাড়িয়া জীবজগতে প্রবেশ করিলেও দেখা যায়, এখানে ফুল ফুটিলে ইতর প্রাণীগণের সম্মিলিত হইবার রীতি আছে, কিন্তু সে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত সময়ে। অসময়ে রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ইতর জন্তুগণের মধ্যে নাই।

মানব-চরিত্রে সম্পূর্ণ বৈলক্ষ্য্য দৃষ্ট হয়। মানব জীবশ্রেষ্ঠ, উচ্চ প্রবৃত্তি এবং সদগুণে ভূষিত, কিন্তু ফুল ফুটিবার পিলষ, ইহাদের সহ্য হয় না ! অসময়ে ফুটাইয়া প্রচলিত রীত্যনুসারে রিপু চরিতার্থ করাই যেন ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

ফুল ফুটে, উপযুক্ত সময় হইলে অফুট থাকে না, কিন্তু ফুটে কি জন্য ? অন্যের সেবার জন্য, না ফল উৎপন্ন করিবার জন্য ? ফল উৎপন্নের জন্তু পরমাণু সমষ্টি মিলিত হইবার নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে ; সেই সময়ে যাহা হইবার হউক, আপত্তি নাই। উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী পুরুষের মিলনকে আমরা দোষের বলিতেছি না ; কিন্তু যখন তখন মানুষ কেন রিপূর অপব্যবহার করিবে, আমরা বৃদ্ধি না। প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়মের কথা আমরা বিশ্বাস করি না ; অথবা পরমাণু পরিচালনার জন্য ঈশ্বর মানবের রিপুকে স্বজন করেন নাই। অভ্যাস প্রযুক্ত মানব স্বীয় উত্তেজিত রিপূর বেগ সঞ্চার করিতে পারে না ; সে দোষ কি ঈশ্বরের ?

দুর্বল মনের ধারণা অনুসারে আধুনিক লোকের বিশ্বাস এই, প্রফুটিত ফুলে পরমাণু না মিশাইলে ফুল অসময়ে মলিন হইয়া, অস্তিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে। না—বিশ্বাস এ প্রকার নহে। এ প্রকার বিশ্বাস হইলে আমরা বলিতাম, মলিন হয় হউক, অথবা পরমাণুর মিলনের প্রয়োজন কি ? সমাজ-বিজ্ঞান-দাসদিগের বিশ্বাস—ফুল ফুটিলেই পরমাণু মিশিবে। চির-অভ্যাস প্রযুক্ত দুর্বল মনের অসার কথা, আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বলি, অভ্যাস যদি এই স্থানে ক্রীড়া না করে, তবে ফুল ফুটিয়া বায়ুতে মিশাইবে, পরমাণু গ্রহণ করিবে না। কিন্তু পরমাণু দূরে রাখিয়া দেখ, সে ফুল অন্যান্য গুণ হইতে বঞ্চিত না হইয়া, অনায়াসে বিমল সৌরভ বিস্তার করিয়া চলিয়া যাইবে, পরমাণু মিশাইবার জন্য কুলের একটুকুও চেষ্টা হইবে না। সংসারে স্তনিত পাই, মানবের যৌবন কাল অতি ভয়ানক; পুস্তকে পাঠ করিয়া থাকি, এই সময়ে হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহার এক মাত্র কারণ, অভ্যাস। এই অভ্যাস প্রযুক্তই লোক

মত্ত হইয়া দিক-শূন্য হয়। যে যুবক কখনও সংসারের চিত্র দেখে নাই, সে যুবকের স্বভাব পরীক্ষা কর, দেখিবে, তাহার মস্ততা নাই; তাহার প্রক্ষু-
টিত যৌবন উজ্জ্বল শোভা বিতরণ করে, কিন্তু মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
করে না।

মানব মনে যেসকল বৃত্তি সঞ্চিত হইয়াছে, সে সকলের উপযুক্ত পরি-
চালনা হওয়া আবশ্যিক, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু অবস্থান্তেদে, সকল
জীবনে সকল বৃত্তির সমপরিচালনা না হইলেও কোন ক্ষতি হয় না।
পক্ষান্তরে বৃত্তি বিশেষের পরিচালনা অধিক পরিমাণে হইলে, অন্য বৃত্তির
পরিচালনা আদৌ না হইলেও কোন কষ্ট হয় না। বৃত্তির সহিত রিপু-
দিগের সংশ্লিষ্ট মিলন; স্তত্রাং রিপু সঙ্ঘকেও ঐ এক কথা।

বিবাহের উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথমতঃ, একটা বৃত্তির পরিচালনা, দ্বিতীয়তঃ
রিপুর চরিতার্থ সাধন। এই দুইটির মধ্যে একটা প্রবলতর হইলে
অন্যটির অস্তিত্ব লোপ পায়। কামুক প্রেমের ধার ধারে না, প্রেমিক কামের
আকর্ষণ কি, বুঝেন না। প্রেম যে বিবাহের উদ্দেশ্য, সেই বিবাহই প্রকৃত
বিবাহ। আবার অন্যদিকে পুরুষ জীবের নিকটে প্রেম শিক্ষা করে। যে মানবের
এই প্রেম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত হয়, যে মানব প্রেম-বিহ্বল, রিপু-শূন্য—
মহাদেব। কামরিপু বাহাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আমরা
তাহাদের উদ্ধারণ গ্রহণ করির না, কারণ তাহারা প্রায়ই প্রেম-শূন্য;
বাহাকে বিগ্ৰহ প্রেম বলে, তাহা কামুক লোকদিগের মধ্যে নাই। বাহারা
নিঃস্বার্থ প্রেমিক, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে, প্রেমের বিমল
জ্যোতিতে তাহারা চিরকাল কাম-শূন্য হইয়া থাকিতে পারেন। আমাদের
কথার প্রমাণ চাও—যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, মাট্‌সিনির জীবন অধ্যয়ন
কর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমিক জীবনে রিপুর অতি অল্পই বিকাশ হয়।

প্রেমশূন্য জীবন, পাশব জীবনে তুলনীয়। ইতর প্রাণিগণ এবং জীব-
শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে প্রভেদ এই, পূর্বোক্ত জীব সকল প্রেমশূন্য, বৃত্তিশূন্য;
মানব প্রেমের জন্য লালায়িত, বৃত্তি সকলের সম্যক্ বিকাশ ইহাদের অঙ্গের
ভূষণ। যদি কোমুটির মত অহুসরণ করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপত্যকে
ছাড়িয়া জীবের নিকটে প্রেম শিক্ষা করিবার জন্য এই মানব জন্ম অন্যেয় করে
সমর্পণ করিয়া থাক, তাহা হইলে অপ্ৰশংসা করি না, নব্যপাঠক, বিবাহ
কর, স্ত্রী হও। কিন্তু যদি পাশব রিপুর দাস হইয়া তাহাই চরিত্র-

তর্ক করিবার জন্ত, অর্ধ পরিষ্কৃত রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাক, —তবে সাবধান, —তোমাদের বিবাহের আবশ্যকতা নাই ; দেশ হইতে সতীত্ব উঠাইয়া দেও, পশুর জ্ঞান বিচরণ করিয়া রিপু চরিতার্থ কর । জাতীয় জীবন অন্ধকারে ডুবে, ডুবুক, ; এদেশের কি আছে ? সমাজ উশ্বল হয়, তাতে তোমাদের কি ? তোমাদের কি সে চিন্তা আছে ? রিপুর উত্তেজনার পরিণাম যে বিবাহ; সে বিবাহ বিবাহই নহে, তাহা পশুবৃত্তি । আর যদি মনুষ্য চাও, তবে প্রেম-শিক্ষাকে জীবনের ব্রত — প্রেম-শিক্ষাকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কর, অর্ধ মানবী এবং অর্ধ পুরুষের সম্মিলনে পূর্ণ মানবের স্বর্গীয় সৃষ্টি স্বজন কর, উপযুক্ত সময়ে পরমাণুতে পরমাণু মিশিয়া যাইবে ; জগতের ভাবী বংশ ধ্বংশ হইবে না । আর না হয়, তুমি সংসারের জালা যন্ত্রণা ব্যক্তিমাছ — সংসারের অপরিহার্য্য বিষময় রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছ, বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা মাই, পৃথিবী ভরিয়া অমুসন্ধান কর, প্রেম-শিক্ষার স্থান সীমাবদ্ধ নহে । আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী, বৃক্ষে ফল ফুল, — অরণ্যে পশুপক্ষী, জলে জলজন্তুগণ, জগৎময় প্রেমের বাজার । আর যদি তাহাতেও ইচ্ছা না থাকে, জগৎশ্রেষ্ঠ প্রেমময় ঈশ্বরকে দৃঢ়প্রেমে আবদ্ধ কর ; রিপুর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ।

আমরা নীরদার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা করিবার পূর্বে সামান্য ফুলের দৃষ্টান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নানব জীবনের প্রধান উৎকৃষ্ট সাধন, প্রেমশিক্ষায় আশ্রিত হইয়াছি । এখন নীরদার প্রেম-প্রধান জীবন কুটিল পথগামী সংসারের প্রণয় হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও কি প্রকার সুখ উপভোগ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইব । নীরদার এই যৌবন, যৌবনে সংপ্রবৃত্তি যত প্রবলবেগে ধাবমান হয়, এত আর কোন সময়ে নহে । বৃদ্ধ সাধক এবং যুবক সাধকের জীবন ঘোরতর বৈষম্যময় । যুবক সাধক, যাহার জন্ত সাধনা করে, তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড় না । আমরা সাধকশ্রেণীকে কেবল ধর্মজীবনে আবদ্ধ করি না ; সাধক অনেক প্রকার । কেহ রূপের সাধক, কেহ প্রেমের সাধক, কেহ ত্রৈলোক্যের সাধক, কেহ বিদ্যার সাধক, কেহ সমাজের সাধক, কেহ রাজনীতির সাধক ; অবস্থা ভেদে, ক্রটিভেদে, সংসারে নানা প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা এই সকল প্রকার সাধক সম্বন্ধেই এই কথা বর্ণিত হইছে ; — যুবক সাধক সাধনার ফল পাইবার জন্ত অতলস্পর্শ সমুদ্র-গর্ভ ভেদ করিয়া পাতালগামী হইতেও

কুণ্ঠিত হয় না, সাধনার ফল লাভের জগ্গ ভীষণ অনলকুণ্ডে বাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেও ভয় করে না। বৃদ্ধের সাধনা, যেমন আছে, তেমনি চলিতেছে; যে পর্যন্ত অনন্ত কালসমুদ্রে জীবনস্রোত না মিশাইবে, তাবৎ তাহাদের সাধনার শেষ নাই; ফলপ্রাপ্তি জীবনে ঘটুক বা না ঘটুক, তাহাতে তাহাদের অঙ্গ-বৈষ্ণব উপস্থিত হয় না। বাহা বলিতেছিলাম, নীরদার যৌবন উপস্থিত, ফুল ফুটিবার কথা বলিতে চাও, বল, ক্ষতি নাই, পবিত্র ফুল ফুটিয়াছে,—কিন্তু ক্রমর নাই, গুঞ্জরণ নাই, সংসার-পোকার এ অস্পৃশ্য ফুলকে স্পর্শ করিবারও ক্ষমতা নাই। নীরদার মন অটল, হিমাদ্রিশেখর স্থানচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পলায়নের পর মুহূর্ত্ত হইতে যে মন দৃঢ় হইয়াছে, নীরদার সেই মন বিচলিত হইবার নহে। যখন হইত, তখন হইত, তখন নীরদা বালিকা ছিল, তখন মন কোমল ছিল। পূর্বে নীরদার মন কোমল ছিল, তাই শরৎচন্দ্রের অদর্শনে তাহার হৃদয় একবার আন্দোলিত হইয়াছিল; হৃদয়ে একবার তরঙ্গ উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই। বিদ্যাবাসিনীর পলায়নের বার্তা নীরদা অটলভাবে শুনিল; মনের একটুও বৈষ্ণব দেখা গেল না, প্রবল ঝড় বহিয়া বহিয়া নীরদার যোগ ভঙ্গ করিতে পারিল না। নীরদার মন পূর্বে সংসারে ছিল, সংসারের বিপদ, সংসারের যন্ত্রণায় মন তখন অস্থির হইত, এখন মন-পাখী সংসার ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছে; যে লক্ষ্য পানে দৃষ্টি রাখিয়া চৈতন্য বিশ্ববিশ্রুত প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য নীরদার অবলম্বন। নীরদা সংসারের কিছুই চায় না; খাইতে দাও খাইবে, না দাও অনাহারে স্বীয় জীবনের সাধনায় অনবরত রত থাকিবে।

সম্প্রতি অবিনাশচন্দ্র নলিনীকে লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন, নীরদার হৃদয়-সরসীতে একবার একটা হর্ষ-তরঙ্গ উঠিল, আবার ক্ষণকাল পরেই তাহা বিলীন হইয়া গেল। নীরদা করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—ছোটদাদা! দাদার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? যাইবার সময় তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? যাইবার সময় তিনি কি বলিয়া গেলেন?

আবিনাশচন্দ্র বলিলেন,—ভয়ি! দাদা বলিলেন, “নীরদা এবং বিদ্যাবাসিনীর জীবনের ভার তোমার উপরে রহিল। তাহাদিগকে দেখিও।”

নীরদা পুন বলিল,—তিনি কি আর আসিবেন না? এখন তিনি কোথায় আছেন?

অবিনাশ।—আসিবেন কি না, তাহা বলিয়া যান নাই। সম্প্রতি তিনি কানপুরে আছেন। তিনি তোমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

নীরদা পত্র দেখিতে তত উৎসুক হইল না, বলিল, বিন্দু যে সংসারে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ?

অবিনাশ।—শুনিয়াছি। কি করিব, কিছুই ঠিক পাই না। বিদ্যাবাসিনী যাইবার সময় তোমার নিকট কোন পত্র লিখিয়াছিল ?

নীরদা কিছুই না বলিয়া বিন্দুর পত্রখানি অবিনাশচন্দ্রের হাতে দিল। অবিনাশচন্দ্র পড়িয়া একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, ভয়ি ! দাদার পত্র যে দেখিতে চাহিলে না ?

নীরদা বলিল, কই দাদার পত্র দেও।

অবিনাশচন্দ্র পত্র বাহির করিয়া দিলে নীরদা পড়িতে লাগিল ;—

—“স্নেহের ভগিনি ! হৃদয় পাষণ দিয়া বাধিয়া আমি তোমাকে সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া আসিয়াছি ; আমার হৃদয় পাষণের জ্বায় কঠিন। কিছু দেশে থাকিয়াই বা কি করিতাম ? যদি বুদ্ধিতাম, তোমার মন সংসারে ভ্রমণ করিবার জন্ত ব্যস্ত, তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়া সমাজ-বন্ধনে পদ-নিষ্ক্রেপ করত তোমাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতাম ; কিছু দেখিলাম, তোমার মন সংসার ছাড়িয়া যাইতে উৎসুক, তোমাকে সে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিব কেন ? সংসারে কি সুখ ? তুমি ধিচিরাৎ যে বিমল স্নেহের অধিকারিনী হইবে, সংসারে সে সুখ পাওয়া যায় না। সংসারে পাপ-কাঁট অনবরত মানবের সংবৃত্তিনিচয়কে ছেদন করিতে উদ্যত। তোমাকে সে পথ দেখাইয়া দিয়াছি, নিরাশ হইও না, সে পথে কাঁটের ভয় নাই, অনবরত অগ্রসর হও, অচিরাৎ বিমল আনন্দের অধিকারিনী হইবে। আর আমি ? আমি সংসার ছাড়িয়াছি ; সংসারে আর যাইব কি না, কে জানে ? এ শরীর যদি দেশের জন্ত পাত করিতে না পারিলাম, তবে আমার জীবনে কি হইবে ? এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ যদি চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্ত পাত করিতে না পারিলাম, তবে আর কি জন্য মাছুষ হইয়াছি ? আমি সংসার ছাড়িয়াছি, ঈশ্বর-করুন, আমাকে যেন আর ফিরিতে না হয়, ঈশ্বর করুন তুমি প্রেমময়ীর প্রেম-নিকেতনে বিমল আনন্দ ভোগ কর। আমার আশা করিও না, আমার মনে যে আগুন অহর্নিশ জলিতেছে, আমি সেই আগুনে আত্ম-বিসর্জন দিব। আমার আশা করিও না ; অবিনাশ-

চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাক, সে আমার অভাব-জনিত কষ্ট দূর করিবে। সংসারে ঘর বাঁধিতে চাও ত তাহাকে বলিও, সমাজ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া তোমাকে সংসারে ধরাইবে। কিন্তু আমার কথা শুন—সংসারে সুখ অন্বেষণ করিও না; যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, এই পথেই তুমি অনন্তকাল সুখভোগ করিতে পারিবে। আমি কিম্বার হই। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব; আজ যেখানে আছি, এখানে চিরদিন থাকিব না।” তোমার অকৃত্রিম স্নেহের—শরৎচন্দ্র ।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, নীরদা অটল ভাবে বসিয়া রহিল, মন বিচলিত হইল না। অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, তুমি! নলিনীর সহিত তোমার আলাপ হয় নাই; আইস, তাহার সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতেছি।

নীরদা গম্ভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড ।

—:o:—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সাক্ষাতে ।

যাহা দেখিতে ভালবাসি, যাহা দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয়, আমরা তাহাই দেখিতে বসিয়াছি। যাহা সর্বক্ষণ নয়ন মনকে আশাতন করিয়াছে, যে চিত্র রাস্তায়, অরণ্যে, ঘাটে, পুকুরে, বাজারে, বৃক্ষের অন্তরালে, শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে দেখিয়া দেখিয়া এক প্রকার তৃপ্ত (ই বল, কি বিরক্তই বল) হইয়াছি, সে চিত্র আর দেখিতে বাসনা নাই, তাহা আর ভাল লাগে না। এক বস্ত কতকাল মধুর থাকে? অন্ধকার রজনীর শিব-মন্দিরের দর্শন, বাতায়ন-পথে সুন্দর ছবি, ভীমা পুরুষগীর জলক্রীড়া, কুন্দনন্দিনীর অপরাধ, জন্মান্ন রজনীর মন, বিধবা কুমুদিনীর অহুরাগ চিত্র, স্বর্ণলতার স্নেহ, এ সকল দেখিয়া দেখিয়া মন তৃপ্ত হইয়াছে, আর দেখিতে ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুন্দর ছায়ায় কোমল করম্পর্শে লোকের মন কি প্রকারে ভুলিয়া যায়; তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যাকুল নই। একবার, দুইবার, তিনবার দেখিলে মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মনোবিজ্ঞান মধ্যস্থ্য এ চিত্র দেখিতে বা দেখাইতে আমরা

আম্র চঞ্চল হই নাই। আমাদের কঠিন মন অহুবাগের চিত্র দেখিলে বিচলিত হয় না, আমরা অহুবাগের সুন্দর বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমরা দেখিতে বসিয়াছি,—শরৎচন্দ্রের নীরস জীবন। শরৎচন্দ্রের জীবন ভাল হউক বা মন্দ হউক, আমাদের স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, আমরা এ প্রকার রসশূন্য জীবনের অভিনয় দেখিতে সর্বদাই উৎসুক, তাই সংক্ষেপে অগ্রান্ত অধ্যায় সমাধা করিয়া, আবার শরৎচন্দ্রের জীবনের আর এক পরিচ্ছেদ দেখিতে আসিলাম।

কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের যত আয়ীর বন্ধ ছিল, ধনপৎ সিংহ নামক জর্নৈক পাঞ্জাবী সিপাহি তাহার মধ্যে এক জন। ধনপৎ সিংহের সহিত শরৎচন্দ্রের কি সূত্রে আলাপ হইয়াছিল, তাহা আমরা এখন বলিব না, বলিবার সময় হয় বলিব, না হয় মনের কথা মনেই থাকিবে। ধনপৎ সিংহ প্রথমে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম করিতেন, প্রায় এক বৎসর হইল, ইচ্ছা করিয়া কর্মত্যাগ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ধনপৎ সিংহের সহিত একত্রিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ তাঁহার বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহা-দিগের একটু স্বার্থ ছিল। প্রবল পরাক্রমশালী মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষী বিন্দন ইংরাজ চক্রান্তে রাজা-চ্যুত হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে নির্বাসিত হন। তাঁহার নাবালক পুত্র তখন ইংরাজগণের হাতের ক্রীড়া পত্নুল স্বরূপ জর্নৈক ইংরাজের তত্ত্বাধীনে ছিলেন। ইংরাজ চক্রান্তের এ সকল গূঢ়তত্ত্বের মর্শভেদ করিতে তিনি তখন সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন; নচেৎ কে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় গর্ত্ত্বারিণীর নির্বাসন-পত্রে স্বাক্ষর করিতে পারে? সে যাহা হউক, ইংরাজ রাজত্বের কূটনীতি সমালোচনার কোন ফল নাই, বিশেষতঃ সে সকল বিষয় আমাদের অবলম্বনীয় পথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধনপৎ সিংহ মহারাজী বিন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, বিন্দন যে সকল মর্শভেদী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে ধনপৎ সিংহের বিরক্তি-যুক্ত মন উষ্ণতর হইয়া উঠে, তাঁহার সহিত বিন্দনের যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা উল্লেখ করিব না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সেটী একটি অল্পতর কারণ। বিন্দনের সহিত সাক্ষাতের পর ধনপৎ সিংহ শরৎচন্দ্রকে লইয়া পঞ্জাব, দিল্লি, কানপুর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। শরৎচন্দ্র অনেক

দিন পর্য্যন্ত কানপুরে ছিলেন, ঐ সময়ে, গুপ্তভাবে, তিনি ইংরাজ দৈন্য-গণের যুদ্ধ প্রণালী অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষা করেন। ধনপৎ সিংহ শরৎচন্দ্রকে কানপুরে রাখিয়া আরো অল্পস্থানে গমন করেন। শরৎচন্দ্র এক বৎসর কাল কানপুরে থাকিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে পাটনায় জগদীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। শরৎচন্দ্র জগদীশ বাবুর নিকট স্বীয় জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বলি ছিলেন, সেই বলি পরিশোধ করিবার মানসে তিনি পাটনায় উপস্থিত হইলেন; আসিবার সময় জনৈক সিপাহির নিকট বলিয়াছিলেন, ‘ধনপৎ সিংহ আসিলে, আমার কথা বলিও; তাঁহার পত্র পাইলেই আমি ফিরিয়া আসিব।’

পাটনার নিম্নে কলখোতবাহিনী, দিগন্তব্যাপিনী, স্মৃতিময়ী গঙ্গা মুহু মুহু কল কল রব করিতে করিতে, নগর, প্রান্তর, গিরি, বন অতিক্রম করিয়া অনন্ত সাগরে মিশিতে যাইতেছে! সন্ধ্যার প্রাক্কালীয় সূর্যের রক্তিম রশ্মি জলের উপর যদৃচ্ছাক্রমে হেমাভরণে শোভা পাইতেছে, একটু একটু বাতাস বহিয়া ক্ষুদ্রবীচিমালা তুলিতেছে, সেই বীচিমালার সেই রশ্মি মুক্তার জ্বয় বল মল করিতেছে। জগদীশ বাবু একাকী তীরে সাক্ষ্য-সমীরণ সেবন করিতেছেন। দূর হইতে একজন লোক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, জগদীশ বাবুকে দেখাইয়া দিরা চলিয়া গেল। ইঙ্গিত মতে পথিক নিকটে উপস্থিত হইলে, জগদীশ বাবু চিনিলেন, পথিক—‘শরৎচন্দ্র।’

অনেকদিন পরে আজ সাক্ষাৎ হইল, আনন্দ এবং নিরানন্দের স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। জগদীশ বাবুর চক্ষু হইতে নীরবে প্রেম-অশ্রু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল; শরৎচন্দ্রও সমভাবে অজ্ঞাতসারে নয়ন-প্রান্ত হইতে সহায়ত্ব-ব্যঞ্জক অশ্রু বিসর্জন করিয়া উক্তির মালা গাথিয়া তাঁহার পায়ে উপহার দিতে লাগিলেন, পা শিশিরসিক্ত ‘পদ্মের জ্বয় শোভা পাইতে লাগিল।

অনেক দিনের পর আজ সাক্ষাৎ, অনেক কষ্টের পর আজ মিলন,— অনেক দুঃখের পর আজ সুখ, জগদীশ বাবু কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না। ইচ্ছার পর ইচ্ছা হৃদয়ে জলবিধের জ্বয় বিলান হইয়া যাইতে লাগিল। অতীত ঘটনা সকল একে একে মনে উঠিয়া স্বরণ-পথকে অবরুদ্ধ করিল,— সেই নৌকা, সেই দস্যু, সেই অত্যাচার, সেই শরৎচন্দ্রের জলে বঁপি, একে একে সকল মনে পড়িতে লাগিল। বর্তমান সাক্ষাতে বিগত শোক-দিগ্ন

সহসা উখলিয়া উঠিল,—জীবনের সহচরী মালতী কোথায় ? বিলুপ্তপ্রায় আশা জগদীশ বাবুকে স্বপ্ন দেখাইতে লাগিল—মালতী কোথায় ? অনেক অল্প-সন্ধানের পর যখন আর কাহাকেও পাইলেন না, তখন সেই নদীস্রোতে জীবনের আশা তরসা বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেন, আজ এতদিন পবে শরৎ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; বিলুপ্ত-আশা আবার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল । মালতী কোথায় ?—এই প্রশ্ন মনে সহসা জাগিল । শরৎচন্দ্র নীরবে রহিলেন ।

এই আনন্দ, এই নিরানন্দ, দুইয়েরই শক্তি সমান । জগদীশ বাবু কণা বলিবার জন্ত উৎসুক হন, আর নিরানন্দ আসিয়া বাধা দেয় ; নীরবে থাকেন, আনন্দ বলিয়া দেয়, ‘বর্তমানে যে সুখ আছে, তাহাই ভোগ কর ।’

অনেকক্ষণ পরে আনন্দ এবং নিরানন্দের মিল হইল, উভয়ে সম্মত হইয়া জগদীশবাবুর মুখ খুলিয়া দিল, তিনি বলিলেন—‘শরৎ ! তোমাকে দেখে—’ আর বাক্য ফুটিল না, ত্রুণ আসিয়া আবার বাদী হইল, মুখ বন্ধ হইল ; চক্ষের জলে বঙ্গ আর্দ্র হইতে লাগিল । জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম ভক্তির বিবয় আলোচনা করিতে লাগিলেন ; কোমল নয়ন স্নেহপরি ঝরাইয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিতে লাগিল । শরৎচন্দ্র গভীর ভাবে ঝাঁড়াইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ।

ক্ষণকাল পরে জগদীশ বাবু আবার চঞ্চল হইয়া বলিলেন “শরৎ ! তোমাকে দেখে আমার মনে এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হইল ! মনের কণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই । তুমি আমার জন্ত প্রাণ দিতেও উদাত্ত হইয়াছিলে, তোমার এ ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না । আমার হৃদয় কি কঠিন ! যখন তুমি আমার জন্ত প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে জলে ঝাঁপ দিলে, তখন তোমার সহিত আবার দেখা হবে, এ আশা মাত্রেরই ছিল না, কিন্তু তবুও আমি জীবিত ছিলাম ! আমার স্থায় পাবাণ-হৃদয় আর কে ? দেখ শরৎ, আমার জীবনের আশা, তরসা,—মালতীকে হারাইয়াও জীবিত রহিয়াছি ?” জগদীশ বাবু রোদন করিতে লাগিলেন ।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, ক্রন্দনে ফল কি ? কাঁদিলে যদি আভাব পূর্ণ হইত, তাহলেও দিন রাত্রি বসিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু তাত হয় না ! তবে বৃথা রোদনে ফল কি ? সঙ্কল্প লোকের মহৎগুণ, ইহা ভাবিয়া সকলই সঙ্ক

করিতে শিখেছি। আমি দুঃখী—আমার দুঃখ অসীম, আজীবন অশ্রু বিসর্জন করিলেও সে দুঃখ প্রকাশ হয় না ; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, সব অকারণ। আপনি আর কাঁদিবেন না।

জগদীশ।—আমার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ হয়েছে, আমার মন কঠিন বলিয়াই সে শোক-ধ্বংস সহ্য করিতেছি। আমার জীবনের কর্তব্য-কার্য্য কি করেছি ? তবে একটু কাঁদি ; এটুকু আমার না থাকিলে, আমি মনুষ্যানামের উপযোগী হতেম না। আমাকে ও কথা আর বলো না। শরৎ ! ভেবে দেখত আমার কত কষ্ট। এদেহ দুঃখের অস্পৃশ্য ছিল। শৈশবে পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে কোন কষ্টই ভোগ করি নাই ; তারপর যখন বড় হইলাম, তখন এই চাকুরি পাইলাম, মালতী আমার স্নেহের ভাগিনী হলেন। মালতীর কথা মনে উঠিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। মালতীর পিতামাতা, শৈশবে মালতীকে আমার হাতে অর্পণ করে, স্বর্গবাসী হয়েছেন, এ পৃথিবীতে আমি ভিন্ন মালতীর আর কেহই নাই, এইক্ষণ মালতী গর্ভবতী ! হায় ! তাহার এখন কি দশা হয়েছে, কে জানে ? হয়ত দস্যুদিগের পৌড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মালতী প্রাণত্যাগ করেছে ! শরৎ ! মালতীর মৃত্যুতে আমি তত দুঃখী নহি, কিন্তু সে আমারি জন্ত প্রাণ হারালো ! আমি মালতীর পরম শত্রু ছিলাম। আমার মন একেবারে অস্থির হয়েছে। এতদিন সব ভুলে ছিলাম, আজ তোমাকে দেখে, আবার একে একে সকল কথা মনে উঠে, মনকে অস্থির করে তুলিতেছে। আচ্ছা বলত ! মন এত অস্থির হয় কেন ? পরের জন্ত মন এত চঞ্চল হয় কেন !

শরৎচন্দ্র।—দুর্ব্বল মন চঞ্চল হয় কেন, কি প্রকারে বৃদ্ধিবে ? যাহার সহিত পূর্ব্বজীবনে আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না, বিবাহের পর সে-ই জীবন-সর্ব্বস্ব হইল ?

জগদীশ।—শরৎ ! তোমার কি বিবাহ হয় নাই !

শরৎচন্দ্র বিনম্রভাবে মস্তক নত করিয়া পক্ষীর ভাবে বলিলেন, সে কথা আপনি শুনে কি করিবেন ? যদি অজানিত সময়ের অপরিচিতা বালিকার সহিত বন্ধনের নাম বিবাহ হয়, তবে আমি বিবাহ করিরাছি।

জগদীশ্বর বাবুর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল—‘যদি অজানিত সময়ের অপরিচিতা বালিকার সহিত বন্ধনের নাম বিবাহ হয় ! বলিলেন, সে কি প্রকার ?

শরৎচন্দ্র আর কথা বলিলেন না ; হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া বাক্য ফুটল না ।

অনেকক্ষণ পর জগদীশবাবু বলিলেন—‘শরৎ ! তুমি কি করিবে ?

শরৎচন্দ্র মনের কথা গোপন করিয়া বলিলেন, আপনি কি করিতে বলেন ?

জগদীশ বাবু।—আমি বলি, চাকুরি কর । সম্প্রতি আমার হাতে একটা কর্ম্ম খালি আছে, বেতন ৮০ টাকা, আপাতত এই কর্ম্মে নিযুক্ত হও ; তারপর ক্রমে আরো উন্নতি হইবে ।

শরৎচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না ।

জগদীশ বাবু মোনভাব সম্বতির লক্ষণ ভাবিয়া সেই কার্য্যেই শরৎচন্দ্রকে নিযুক্ত করিবেন, ঠিক করিলেন । রজনী গাঢ়তর হইয়া আসিল ; জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের হাত ধরিয়া বাসায় লইয়া গেলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অপরিবর্তনীয় মত ।

মুহুর্তে মুহুর্তে বাহাদিগের মত পরিবর্তিত হয়, আমরা তাঁহাদিগের মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করি না । মানসিক শক্তির পূর্ণ-বিকাশে মন উন্নত হয়, বয়স-আধিক্যে জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, বিজ্ঞতা বালির বাধের স্তায় চঞ্চল মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া অটলভাব ধারণ করিতে থাকে, এ সকল কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু মত পরিবর্তিত হইবে কেন ? যে জীবনক্ষেত্রে যে বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়, সময়ের পরিবর্তনে তাহার পরিবর্তে অন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে কেন ? এক সময়ে একবীজে অল্প বীজের ফল ফলে, তাহা জানি, কিন্তু সে কোন্ সময়ের কথা ? বালক এই হাসে, এই কাঁদে, এই খেলা করে, এই অধ্যয়ন করে, এই আকাশে উঠে, এই পাতালে পড়িয়া গড়াগড়ি যায় ; তাহাদিগের মনের চাঞ্চল্য-হেতু, তাহাদের মন স্থির থাকে না, এক বীজ রোপিত হইতে না হইতে সে বীজ ফুলিয়া অল্প বীজ বণন করে, আবার অল্প সময়ে সে জীব ফুলিয়া কেলিয়া দেয় । এ সকল ক্রীড়া বালকের চরিত্রেই শোভা পায় । বালকের মত

ঠিক থাকে না, তাহা জানি, কিন্তু মানুষের মত পরিবর্তিত হইবে কেন ? পোকায় বীজ কাটে, জল বায়ুর দোষে বীজ পচে, নৈরাশ্র বীবের অস্থিত ভূতে মিশায় ; এ সকল অসার কথা । ক্ষেত্রের দোষে এ সকল ফল ফলিয়া থাকে । ক্ষেত্র ভাল হইলে এ সকল কথা, প্রবঞ্চনার কথা ।

নৈরাশ্রে হৃদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া যায়, এ কথা আমরা অনেকবার শুনিয়াছি । সংসারের আপদ, বিপদ,—নৈরাশ্র-পবন প্রবলবেগে বহিয়া যখন আশার বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তখন কাহার সাধ্য, মত ঠিক রাখিয়া অটলভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে ? নৈরাশ্রের কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতা মানবহৃদয়ের উপর স্বতই আধিপত্য স্থাপন করে, আমরা জানি, কিন্তু জানি বলিয়া ইহার হাত এড়ান যায় না, তাহা বলি না । যিনি কার্য-ক্ষেত্রে প্রেঙ্ক করিয়া, ফল-প্রাপ্তির-আশা-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল কর্তব্যের অহুয়োধে, দৈর্ঘ্য সহকারে জল সিঞ্চন করিতে থাকেন, তাঁহার মন কখনই পরিবর্তিত হয় না । যাহার এই প্রকার অটল মন আছে, যাহার জ্ঞান অর্জিত হইলেও মত পরিবর্তিত হয় না, সে-ই প্রকৃত মনুষ্য ; তাঁহার মনই বালকত্ব-শূন্য । যে দিন বালকত্ব-শূন্য মনের কথা আবার শুনিব, সেই দিন বঙ্গের উন্নতির আশার স্বপ্ন হৃদয়কে ভুলাইবে ।

শরৎচন্দ্র সহসা জগদীশ বাবুর কথা অমান্য করিতে পারিলেন না, চাকুরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! তাঁহার জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্র কি চাকুরি—দাসত্ব ? কে বলিবে ? তবে শরৎচন্দ্র মত-বিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? শরৎচন্দ্র কি নিরাশ-পবনে বিলোড়িত হইয়াছেন ? যদি হইয়া থাকেন, তবে তিনি বালক, মনুষ্যানামের উপযোগী নহেন । যিনি অল্প সময়ে ফল লাভ না হইলে হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে অনন্তকাল-সাপেক্ষ ফলের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র । শরৎচন্দ্র কি বালক ? দাসত্ব তাঁহার জীবনের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তবে তিনি এ পথ অবলম্বন করিলেন কেন ? কৃতজ্ঞতা স্বীকার ? কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে একেবারে মত পরিবর্তিত হয়, বলিতে পারি না ; কিন্তু ক্ষণকালের অল্প সময়-ভঞ্জে আবর্তিত হইয়া অন্তরে ধীকি ধীকি জ্বলিতে থাকে । শরৎচন্দ্রেরও তাহাই হইল, তিনি একটু কথা প্রতিপালন করাকে, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এক মাত্র উপায় মনে করিলেন ; তাঁহার মত পরিবর্তিত হইল না । এক দিন, দশ দিন, এক মাস, দুই মাস, তিন মাস পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে, তবুও মত পরিবর্তিত হইল না,

পরিবর্তিত হওয়া দূরে থাকুক, তিন মাস পরে অন্তরের আশুন আবার প্রকাশ পাইল, শরৎচন্দ্র কর্মত্যাগ করিবার জন্ত অস্থির হইলেন। এক দিন জগদীশ বাবুর নিকটে বলিলেন—‘আপনার কথা প্রতিপালন করিবার জন্ত আমি দাসত্ব-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম; তখনও জানিতাম, অন্যের চাকুরি করিতে গেলেই স্বীয় মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে, কিন্তু জানিয়াও আপনার কথা অমান্য করিতে পারি নাই। বাহা করণায় ভাবিতাম, তাহার ফল হাতে হাতে পাইয়াছি; আমি আর চাকুরি করিব না। আপনার নিকট আমি ঋণী আছি, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব, যতদিন পর্যন্ত এ শরীরে শেব রক্তবিন্দু মুহু মুহু বহিবে, ততদিন পর্যন্ত আপনার ঋণের কথা বিস্মৃত হইব না; আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার অর্থে প্রয়োজন কি? যে অর্থ মনের আশা ভরসা, জীবনের অবলম্বনীয় পথ,—সাধের বিপণিকে ভাঙ্গিয়া উপার্জন করিতে হয়, সে অর্থ চাই না, আমি কাঙ্গালী, আমার সে অর্থে প্রয়োজন কি? তবে কেন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ উত্তর পাইবেন; উত্তর পাইবেন,—সে কেবল আপনার কথা প্রতিপালন করিবার জন্য; আমার মন তখনও যেমন ছিল, এখনও সেই প্রকারই আছে। বাহাদিগের জীবন চাকুরির জন্য, অর্থের উপর অর্থ চাঙ্গি-বার জন্য, হংস-পুচ্ছ পরিচালন করিবার জন্য, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন, চিরকাল করুন। আমি কেন করিব? আমি আর চাকুরি করিব না।

জগদীশ বাবু।—শরৎ! তোমার রক্ত আজও গরম; তুমি এখনও বালক। চাকুরি ভিন্ন আমাদের জীবিকা নির্বাহের আর কি উপায় আছে?

শরৎচন্দ্র।—জীবিকা নির্বাহের উপায় নাই, মরিব। আমাদের ন্যায় লোকের থাকিয়া কি ফল? যে জীবনে সংসারের কোন উপকার নাই, সে জীবন রাখিব কেন? আবার সেই জীবন রাখিব, পরের চাকুরি করিয়া? যে দিন ভারতবর্ষের শতক্ষেত্র সকল তন্ম্রাবশেষে পরিণত হইবে, যে দিন বাণিজ্য ব্যবসায়ের শেষ নামও আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে না, যে দিন এ দীনের ন্যায় শরীর-ধারী মানব আর ভারতে উৎপন্ন হইবে না, সেই দিন মরিতে হয়, মরিব। এখনও লোক উৎপন্ন হইতেছে; এ সংসারে কেহ অনাহারে মরিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই; যদি চাকুরি ভিন্য আর অন্য উপায় না থাকে? মনে করুন, আজ হইতে সমস্ত চাকুরির পথ রুদ্ধ হইল; কাল কি সমস্ত ভারতবাসী অনাহারে মরিবে? আপনি বিশ্বাস করেন করুন; আমি

বিশ্বাস করি না; বিশ্বাস করি না—চাকুরি তিন্ন ভারতবাসীর জীবিকা-নির্কাহের আর উপায় নাই। ঐ দূরবর্তী বিস্তীর্ণ শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র সকল কাহার জন্য? আর ঐ যে শ্মশান, উছাই বা কাহার জন্য? হয় ঐ ক্ষেত্র সকল ভারতবাসীর জীবিকা-নির্কাহের উপায় সংস্থান করিয়া দিবে, না হয় ঐ শ্মশান আহ্বান করিয়া ভারতবাসীদিগকে অনন্ত ভস্মরাশিতে মিশাইবে! হয় মরিব—না হয় বাঁচিব। পরের চাকুরি করিয়া বাঁচিতে হইলে, বাঁচিব না—এ দেহ বিশ্বস্তির অতল জলে ডুবাইব; চিহ্নও রাখিয়া যাইব না। কিন্তু কিছু কাল অপেক্ষা করিব—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, ভারতবাসীর আর উপায় আছে কি না? যখন উত্তর পাইব,—‘আর উপায় নাই’ যখন ভারত উত্তর করিবে, ‘ভারতের পূর্বে স্মৃতি বিশ্বত হও, সে দিন আর আসিবে না’ তখন, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে যেমন পতঙ্গ ইচ্ছা করিয়া পুড়িয়া মরে, আগিও সেই প্রকার এই দেহ, এই শরীর, এই মন অতল জলে বিসর্জন দিব; কাহারও মুখের প্রতি তাকাইব না; কেহ সঙ্গে আসিল না বলিয়া সামান্য নিখাসও কেলিব না।

জগদীশ বাবুর শরীর বিকশিত হইল, বলিলেন, শরৎ! কল্পনার কথা ছাড়িয়া দাও; বল ত, আজ কর্ম পরিত্যাগ করিলে, কল্য তুমি কি করিবে?

শরৎচন্দ্র পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—‘কল্যই ভারতকে জিজ্ঞাসা করিব; কল্যই যদি মৰ্ম্মভেদী উত্তর পাই, তবে কল্যই এই শরীরকে ডুবাইব, কেহ চিহ্নও দেখিবে না; আর যদি দেখি, এখনও উপায় আছে, এখনও শস্ত উৎপন্ন হইতে পারে, এখনও লোক বাঁচিতে পারে, তবে কল্যই চেষ্টা করিব, বাহাতে ভূমিতে চাস পড়ে; কল্যই জীবন-ক্ষেত্রে কর্বণী চালাইয়া স্মৃফল উৎপন্ন করাইয়া লইব; যদি ক্ষেত্র থাকিতে চাস করিতে না পারি, তবে আর আশা কি, ফরসা কি? তবে আর মাছুষ কি,—মহুঘাত্ত কি? তবে আর জ্ঞান কি? শিক্ষা কি? তবে আর বিদ্যা বুদ্ধি কি? যখন চাসেও কিছু হইল না, দেখিব; তখন এ রাজ্য ছাড়িয়া, যেখানে ক্ষেত্রে বীজ পড়িলে নষ্ট হয় না, সেইখানে যাইয়া বীজ বপন করিব; সময়ে সেই শস্ত আনিয়া ভারতের প্রাণ বাঁচাইব।

জগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের কথার ষ্যর্থভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন,—তুমি আশ্চর্য্য লোক দেখিতেছি, চাস করিয়া

খাইবে, তবুও চাকুরি করিবে না ? এ বুদ্ধি তোমাকে কোন্ বিধাতা দিয়াছেন ? বাপু ! ও সকল পাগলের মত ছেড়ে দেও ।

শরৎচন্দ্রের ছদ্মবে দেব গর্জন হইল ; বলিলেন,—‘স্বাধীন মত পরিত্যাগ করিব কি জন্ত ? আপনি আমার অবলম্বনীয় পথের দোষ দেখাইয়া দিন, এখনই নত শিরে আপনার কথা পালন করিব। যদি দোষ দেখাইতে না পারেন, তবে স্বাধীন মতের বিরুদ্ধ-কথা বলিবার আপনার কি ক্ষমতা ? আপনি কি জানেন না যে, প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন ? প্রত্যেক মনুষ্য আপনার মতে চলিবে, কি প্রকারে আশা করেন ? বিশেষত অল্পের মতে কি দোষ, তাহা আপনি দেখাইতে পারেন না ; যে ব্যক্তি অল্পের অবলম্বনীয় মতের বিরুদ্ধে দোষ দেখাইতে না পারে, তাহার স্বাধীন মত সম্বন্ধে বাধা দিবার কি অধিকার ? আপনি আমার মত পরিত্যাগ করিতে বলিলেন ; ভাল, আমার কথায় অগ্রে আপনার মত পরিত্যাগ করুন ; তারপর আমার মত পরিত্যাগ করিব। আপনি চাকুরি ছাড়িয়া দিন, আমি চাপ করিবার মত ছাড়িয়া চাখুরির মধ্যে মাথা ঢুকাই। কিন্তু আমি জ্ঞান থাকিতে আপনার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে চাহি না ; আপনার নিকট চাকুরি ভাল, আপনি করুন, আমার ভাল লাগে না, আমি করিব না। আমার স্বাধীন মত সম্বন্ধে আপনার কথা কহিবার কি অধিকার ? চাকুরি ভিন্ন আপনি জীবন ধারণের আর উপায় দেখেন না, আপনি করুন ; আমার নিকট শত সহস্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, আমি কেন আপনার মতে চলিব ?

জগদীশ বাবু এ সকল কথা উত্তমরূপে বুঝিলেন, বুঝিয়া একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসি, তোমার উন্নতিতে আমোদ হয়, অবনতিতে হুঃখ পাই, তাই ঐ প্রকার কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম ; আমাকে ক্ষমা কর। আমার কথা না শুন, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। অবাধ্য হইলে কাহারও হাত নাই। শরৎ ! তোমার মনের বাসনা কি, আমি বুঝিতে পারি নাই ; তোমার কথা শুনিয়া যদি আমি সন্তুষ্ট হই, তবে সে সকল আমাকে ভাল করিয়া বল।

শরৎচন্দ্র এবার নম্রভাবে বলিলেন,—আমার জীবনের কথা শুনিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, আমার ইচ্ছা, দেশের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই একটা কথা, (যাহা পূর্বে বলিয়াছি) জিজ্ঞাসা করিব ; যদি নৈরাগ হই, তবে এদেশ ছাড়িয়া অস্ত্র স্থানে যাইব।

জগদীশ বাবু।—যতই তোমার কথা শুনি, ততই যেন আরো, সমস্ত্রায় জড়িত হই। দেশের দ্বারে দ্বারে কাঁদিবে, তাহাতে কি হইবে? আর কি বলিয়াই বা কাঁদিবে, শুনিতে হৃদয় বড়ই উৎসুক। আবার তুমি বলিলে সে কথা শুনিলে আমি স্মৃষ্টি হইব না। তবে সে কি তোমার হৃৎথের কথা? শরৎ! যদি বাধা ঠা থাকে, তবে বল, শুনি।

শরৎচন্দ্র।—আমার জীবনের হৃৎথের কথা নহে, সে স্মৃথের স্বপ্ন। আমার স্মৃথ, আমার মনে। তবে আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না কেন? তাহার অনেক কারণ আছে; শুনিতে চান, বলিতে পারি; কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিবে না; মনের কথা মনেই রাখিতে হইবে।

জগদীশ।—তবে বল; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে সকল কথা আর কাহাকেও বলিব না, তোমার জীবনের স্মৃথের কথা শুনিয়াও যদি সন্তুষ্ট না হই, সে দোষ তোমার নহে, সে দোষ আমার; শরৎ! তোমার মনের কথা বল, শুনিয়া সন্দেহপূর্ণ মনকে স্মৃস্থির করি।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, কি কথা বলিব? হৃদয়ের হৃৎথ উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর বলিবার কি আছে? ইচ্ছা হয় শুনুন। এই বলিয়া শরৎচন্দ্র ধীরভাবে প্রাণের কথা বলিলেন। ভারতের অবনতি—অধীনতা না ঘুচিলে আর দেশের মঙ্গল নাই, এ কথা বলিলেন। ভারতকে ইংরেজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, বলিলেন। দ্বারে দ্বারে দেশের শৌচনীয় কাহিনী, ইংরাজ-অত্যাচার প্রচার করিয়া সমবেত মত গঠন করিতে চেষ্টা করিবে, বলিলেন। আবশ্যিক হইলে, ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, বলিলেন।

জগদীশ বাবু চমকিত হইলেন; বলিলেন, শরৎ! তোমার কথা শুনে আমার হৃদয় কাপুচে। কঠোর বৃটীশ রাজ্য-শাসন, তোমার পরিণাম যে কি হইবে, তা বুঝিতে পারি না। আমি তোমাকে এখনও নিষেধ করি, এ কর্ণকিত পথ ছেড়ে দাও। ইচ্ছা করে কেন বৃথা জেলে প্রাণ হারাবে!

শরৎচন্দ্র।—জেলের ভয় করি না, এ জীবনে যদি কর্তব্য পালন করিতে পারি, তাহা হইলে জেলে ঘাইব, ভয় করি না? আপনার মন যে এত নিস্তেজ, ইহাতে অত্যন্ত হৃৎথিত হইলাম। বাহা হউক, আমাকে আর বাধা দিবে না; আমি আর পরের চাকুরি করিব না।

জগদীশবাবু।—চাকুরি করিতে না চাও, ভালই; কিন্তু তোমাকে

একটা কথা বলি ? আর পাগলামি করো না ; আমার এখানে থাক ; আমিই তোমার ভরণ পোষণ করিব। শেষকাগটা ভেলে প্রাণ হারাবে, তাহা আমার সহ্য হবে না ; বৃটিশ-শাসন অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়েছে ; একটু সাবধান হও ।

শরৎচন্দ্র ।—বৃটিশ-শাসন ভয়ানক হয়েছে বলেই আমার আর সহ্য হয় না ; কিন্তু কি করি, অসহায়, সম্পত্তিহীন । বাহা হউক, চেষ্টা করেও যদি কিছু করিতে না পারি, সে দোষ কাহার ?

জগদীশবাবু ।—তুমি বালক, কি চেষ্টা করিবে ? তোমার আমার চেষ্টায় কি হবে ? তোমার আমার মত নিরজীব শৃগাল বৃটিশ-সিংহের কি করিতে পারে ? কেবল ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাহাও সকল সময়ে নহে ; বাঙ্গালী-শৃগালে ইংরাজ-সিংহের ক্ষুধাও সকল সময়ে নিবারিত হয় না । তুমি আর পাগলামি কর না ।

শরৎচন্দ্র ।—আমার চেষ্টায় হবে কি ? কি হবে, তা কে জানে ? কিছু হউক না হউক, সে জ্ঞান আমি ভাবি না, আমার কর্তব্য কার্য্য করিতে প্রাণপণ যত্ন করেও যদি কিছু উপকার না হয়, সে জন্য আমি কুণ্ঠিত নহি । চেষ্টা করি—আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিতে যত্নশীল হই, তাতেও যদি কিছু না হয়, নাচার ! আপনি আপনার নিকটে থাকিতে বলিলেন, আপাতত দিন কয়েক থাকিব, কিন্তু যখন বৃষ্টি, সময় হইয়াছে, তখনই আমার পথ আমি পরিষ্কার করিব ।

জগদীশবাবু বিস্ময়ে বলিলেন,—কিসের সময় শরৎ ?

শরৎচন্দ্র ।—কিসের সময়, তা বলিব না, আপনি আর কথা বাহির কনিবার জ্ঞান চেষ্টা করিবেন না । যখন সময় হইবে, তখন দেখিবেন, দেখিয়া বুঝিবেন, কিসের সময়ের কথা বলিতেছি । এখন প্রাণান্তেও বলিব না ।

জগদীশবাবু উত্তর না পাইয়া অবাৎ হইয়া বসিয়া রহিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা ।

কুশলময়, পক্ষপাতী, অত্যাচার-শূন্য ব্রীষ্টীয় রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারত-বাসীর অকৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে বহিঃপ্রস্ফুট হইয়া, লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে

ধর্মপরায়ণ খেত-মহাপুরুষগণকে অসময়ে ভয়ভূত করিয়া, রাজভক্তি-প্রসিদ্ধ ভারতের ললাট-প্রদেশে যে একটা কলঙ্ক-রেখা উদ্ভাবনেষ বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, আমরা সে সলঙ্ক-রেখা চিত্রিত করিতে আসিলাম কেন ? পরোপকার-রত, ধর্মপরায়ণ ইংলণ্ডবাসী সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতবাসীদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্ত কত কষ্ট সহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ; সে সকল স্মরণ হইলে চিরকাল ইংরাজ-রাজত্বের জন্ত মন তৃষিত হয় । ধনভারে ক্লান্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভারত নিদ্রা বাইতেছিলেন, ধর্ম-পরায়ণ ইংরাজ সে ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে শূন্যগর্ভ করিতেছেন ! মণি মুক্তা রত্নরাজি সকল এখন ইংলণ্ডকে কষ্ট দিতেছে ! পূর্বে ভারতে কখনও ছুর্ভিক্ষ হইত না, ইংরাজ অনেক সাধনা করিয়া এখন বৎসরের মধ্যে দুইবার করিয়া ছুর্ভিক্ষ আনিয়া লোক সংখ্যা কমাইয়া, স্বভাবের সাম্য রক্ষা করিতেছেন ! পূর্ক ভারতসন্তানেরা অন্ধকারে চক্ষে দেখিত না, এখন তাহাদের জন্মান্ন নয়ন ফুটাইয়া, চতুর্দিক রাজনীতির শৃঙ্খল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া ‘সংসারে লোভ পরবশ হওয়া অশ্রায়’ এই নীতি শিক্ষা দিতেছেন ! উচ্চ উচ্চ পদসকল গ্রহণ করিলে অসহ্য কষ্ট ভার সহিতে হয় বলিয়া, দয়া করিয়া সে সকল কঠিন কার্যের ভাব, খেত-ভল্লুকদিগের মস্তকে চাপাইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ! দেশীয় রাজ্য সকল ইংরাজাধীনে না আসিলে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়, তাই কষ্ট করিয়া সে সকলকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছেন । এ সকল ভাবিতে বসিলে আমাদের কঠিন মনও একেবারে গলিয়া ইংরাজরাজের পদতলে লুপ্তিত হয়, ভাবি, যতকাল ইংরাজ, ততকাল ভারতে ছুর্ভিক্ষ,—যত কাল ইংরাজ, ততকাল হাহাকার, যতকাল ইংরাজ, তত কাল আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি ! আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি, তাহাত আছেই !— ভারত বাহা দেখে নাই, তাহা দেখিল,—ভারত বাহা কখনও শুনে নাই, তাহা শুনিল,—ধর্মপ্রসিদ্ধ ভারত বাহা কল্পনা করে নাই, তাহা ঘটিল ! তাহা ঘটিল,—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ইংরাজ-রাজত্বের সুখ-সমৃদ্ধির দৃষ্টান্ত,— ইংরাজ-রাজত্বের অপকৃপাতী, অত্যাচার-শূন্য ন্যায়বিচারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ !!—পৃথিবী এই কথা কখনও বিশ্বস্ত হইবে না, বাবৎ ইতিহাস থাকিবে, তাবৎ এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে ।

আমরা নিঃস্বীকৃত বাঙ্গালী—চির দাসত্বে একেবারে উৎসাহহীন হইয়া

পড়িয়াছি, আমাদিগকে ভয় দেখাও, আমরা সমস্ত ভুলিয়া যাইব। এই সকল ভ্রাতৃ-বিচারের কথা বলিল, আমরা ঐ চতুর্দিক-বেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হইব ? ভয় দেখাও,—আমরা আর দুদিন পরে সকল কথা ভুলিয়া যাইব ; আবার তোমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্মের কথা লইয়া পৃথিবীকে ভুলিয়াইতে যাইও ; বলিও, তোমাদের শাসনে 'ভারত যার পর নাই সুখে অবস্থিত করিতেছে !' কিন্তু স্মৃতিময়ী কাহিনীর হাত এড়াইবে কি প্রকারে ? ইতি-হাসের পৃষ্ঠা চাকিয়া রাখিবে কি প্রকারে ? পৃথিবী তোমাদের কণায় ভুলিবে কেন ? অন্তর-যুদ্ধ কি কারণে দেশ মধ্যে প্রজ্বলিত হয়, তাহা সকল ইতি-হাসে শোণিতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ; তোমাদের চেপেয়া সেই সকল কথা ধোত হইবে না। ধোত হইবে না—১৮৫৭ সালে যে ঘটনা ভারত-কপালে একবার ঘটিয়াছে, তাহা আর অপনীত হইবে না।

যাঁহারা রাজভক্ত, এইবার তাঁহাদিগের সহিত আমাদের মতের বিরোধ উপস্থিত। তাঁহারা বলেন, ইংরাজের দ্বারা বাহা পাইয়াছি, তাহা আর কখনও আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। পরিষ্কার পথ ঘাট, তাড়িত-বার্তাবহ, রেল-গাড়ী, কলের জাহাজ, বিদেশীয় বাণিজ্য, সুশাসন, সুপ্রণালী, উচ্চ-শিক্ষা,—যে শিক্ষায় আমাদের মন সতেজ হইয়াছে, সেই শিক্ষা, বেদ পুরাণ-উদ্ধার, এই প্রকার শত সহস্র উন্নতি-সূচক কথা প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহারা বলিবেন,—বৃটন বাহা ভারতকে দিয়াছে, তজ্জন্ম চিরকাল ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ! আমরা বলি—বৃটন আজ পর্য্যন্তও নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদিগকে কিছুই দেয় নাই,—আমরা প্রত্যেক বিষয় লইয়া তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। যেখানে স্বার্থ, সেই খানেই দ্রুত পদনিক্ষেপে ইংরাজ অগ্রসর হইয়া বাহাবা লইতেছেন, কিন্তু বেদিকে স্বার্থ-নাশ, সেদিক ফিরিয়াও চাহিয়া দেখেন না ; শত শত বার স্মরণ করাইয়া দিলেও, ইংরাজের কর্ণে তাহা প্রবেশ করে না। সেই সকল বলিব কি ? রাজভক্ত বাঙ্গালি ! যে পথে ইংরাজের স্বার্থনাশ, সে পথে যে চিরকাল তোমাদের নিকট রুদ্ধ, তাহা কি তোমরা দেখিতেছ না ? আমরা দেখাইব না ; ইংরাজ আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিবে, তোমরা আমাদিগকে গালি দিবে। আমরাও এইবার হইতে সকল ভুলিয়া যাইব,—এইবার হইতে আমরাও 'জলমিশ্রিত দুগ্ধ' হইতে দুগ্ধপান করিব, জল পরিত্যাগ করিব। এইবার হইতে আমরা ডেলহাউসির রাজস্ব বিস্মৃত হইব,—এইবার হইতে ক্লাইবকে স্মৃতি-পথ হইতে অপসৃত করিয়া

দিব; এইবার হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা ভুলিয়া যাইব, এইবার হইতে ইংরাজ-রাজত্বের অত্যাচার-শূণ্ড ছায় বিচারের আড়লরময় কাহিনী শুনিয়া গুইকুমারের সহিত বনে যাইব। যাইব—বিলম্ব করিব না। যে শিক্ষার বলে আমরা আজ মুখ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছি, এই শিক্ষার গুণগান করিব; যে বাস্পীয়-রথ স্থাপিত হওয়াতে স্বদেশীর টাকা বিদেশীর হাতে দিয়া অনায়াসে দশ মাসের পথ দশ দিনে যাইতেছি, এই রেল গাড়ীর প্রশংসা করিব;—প্রশংসা করিব,—একটিকেও ছাড়িয়া দিব না; সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া একত্র করিব, করিয়া সেই গুণরাশির উপরে বসিয়া চিরকাল ইংরাজের গুণগান করিতে করিতে অনন্ত-কাল-সাগরে এই মানব দেহকে ভাসাইব! কিন্তু একটা কথা! ভাবী বংশ? ভাবী বংশও কি আমাদের ছায় ইংরাজের পদলেহন করিবে? ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমাদের জীবনকে বিক্রয় করিয়াও ভাবী বংশকে যদি পরাধীন হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে না পারিলাম, তবে আর আমরা মানুষ হইয়াছিলাম কেন? আমাদের জীবন বিক্রয় করিয়াছি, যাহাতে ভাবীবংশকে আর ইংরাজের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে না হয়, তাহা যদি করিয়া যাইতে না পারি; তবে আমাদের মন একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ভারতবাসি! বর্তমান জীবন বিক্রয় করিয়া ভাবী বংশ হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়া যাও দেখি !!

কি কথা বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! আমরা অন্ধিত করিতে বসিয়াছি,—ভারতের কলঙ্কের সূত্রপাত—১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহের পূর্ব বৃত্তান্ত। ডেলহাউসির স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব-কালে ভারত যে সকল রত্ন স্বীয় অঙ্গ হইতে খুলিয়া বটনের সঙ্গে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সকল রত্নরাজির কথা এখনও স্মৃতির পথ অতিক্রম করে নাই। অযোধ্যা, পঞ্জাব, মুলতান, সাতারা, ঝান্সি, ব্রহ্ম প্রভৃতি রত্নকে অঙ্গ হইতে খুলিবার সময় ভারত যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নিশ্বাসের সম্মুখে একটু অধিকণা পড়িয়াছিল, সেই অধিকণা প্রজ্জ্বলিত হইতে হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে বিকম্পিত করে। সেই অধিকণা দিল্লির রাজত্বের মধ্যে ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সাহার মৃত্যুর পর বাহাদুর সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজত্বকালীন উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মতামত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার মহিষী জেনাৎমেহাল একটা সন্তান জন্ম দেন, তাঁহার নাম জেয়ানবক্ত। ইংরাজ-রাজত্ব অনেক দিন

পর্যন্ত চক্রান্ত করিয়াও দিল্লীধরকে একেবারে ক্ষমতাশূন্য করিতে পারেন নাই, এই সময়ে তাঁহার মোগল সম্রাটদিগকে দিল্লি হইতে নির্বাসিত করিবার জন্য নূতন অভিসন্ধি করিলেন ; কিন্তু সহসা এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমস্ত দিল্লি নগর ক্ষেপিয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায়, তাঁহার এ পর্যন্ত এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই । সম্প্রতি ফকিরউদ্দিনের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন, এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য, দিল্লিনগরীতে ফকিরউদ্দিনের উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষমতা ঘোষণা করা হইল । জেনাৎমেহাল অস্তঃপুরে থাকিয়া তাঁহার ঔরসজাত পুত্রের ভাবী অন্ধকারময় জীবনের কথা কল্পনা করিতে করিতে অস্থির হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন । চূর্তাগ্যক্রমে ফকিরউদ্দিন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন । এই সময়ে জেলাৎমেহালের আনন্দের সীমা রহিল না । লর্ড ক্যানিং একটু ক্ষুণ্ণ-চিত্ত হইয়া এই রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য মূর্জামাহম্মদ ফরাসের সহিত আবার চক্রান্ত করিলেন ; এবং কিছু দিন পরে তত্রস্থ এজেন্টকে নিম্নলিখিত মর্মে পত্র লিখিলেন,—

১।—রাজার পত্রের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক হইলে, তুমি এই বলিবে যে, মূর্জা জেয়ানবন্দ সিংহাসন পাইবে না ।

২।—রাজার মৃত্যুর পর মূর্জামাহম্মদ ফরাস দিল্লির সিংহাসন পাইবে ।

৩।—ফকিরউদ্দিনের সহিত যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, মূর্জামাহম্মদ ফরাসের সহিতও সেই সেই বন্দোবস্ত, কিন্তু রাজ উপাধির পরিবর্তে তাহাকে সাহাজাদা উপাধি গ্রহণ করিতে হইবে ।

৪।—*

৫।—পূর্বে স্বীকৃত এক লক্ষ টাকার স্থানে ভবিষ্যতে মাসিক ৫০০০০ সহস্র টাকা মাত্র দেওয়া যাইবে ।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া জেনাৎমেহাল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ; বুদ্ধরাজা মহিষীর মনতুষ্টার্থ তাঁহার কথায় সম্মতি দিলেন ; তিনি প্রাণপণ করিয়া অন্তরে, বাহিরে স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার জল্প চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন । জেলাৎমেহালের ধারণা ছিল, যদি বৃটীশ গবর্ন-মেন্ট তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা হইলে বিদেশীর সাহায্য লইয়াও ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিবেন । এই সকল ঘটনার পর জেয়ানবন্দ একদিন বলিয়াছিলেন, ‘অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজরাজত্ব তাঁহার চরণে

মর্দিত হইবে।' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বহি, সে অধিকণা হইতে প্রাজ্ঞলিত হইয়াছিল, সে বহি জেনাংমেহালের হৃদয়ে ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই গবর্ণ-মেন্ট জানিতে পারিলেন যে, দিল্লীখর পারস্ত এবং অন্তান্ত রাজার সহিত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে মনস্থ করিয়াছেন; কিন্তু দান্তিক ইংরাজ মনে সহসা এ সকল আশঙ্কার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কোথ হইল না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বিদ্রোহের কথা সমস্ত দিল্লিময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত দেশকে জাগরিত করিবার জন্য যে উৎসাহযুক্ত কথার আবশ্যিক, তাহা যথাসময়ে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 'ইংরাজ-রাজত্ব উচ্চন্ন যাইবার সময় আসিয়াছে' এই কথা জনৈক ধার্মিক মুসলমান দেশময় রাষ্ট্র করিল; 'ইংরাজ-গণ হিন্দুর নাম লোপ করিবে, যাহাঙ্গা খ্রীষ্টীয়ান হইতে অস্বীকার করিবে, তাঁহাদিগের মৃত্যু নিশ্চয়' ইত্যাদি প্রকার নানা কথা নানা ছন্দে সমস্ত দেশ-বাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া দিল। সমস্ত দেশ সমরের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আমাদিগের পরিচিত ধনপৎসিংহ এই সময়ে দিল্লিতে ছিলেন; তিনি দিল্লি হইতে শরৎচন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন,—

“যে বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, সে বাসনা ফলবতী হয়েছে। দিল্লীখর নানা কারণে উত্তেজিত হইয়াছেন। অধো-ধার বেগম এবং নাগপুরের মাহারাজীয়গণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, দিল্লীখরের সহিত যোগ দিয়াছেন। পারস্য দেশের রাজা দিল্লীখরকে সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিখোর রাজা নানাসাহেব একান্ত মনে, সকল স্থানের সংবাদ লইতেছেন; অল্প দিন মধ্যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। তুমি আর বিলম্ব করিবে না। নানা সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে কানপুরে থাকিতে হইবে; আমি কোথায় থাকিব, তাহা ঠিক হয় নাই। নানা সাহেবকে তোমার কথা বলিয়াছি; তাঁহার অধীনের ২০ নম্বর অশ্বারোহী তুমি কর্তা হইবে; শীঘ্র আসিও, তুমি কানপুরে ছাড়িয়া পাটনার গিয়াছ কেন? আমি ইতিমধ্যে একবার কানপুরে যাইয়া শুনিলাম, তুমি পাটনা গিয়াছ। আমার ইচ্ছা আছে, আমিও কানপুরে যাইব। যাওয়া ঠিক হইলে আগামী শনিবারের পর-শনিবার কানপুরে যাইব; তুমি ঐ দিন আমার সহিত কানপুরে সাক্ষাৎ করিও। মোট কথা, ১৫ই মের পূর্বে কানপুরে আসিবে।” তোমার—ধনপৎসিংহ।

• পুরাকালীন কোন ঘটনা-পরম্পরার কানপুর ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ

নহে । পৌরাণিক সময়ের গৌরবের কোন চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না । কানপুরের উত্তরদিকে অনন্ত-বাহিনী গঙ্গা হিমালয় শেখর হইতে অবতরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; দক্ষিণদিকে মানবের হস্ত-রচিত প্রসিদ্ধ প্রশস্ত পথ, এলাহাবাদ হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত স্বর্ণরেখার স্তায় পড়িয়া রহিয়াছে । উত্তর পূর্বদিকে আর একটা প্রশস্ত পথ লক্ষ্যে পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । মধ্যে আর একটা পথ বিখ্যাত পর্য্যন্ত গিয়াছে । কানপুরের ভৌগোলিক বিবরণে ইহা অপেক্ষা আর কিছুই নাই ; কোন বিখ্যাত ঘটনার জন্ত কানপুর বিখ্যাত নহে । বাণিজ্য সম্বন্ধে—কেবল মাত্র চর্ম্মের কারবার প্রচলিত ছিল । কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্নমেন্টের সৈন্ত স্থাপনের জন্ত কানপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সমস্ত কানপুর ছয় মাইল মাত্র প্রশস্ত, এই ছয় মাইলের অধিক-কাংই ইংরাজদিগের আবাসস্থান । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে ইংরাজ বেতন-ভোগী পদাতিক তিন সহস্রেরও অধিক ছিল, ইউরোপীয় পদাতিক প্রায় ৩০০ তিন শত এবং অশ্বারোহীও কম নহে । হইলার সাহেব এই সময়ে কানপুরের সৈন্যসংখ্যা পদে নিযুক্ত ছিলেন । হইলার দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে অধিতীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়া স্বীয় নাম বিখ্যাত করেন । মিরাতে এবং দিল্লিতে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন কুটিল রাজনীতিজ্ঞ এই হইলার সাহেব, স্বীয় অধীনস্থ সৈন্তের মধ্যে কোন অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে সক্ষম করেন নাই, পরন্তু দর্পসহকারে গবর্নর জেনারল বাহাদুরের নিকট লিখিয়াছিলেন,—‘কানপুরের কোন আশঙ্কা নাই ।’ অন্তরে অন্তরে সৈন্তগণের মধ্যে যাহা জলিয়া উঠিতেছিল, তাহার বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন । কিন্তু যে মাস যেমন অতীত হইতে লাগিল, অমনি তাহার সৈন্তগণের মধ্যে একটু একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল । সৈন্তগণের মধ্যে এই কথা একেবারে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, ‘হিন্দু এবং মুসলমান সৈন্যগণকে পৃথিবীর নিয়ে কোন স্থানে একত্রিত করিয়া প্রোথিত করা হইবে ।’ দেশীয় সিপাহী সৈন্তগণ এ কথা বিশ্বস্ত স্ত্রে শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল । হইলার সাহেব বুধা চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের মনের এই ভাব যখন অপনয়ন করিতে অক্ষম হইলেন, তখন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন । কানপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে “ম্যাগাজিন” ভিন্ন উৎকৃষ্ট আশ্রয় স্থান আর ছিল না, কিন্তু সহসা সিপাহীদিগকে দূরীভূত করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইলে, সিপাহীগণ পূর্বেই হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে, এই সকল

ভাবিয়া হুইলার সাহেব কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কানপুরে এই সময়ে এই প্রকার জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ একেবারে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিবে। ছুই এক দিনের মধ্যেই, হুইলার সাহেব কলিকাতার সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া, এলাহাবাদে পলায়নের প্রস্তাব ঠিক করিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মী হইতে সাহায্যার্থে হে সাহেব সহসা উপস্থিত হইল। লরেন্স সাহেবের নিকট হইতে সাহায্য আশিবার পর, হুইলার সাহেব বিখোর-রাজ নানা সাহেবের নিকট সাহায্যের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ অন্ত্যাচারে মহারাজ্যীয় সৈন্যের অন্তরে এইক্ষণ যে বহু প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় বৃটীশ গবর্ণমেন্ট পাইবেন, কি সাধ্য? নানা সাহেব চিরকাল রাজভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সহসা সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ার, ইংরাজ মহলে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। ডেল-ছাউসি যদিও নানা সাহেবের সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিবার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছিলেন, তথাপি বর্তমান সময়ে যাহা ছিল, তাহা কানপুরস্থ ইংরাজ-দিগের সৈন্য অপেক্ষা নিতান্ত সামান্য নহে। বিখোর পথের সম্মুখে রাজকোষ স্থাপিত, সহসা সেই স্থান হইতে ছুই মাইল অন্তরে নানা সাহেবের ছুই শত সৈন্য, কাশান প্রভৃতি সংগ্রাম সজ্জা সহ নবাবগণে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২২শে মে তারিখে এই ঘটনা ঘটে, উক্ত দিন কানপুরের সমস্ত দোকান প্রভৃতি বন্ধ ছিল। ২৬শে মে দ্বিতীয় অশ্বারোহী দল মাতিয়া উঠিলে, ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহে (২৪শে হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত) অন্তরে যতই বহু থাকুক না কেন, বাহিবে আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই। মে মাস এই ভাবে অতীত হইল।

জুন মাসের প্রথমে কার্ণারম্ভ চইবার কথা ছিল; কিন্তু সিপাহীগণের মধ্যে কার্ণারম্ভ সম্বন্ধে অনেক পোলযোগ বাধিয়া গেল। কাহার ইচ্ছা, হঠাৎ আক্রমণ করা, কাহার ইচ্ছা বিলম্ব, ধীরে ধীরে। অশ্বারোহীগণ অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হইয়া উঠিল। নানা সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নবাবগণে দাঁড়াইয়া আছেন, তাবিতো-ছেন,—এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সকল তাহার হস্তগত হইব। অন্য দিকে, সিপাহী অশ্বারোহীগণ উৎসাহিতচিত্তে ইংরাজ-শোণিতে দেশকে প্রাবিত করি-

বার জল্প প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সময়ে দ্বিতীয় অখারোহী দলের সুবাদার টিকা সিংহ নানাসাহেবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একদিন একত্রিত হইয়াছিলেন। টিকাসিংহ বলিলেন—“তুমি ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের ভার লও, আমি সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমান সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ-শোণিতে দেশকে প্রাবিত করিব।” নানাসাহেব উত্তর করেন—“আমি দুই দিকেই আছি।” দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য সৈন্যগণ অস্থির হইয়া পড়িল। তাহারা ম্যাগাজিন এবং রাজকোষের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, আর সর্বত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। নবাবগঞ্জের কয়েদীদিগকে ৪ঠা জুন তাহারা মুক্ত করিয়া দিল; এবং সরকারী দ্রব্যাদি সকল নিমেষের মধ্যে ভস্মাবশেষে পরিণত করিল। ইংরাজ কর্মচারীগণ গর্ভে আশ্রয় লইল। এই প্রকারে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

এ পর্য্যন্তও দিল্লি যাত্রার কথা সৈন্যগণের মন হইতে অপমৃত হয় নাই। দিল্লির রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য, সৈন্যগণ একমত হইয়া নানা সাহেবের অধীনে কর্ম করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে নানাসাহেবের বড় ইচ্ছা ছিল না, আপনি বিখ্যাত হইবার জন্য লালায়িত; তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া ৫ই জুন কলিয়ানপুরে আড্ডা স্থাপন করিলেন।

নানাসাহেব এখন বিপুল ক্ষমতাশালী, সমস্ত সিপাহীগণ তাঁহার অধীন, ভাবিলেন—দিল্লির জয়ে আমার কোন লাভ নাই। জয়ের পরে যদি সমস্ত সৈন্যগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন কি করিব? দিল্লীখর হয়ত আমাকে সম্মান নাও করিতে পারেন? আর কানপুরে থাকিলে আমিই এই স্থানের রাজা হইব,—মুহর্ত্ত মধ্যে ইংরাজ-রাজত্ব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমার অধীনে যে সৈন্য—যে মহাবল একত্র, মনে করিলে, আমি কি না করিতে পারি? এক মুহর্ত্ত মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় বিদ্রোহনিশান গগনে উড়াইয়া মনের বাসনা পূর্ণ করি! এই সকল কথা মনে ঠিক করিয়া তিনি কলিয়ানপুরের প্রত্যেক সৈন্যের মত পরিবর্তন করিলেন, এবং সমস্ত সৈন্যবলকে কানপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে অহুমতি করিলেন।

ধর্ম-প্রসিদ্ধ ভারতের কলঙ্কই বল, আর যাহাই বল; এই প্রকারে সে কলঙ্কের বহিঃপ্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যে প্রভূভক্ত নানাসাহেব ইংরাজমহলে

“রাজতক্ত” বলিয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপত্তি পাইয়াছেন,—ইংরাজ-গণের নিকট শকময় আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি পাইয়াছেন, সেই নানাসাহেব সহস্রা উদ্দীপ্ত হইয়া আজ ইংরাজের প্রধান শত্রু,—আজ কানপুরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান উদ্যোগী। কে বলিবে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ-রাজত্ব অত্যাচারশূন্য ? বাঁহার সাহস থাকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া নানাসাহেবের জীবন অধ্যয়ন করুন, বুঝিবেন, বিনা অত্যাচারে তক্তের শীতল রক্ত কখনও উষ্ণ হইয়াছিল না। ভারত-সম্প্রদায়ের রক্ত সে প্রকার কৃতজ্ঞতা-শূন্য নহে। নানাসাহেব সিংহের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া একেবারে ৬ই জুন ছইলার সাহেবের নিকট স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাত করেন ! নানাসাহেব নির্জীবের ন্যায় কার্য্য করেন নাই ;—গোপনে হঠাৎ ইংরাজের দুর্গ আক্রমণ করেন নাই, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে অল্পগৌরবের বিষয় নহে। এই দিনের পর মুহূর্ত্ত হইতে যদি ইংরাজরাজত্ব উঠিয়া যাইত, তবে আমরা ক্লাইব এবং নানাসাহেবের জীবন সমালোচনা করিয়া বলিতাম, এক জন পরধনে-মুগ্ধ চোরের ন্যায় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সিরাজের সিংহাসন অপহরণ করিয়াছিলেন, আর একজন বীরের ন্যায় আহ্বান করিয়া ইংরাজ পরাক্রমকে পরাজয় করিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য ভারত, গুরুধা সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায়, মুক্তশৃঙ্খল আবার পায়ে পরিতে বাধ্য হইল !!

নানাসাহেবের অধীনে আরো কয়েকটি ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন ; তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই হিন্দুবংশজাত। টিকাসিংহের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমাদার দ্বলগনজন সিংহ এবং সুবাদার গঙ্গাদীন অল্প পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। আর একটা লোক,—সেই লোকটির ন্যায় পরাক্রমশালী লোকের এই সময়ে নিতান্ত আবশ্যিক ছিল ; সেই লোকটি আমাদের পরিচিত শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ধনপৎসিংহের পত্র পাইয়া পাটনা হইতে কানপুরে আসিয়াছেন, তিনি এখন এক দল অস্বাভাবিক কর্ত্তা। ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকেরা হিন্দুচরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, কানপুরের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু ইংরাজ অত্যাচার না থাকিলে ভারতের এ পাপচিত্র আজ আমাদের অঙ্কিত করিতে হইত না। অত্যাচার ভিন্ন অন্তরযুক্ত উপস্থিত হয় না। ৫ই জুন নানাসাহেব ছইলার সাহেবের নিকট প্রকাশ্য পত্র লেখেন, ৬ই আক্রমণ আরম্ভ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গভীর নিশীথে ।

যে আভ্যন্তরীণ বহু প্রজ্জ্বলিত হইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে বিলোম-
ড়িত করিয়াছিল, কানপুরের হত্যাকাণ্ড, তাহার একটা ফুলিঙ্গ মাত্র ।
ইতিহাস এই বিষয় বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করি-
তেছে । হুশ্ছেদ্যা চিরদাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভারত মধ্যে মধ্যে যে
প্রকার লোমহর্ষণ ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকে, তাহা অনন্তকাল
ইতিহাসপটে লেখা থাকিবে । কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত আমাদের
প্রস্তাবের ঘটনা সংশ্লিষ্ট আছে, আমরা তাহাই বর্ণনা করিব ; সিপাহিযুদ্ধের
ইতিহাসে অন্তান্ত ঘটনা লিখিত আছে ।

আজ কানপুরের হত্যাকাণ্ডের স্মরণ পূর্বদিন । যে অগ্নি ধীকি ধীকি
অগ্নে অগ্নে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মহাপ্রজ্জ্বলিত হতাশনে পরিণত হইয়াছিল, সেই
অগ্নি আজ আর জ্বলিতেছে না ; সমস্ত দিন ধূম উদ্গীরণ করিয়া এখন
ধামিয়া রহিয়াছে, এই বহু কলা প্রজ্জ্বলিত হইবে । যাহারা এই কাণ্ডের
নায়ক, তাহারা উৎসাহিত মনে সুপ্রভাতের অপেক্ষা করিতেছে ।

রাত্রি দেখা দিল, সূর্য্যদেব যেন ভয়ে ভয়ে, আপন আলোককে নিবাইয়া
কুটীরে প্রবেশ করিলেন ; এদিকে চন্দ্রমা প্রফুল্লবদনে ভারতকে হাসাইতে
আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন, কানপুরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ।
ক্রমে ক্রমে রজনী গাঢ়তর হইয়া আসিল, চতুর্দিক নিস্তব্ধতার ধারণ করিল ।
অস্ত্রের ঝন্ঝনি, গুপ্ত পরামর্শ, গোপনীয় গমনাগমন ক্রমে ক্রমে সকলই
ধামিয়া আসিল । কেহ ময়দানে, কেহ ঘরে, কেহ বাহিরে, যে যেখানে
পাইল, সে সে স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল । সহরের চতুর্দিকই গুপ্ত
বিদ্রোহিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ, অথচ আজ অসময়ে সকলই নীরব হইল ।
প্রকৃতিদেবী কি ভাবিয়া যেন আজ নীরবের সাজ পরিয়া বিরাজ করিতে
লাগিলেন । শরৎচন্দ্রের চক্ষে নিত্রা বসিল না, তিনি আন্তে আন্তে
শয়ন ঘরের দরজা খুলিয়া বহির্গত হইলেন, সঙ্গে একখানি তরবারি
লইলেন, কেন লইলেন, তাহা তিনিও বোধ হয় তখন জানিতেন না ;

ঠাহার মন চিন্তায় অভিভূত। গৃহ হইতে এক মাইল দূরে তরঙ্গময়ী গঙ্গা তর তর শব্দে লহরী তুলিতে তুলিতে সাগর সন্নিধানে ঘাইতেছে ;—কত গ্রাম, কত পল্লী, এবং কত নগরের পদসেবা করিতে করিতে আন্তে আন্তে ঘাইয়া সাগরে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করিতেছিল। নিশানাথ প্রফুল্ল বদনে জলশ্রোতকে দীপ্তিমান করিয়া অপূর্ব সাজে সজ্জিত করিতেছিল। শীতল বায়ু-বিলোড়িত কল কল তরঙ্গ সমূহ মনের উল্লাসের সহিত চক্ষের আলো হৃদয়ে ধরিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছিল। সহস্র সহস্র বীচিমালা একই সময়ে উখিত হইয়া, বাল-স্নগড চঞ্চলতার পরিচয় স্বরূপ, একটার পশ্চাৎবর্তী হইয়া অগ্ৰটার প্রফুল্লতা বিনষ্ট করিয়া, স্বীয় মনের স্মৃথে হাসিতেছিল। এই প্রকারে কত তরঙ্গ লীন হইল, আবার কত নূতন তরঙ্গ সেইস্থান পূর্ণ কবিয়া, মনের আনন্দে, মাতার ক্রোড়ে শিশুর আয়, হাসিয়া হাসিয়া আফ্লাদ প্রকাশ করিতেছিল। আকাশের একদিকে হঠাৎ একটু মেঘ উঠিল, পরের আফ্লাদে কাতর হইয়া, পরের হাঙ্গু মুখ মলিন করিবার জন্ত যেন উদিত হইল। জলতরঙ্গ চঞ্চল হইয়া মলিন বেশে কলরব করিয়া উঠিল, মাতার নিকট হৃৎখের কথা হৃৎখের স্বরে যেন বলিতে লাগিল। মেঘের মধ্য হইতে কোন কোন পরহৃৎখ-কাতরা দেবকণ্ঠাগণ, সৌদামিনী বেশে, দণ্ডে দণ্ডে দেখা দিয়া সকলকে আশ্বাসিত করিতে লাগিল। মেঘ-প্রতিবিম্বিত জলতরঙ্গের নিকটবর্তিনী স্থান সমূহে মিটা মিটা নক্ষত্রগণের আলো জ্বলিতেছিল।

শরৎচন্দ্র এদিক ওদিক ঘুরিয়া অবশেষে এই নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি অশ্রুমনস্ক হইয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন। সেইস্থানের গভীরতায়, নিস্তরুতায় ঠাহাকে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন করিল, তিনি বাহুজ্ঞান-শূন্য হইয়া সেই স্থানের সেই ভাব-সমুদ্রে বাঁপ দিয়া, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার কি ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—“তটা ভিষা তিনী তরঙ্গিনী ! তোমার হৃদয়ে আজ কেন এত উল্লাস ও আনন্দ-লহরী উখিত হইতেছে ? অশ্রু দিন তোমাকে দেখিলে হৃদয় হৃৎখে অবসন্ন হইত, আজ তোমাকে দেখিয়া কত ভাবের উদয় হইতেছে। তোমার নীল-পরিধান কল্য রক্তিমার পরিণত হইবে, এই জন্ত কি তোমার আজ এত প্রফুল্লতা দেখিতেছি ? কল্য তোমার মনের বাসনা

পূর্ণ হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হর্ষ-পবন বহিতেছে ? আর হৃদয় নাচিতেছে ? নীরবে র'লে কেন ? তুমি কত জনকে কুল কুল করে কত প্রবোধ দিয়া সুখী করেছ, আমার প্রশ্ন শুনে আজ নীরব হলে কেন ? আমি কি তোমার সুখের কণ্টক হলেম,—আমি কি তোমার আফ্লাদের কণ্টক ? নচেৎ হঠাৎ এভাবে ধারণ করিলে কেন ? বল,—সুখদামিনী, তাবুকের সুপ্ত শক্তি-উত্তেজিত-কারিনি, শরৎচন্দ্রের জীবন-তোষিণি, নীরব হলে কেন, বল ? বল, আমা হ'তে যদি তোমার হৃৎ অপর্যনের পরিবর্তে আরো হৃৎ বৃদ্ধি হয়, তা হলে বল, আমি চলে বাই !”

হঠাৎ আকাশের দূরস্থিত মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল, চতুর্দিক সহসা অন্ধকারে আবৃত হইল ; শরৎচন্দ্রের মনে বিষাদ-তরঙ্গ নাচিতে লাগিল, চঞ্চল নয়ন বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, মৃৎস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“এ আবার কি ? আমার বিষাদ-সমুদ্রে আবার তরঙ্গ উঠিলো কেন ? চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত। সে প্রফুল্লতা কোথায় ? কে এ সময়ে এমন সুখে বাধা জন্মাইল ?” নীলাভ আকাশের কোণে মেঘ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—“তোমার এই কাজ ? তোমার নিকট আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি হঠাৎ আমার সুখের বাধা দিলে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হরণ করিলে ? তোমাকে সকল সময়েই চঞ্চল দেখি, আজ এভাবে ধারণ করিলে কেন ? বায়ুভরে স্থানান্তরে চলে যাও, আমার মনে আর কষ্ট দিওনা। এই বিমল চন্দ্রমা উজ্জ্বলিত তরঙ্গের সহিত কত আফ্লাদে ক্রীড়া করিতেছিল, তুমি বাধা দিলে কেন ? আমি এখানে এসেছি বলে ! আমি কি এমনি নরাধম যে, সেখানে যাই, সেইখানেই বিষাদ-তরঙ্গ উথিত হয় ?” আকাশে চন্দ্রমাকে না দেখিয়া—“জগৎসুখ ! হায়, তুমিও আজ হাস্যবদন লুকাইলে ?

হঠাৎ করস্থিত তরবারির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “শরৎসুখ ! তুমিও মলিন হলে ? তোমার সে চাক-চিক্য কোথায় ? বাহা দেখিলে হৃদয়মন উৎসাহে মাতিয়া উঠে,কই তোমার সেই উজ্জলতা ? এই ত কিছু কাল পূর্বে তুমি কত নবভাবে মত্ত হয়ে নাচিতেছিলে, আশ্ফালিত হতেছিলে, এর মধ্যে আবার তোমার এ পরিবর্তন কেন ? আমার বল, তরসা, সাহস, সকলি তুমি, তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হচ্চো কেন ? বাঙ্গালীর জীবন বলে ? বাঙ্গালীর হস্তে তোমার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত হবে বলে ? চির নিস্তেজ বাঙ্গালী—এই অস্ত্র কি তোমার মনে ঘৃণা হইতেছে ? শরৎচন্দ্রের প্রতি এত বিরক্ত হলে কেন ? আমি

কি এমনি ক্লান্ত যে, তোমার নামে কলঙ্ক রটাইব,এ জীবন থাকিতে তোমার মনোবাহা পূর্ণ না করিয়া ক্লান্ত হবো ? তবে এভাবে ধারণ করিলে কেন ? তোমার মনে সন্দেহ হইতেছে ? কেন সন্দেহের ত কোন কারণ দেখি না, আমি ত সেই শরৎচন্দ্র, আমার কি সাহস নাই ? এই দেখ, তোমাকে সেই ভাবেই চালনা করিতে পারি,” এই বলিয়া তরবারি চালনা করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু বিফল-বস্ত হইয়া বলিলেন,—“একি এ ? হস্ত নিস্তেজ হলো কেন ? এইত ছুঘটা পূর্বে কেমন অস্ত্রচালনা করিতেছিলাম, এমি মধ্যে এত পরিবর্তন ! এত পরিবর্তন হলো কেন ? মন ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত চঞ্চল হচ্চো কেন ? তোমার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় ? রজনী প্রভাত হয়ে আসিল, এমন সময়ে তুমি এত চঞ্চল, এত অধীর হলে কেন ? তুমি কি ভাবিতেছ ? বাঙ্গালীর মন চঞ্চল, তা তুমি তা বেশ জানতে,তবে কার্যের সময় সে কথা ভুলে গিয়া আবার চঞ্চল হচ্চো কেন ? সুখ-ইচ্ছা বাঙ্গালী জীবনের স্পৃহনীয়, আদরনীয় বস্তু,—সংসারের বিষফল, তা ত তুমি জান, তবে তোমার আবার সুখ ইচ্ছা হইতেছে কেন ? বিলাস-প্রিয়তা বাঙ্গালী জীবনের উন্নতির কণ্টক, তা ত তুমি বেশ জান,তবে তোমার আবার সে বিলাস-ইচ্ছা হইতেছে কেন ? স্বার্থপূর্ণ-প্রণয় বাঙ্গালী জীবনের অধীনতার মূল সূত্র, একথা তুমি অনেক দিন হইতেই জান, তবে তোমার হৃদয়ে আবার সে বিষফল অঙ্কুরিত হইতেছে কেন ? তুমি কি না জান ?—সংসারের:বুধা মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার অন্ডায়, ত বে তুমি আবার মায়ায় জড়িত হইতেছ কেন ? ‘মস্তের সাধন কিম্বা শরীর পাতন’—এ মন্ত্র তোমার চিরসম্বল, একথা আজ বিস্মৃত হইতেছ কেন ? এ প্রশস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার কে আছে যে,তার জন্ত তুমি ব্যাকুল হইতেছ ? সংসারে কে কাহার ? চক্ষু বুজিলে সকলই ফাঁকি, তবে তুমি এত অধীর হইতেছ কেন ? তবে তুমি ভারতের জন্ত প্রাণ দিতে কাতর হইতেছ কেন ? এ জীবন যাহা হতে পাইয়াছ, সেই ভারতের জন্ত এ শরীরের রক্তপাত করিতে কাতর হইতেছ কেন ? কি ভাবিতেছ ? কোন্ প্রতিমা তোমাকে অধিকার করিতেছে ? এমন সুখের সময় কে তোমার মনে সন্দেহ-মেঘ উঠাইল ? কে সেই কালফণীর বিষের কথা তোমার স্মৃতি-পটে উঠাইল ? এই জন্য কি তুমি নিস্তায়িত হইতেছিলে না ? এই জন্য কি তোমার ? এত বিড়ম্বনা, দিক মন, এসময়ে কাপুরুষের ন্যায় কাজ করা তোমার উচিত নহে !!”

বিজয়ী এজগতে অতি বিরল, মনুষ্য চরিত্র বিচিত্র ! আমরা যাহাকে পরম ধার্মিক, জীতেন্দ্রিয় মনে ভাবিয়া প্রশংসা করি, তিনিও পবিত্রতার আকর পরমেশ্বরের নিকট অপবিত্র ! সম্পূর্ণতা সম্যকরূপে মনুষ্য-জীবনে প্রায় ঘটে না। পক্ষান্তরে দেখিয়া অবাক হই, সংসারে আমরা যাহাকে সম্পূর্ণতা মনে ভাবি, তাহাই অসম্পূর্ণ ! একথা শুনিতে তত ভাল নহে বটে, কিন্তু কখন কাহারও চরিত্রে কালিমা উদ্ভিত হয় নাই, একথা কেহই বলিতে পারেন না। ধার্মিক তাঁহাকে বলি, যিনি সরল ভাবে স্বীকার করেন, সম্পূর্ণতা জগতে লাভ করা যায় না, বিজয়ী হওয়া যায় না', নচেৎ যাহারা বিজয়ী বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক, কপটী, ধর্ম পথের কণ্টক বলিয়া উপেক্ষা করি। মনুষ্যের জীবন চঞ্চলতার কর্ণিত ক্ষেত্র, বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক কার্ণোই চঞ্চলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র ও বাঙ্গালী, স্মরণ্য তাঁহাতে এই অসাময়িক চঞ্চলতা অসম্ভব নহে।

রাত্রি অবসান হইয়া আসিল, আধাঁরের কোলে অন্ন আলোক ভাসিল। ফুটন্ত ঈষৎরক্তাভ আলোকমালা 'দিক্দিগন্তরে ভ্রমণ করিয়া দিনের আগমন-বার্তা প্রচার করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নদী তিরে ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন, মনুষ্য-জীবনের অসারসুখ কল্পনায় মগ্নন করিয়া এত আত্মাদিত হইলেন যে, সকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া একমাত্র সেই বিদ্যাবাসিনীকে ধ্যান করিয়া বাঙ্গালী জীবনের অসারত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র একাগ্রমনে বিদ্যাবাসিনীর জীবন-ঘটিত সকল কথা মনে মনে কল্পনা করিয়া চিত্রিত করিতে লাগিলেন। বিন্দুর সেই সরল হাসি—সেই সরল ব্যবহার, সেই সরল কথাবার্তা একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন আলুলায়িতকেশা বিদ্যাবাসিনী, মলিন বেশে, গবাক্ষ-পথে, হস্তের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া, একাগ্রমনে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার বদনে দণ্ডে দণ্ডে কতপ্রকার নব নব ভাব প্রকাশ পাইতেছিল; শরৎচন্দ্র এক দিন অন্তরালে থাকিয়া এ সকল দেখিয়া যত সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, আজ এই নির্জন প্রদেশে কল্পনায় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

আর একদিন বিদ্যাবাসিনী অন্তরালে থাকিয়া মুহু মুহু হাসিয়া শরৎ চন্দ্রকে দেখিতেছিলেন, শরৎচন্দ্র জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'তুমি আমাকে

দেখিতেছে কেন ?' বিদ্যাবাসিনী মন্তক দোলাইয়া তাহাই উত্তর করিলেন, দুইজনের মধ্যে কত ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল ! এ সকল কথা আজ একে একে শরৎচন্দ্রের মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল ; সুখও দ্বিগুণতর অনুভূত হইতে লাগিল ।

অনুভবে ও কল্পনায় যে সুখ পাওয়া যায়, কার্যকালীন সে সুখ পাওয়া যায় না, কার্য আসে আর যায় । কার্যের সময় সুখ আয়ত্ত হয় না । সে সময়ে মন এত নিগূঢ়রূপে নিযুক্ত থাকে যে, সুখ সূত্রে বলিয়া হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না । কিন্তু বহুদিন পরে যখন সেই কথা কল্পনায় উদ্ভিত হয়, তখন দ্বিগুণতর সুখ উপভোগ করা যায় । শরৎচন্দ্র আজ প্রথম তুলি ধরিলেন, জীবনে আর কখনও সূত্রে আরত্ত করেন নাই । আজ তুলি ধরিয়া বিদ্যাবাসিনীর সরল মূর্তি, সরল ভাব, সরল হৃদয়ে চিত্রিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু সুখ আয়ত্ত হইল না, রজনী প্রভাত হইল, কোলাহল দিক ব্যাপিয়া আকাশে উঠিল । অন্তের বন্বনিতে দিক পূর্ণ হইতে লাগিল । চতুর্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হতাশনবৎ জলিয়া উঠিল । শরৎচন্দ্রের হাত হইতে সহস্রা তুলিকা ধসিয়া পড়িল । বিদ্যাবাসিনীর রূপ-চিন্তা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল ।

শরৎচন্দ্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল ; পুন সাহসে মন উদীপ্ত হইয়া উঠিল ; তিনি সহস্রা পূর্ববৎ তরবারি হস্তে লইয়া চালনা করিতে লাগিলেন ; পারকভায় সঁহার অপার আনন্দ হইতে লাগিল । তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া দলে মিশিতে চলিয়া গেলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

হত্যাকাণ্ড ।

আর এক পা,—মনে ভয় হইতেছে ? ধীরে, ধীরে, ধীরে, বান্ধালা পাঠক ! আর এক পা অগ্রসর হও । কণস্থায়ী মানবের জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কি প্রকারে অনন্তকাল-প্রবাহে মিশায়, তাহা কল্পনা করিলে শরীর বিকম্পিত হয় ? কল্পনায় আইসে না ? ধীরে, ধীরে, অভয়াস কর, ফিরিওনা, অগ্রসর হও । এই যা ! তোমরা আসিতেছ না ? অতীত-সাক্ষী ইতিহাস তোমাদিগের জ্ঞানের এই অভাষ মিটাইবে ।

আজিও দিন, আর পূর্বে সময়ের আবর্তনে রজনীর পর মুহূর্তে যে আলোক মস্তকোপরি শোভা পাইত, সেও দিন। দিনের ভারতমা নাই, কিন্তু অদ্যকার দিন শোণিতাক্ষরে চিরদিন, চিরকাল মানব হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে, ইংরাজ-হৃদয় হইতে আর কখনও প্রক্ষালিত হইবে না। ইংরাজ-হৃদয় হইতে প্রক্ষালিত হইবে না,—সে ভাল না মন্দ ? অধিদের মনে যদি ভাবী আশা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে,—আর আমরা যদি রাজনীতিজ্ঞ হই, তবে বলিতেই হইবে, এ ঘটনার পরে ভারতবাসীর অনৃষ্টচক্রের আবর্তন দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়াছে, এই ঘটনায় ইংরাজ চাতুরীবলে ভারতবাসীদিগকে ক্রীড়ার পুতুলের ন্যায়, ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া, কার্যক্ষেত্রে দুরাইয়া কার্যোদ্ধার করিয়া লইবে। নচেৎ এখন যে ভাবে আছি, তহাতে বলিতেই হইবে, মধ্যো মধ্যে ইংরাজদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া ভাল, কারণ আমরা আশা-শূন্য, আমাদের বল বীর্ণা চির-অস্থমিত ; ইংরাজগণ একটু ভয় না পাউলে আমাদের অস্তি মাংস অত্যাচারে পুড়িয়া অঙ্গার হইবে। আর ধার্মিকেরা কি বলিবেন, কে জানে ?

নগরবাসি ! পলাও,—ঐ দেখ সৈন্স আসিতেছে ;—একটা, দুইটা, পাঁচটা, পঞ্চাশটা, শতটা, কি ছাই গণিতেছ ? পলাও, পলাও, ঐ দেখ অনন্ত সৈন্য-প্রবাহ আসিতেছে ! কত গণিবে ? পদাটিকের দল চলিয়া যাইতে থাকিল। কোথায় যাইতেছে ? এত সৈন্স কোথায় ছিল ? এক হাজার, দুই হাজার, চলিতে চলিতে দশহাজার পদাটিক সারি সারি চলিয়া গেল। তারপর একি ? অশ্ব কেন ? শিক্ষিত বীরপুরুষগণ সজ্জিত হইয়া অশ্বগর্ভে উপবিষ্ট,—তরবারি নিক্ষেপিত ; অশ্ব চলিতেছে,—তড়াক, তড়াক, তড়াক। নগরবাসি, পলাও, পলাও, আজ সুখের বিপসি ভাঙ্গিবে ; আজ আনন্দের মেলা নিবিয়া যাইবে। এখনও দেখিতেছ ? পলাও, নচেৎ তোমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ? একদল অশ্বারোহী চলিয়া গেল, তারপর পশ্চাতে ও কি দেখা যাইতেছে ? সকলের সজ্জা এক রকমের, এ দেখি অল্প রকমের ; সকলের আকৃতি এক রকমের, এ আকৃতি সম্পূর্ণ বিক্লিষ্ট ; এ ব্যক্তি কে ? এ ব্যক্তি কি বলিতেছে ? নিস্তর হও, শুন, কি বলিতেছে !

নির্ভীক নগরবাসি ! এখনও পলাইতেছ না ? ঐ দেখ, আবার কি আসিতেছে। রণবাদ্য,—বাজিতেছে,—বম, বম, বম। বাজিয়া নিরুৎসাহিত চিত্তকে ও যেন ক্ষণকালের জন্য উৎসাহিত করিতেছে। বম, বম, বম বাজিয়া রণ-

বাদকদের দল চলিয়া গেল। নরনারী সকলে যেন সং দেখিতেছে। আর কতক্ষণ দেখিবে? ঐ দেখ, প্রবল বড়ের স্ত্রীর বায়ু বহিয়া আসিতেছে। এ আবার কি, কিসের শব্দ কাণে প্রবেশ করিতেছে? প্রলয়ের ঝড়? যদি তাই হয়,—নগরবাসি, পলাও,—পলাও, প্রলয়ের বড় আসিতেছে। যখন ঝড় আসিল, তখন নগরবাসীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গড়িল। অথের দ্রুতগমনে ধূলা বর্ষিত হইতে হইতে দিক্ অন্ধকারময় হইল। একটা অশ্ব? আর না হইলে দশ হাজার; নগরবাসীগণ কেহ পুত্র হারা, কেহ ভার্য্যা-হারা, কেহ বন্ধু-হারা, কেহ পিতা-স্বাতা-হারা হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; তাহাদিগকে বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল, গোলমালে দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কোম্পানিকো মল্লুক, কোম্পানিকো জয়। কেহ কেহ বলিল, কোম্পানিকো? মূর্খ নগরবাসি! তোর কোম্পানির সাথের বিপণি আজ ভাঙ্গিয়া যায়; আজ তাহাদের ডাকিতেছিস্ কেন?

ওদিকে দুর্গে কামান গর্জিয়া গগনভেদ করিল,—হুড়ুম—হুম্—বম্; হুড়ুম হুম্ বম্। একটা দুইটা, তিনটা গর্জিতে গর্জিতে একেবারে পঞ্চাশটা কামান গর্জিয়া দিক্ সমূহকে অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিল। কামান আবার গর্জিতে লাগিল,—হুড়ুম হুম্ বম্, হুড়ুম হুম্ বম্। “কে ভয় করিবে? নিরোধ ইংরাজ, সাহস থাকে, সন্ধ্যু সমরে আর, দেখি,তোদের বীর-অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারা যায় কি না? নচেৎ গৃহপিঞ্জর হইতে তোর গর্জন—হুড়ুম-হুম-বম্কে, আজ কে ভয় করিবে? একদিন ভারতে ছিল, যখন তোর গর্জন হুড়ুম হুম্ বমের ভয়ে শরীর কম্পিত হইত, এখন কে ভয় করিবে?” অধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন, “ভয় নাই, সৈন্তগণ সাহসে অগ্রসর হও। পাঁচজন পদাতিক মরিল, এই দশজন, এই ত্রিশজন? ভয় পাইওনা; সৈন্তগণ দুর্গের দ্বারে যাও। কামান আর কতক্ষণ গর্জন করিবে? ঐ দেখ,ক্রমে ক্রমে গর্জনের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। ভয় নাই, সৈন্তগণ! বীরের স্ত্রীর দুর্গের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হও। নিরোধ ইংরাজ? আর কতক্ষণ গর্জিবে? ঐ দেখ আর বারুদ নাই, ঐ দেখ গোলাব সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। নির্ভয়ে পদাতিকগণ, অগ্রসর হও, আর ভয় নাই। কামানের গর্জন থামিয়া আসিল। হতভাগ্য বৃটিশ সৈন্তগণ! তোদের দর্প আজ চূর্ণ হইবে। আজ তোদের পতন অনিবার্য্য! নির্ভয়ে সৈন্তগণ অগ্রসর হও! দুর্গ অন্ন করিলে তোমরা এ দেশের অধিকারী হইবে; ইংরাজের দৌরাণ্ড্য, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে ত নির্ভয়ে

সৈন্যগণ অগ্রসর হও ।” দুর্গের দ্বার রুদ্ধ । শব্দ হইতে লাগিল, “ভাঙ্গ দরজা ভাঙ্গিয়া ফ্যাল,” কাহার সাধ্য দরজা ভাঙ্গে ? ক্রমে ক্রমে সমস্ত পদাতিক-দল আসিয়া দুর্গ বেঠন করিল ; পদাতিক দলের রণবাদ্য বাজিয়া বলিতে লাগিল,—“ভাঙ্গ দরজা, ভাঙ্গিয়া ফ্যাল ।” কাহার সাধ্য, দরজা ভাঙ্গে ? একে-বারে সহস্র সহস্র বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল, তবুও দরজা ভাঙ্গিল না ; পদাতিকদল দরজা ভাঙ্গিতে পরাস্ত হইল । প্রথম অশ্বারোহীদল আসিল । অশ্বারোহীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি বলিলেন,—“কামান দাগাও, কামান দাগাও ; বন্দুকের কি সাধ্য যে দুর্গের দরজা ভাঙ্গিতে পারে ?” অমনিই কামানের ভীমরব গর্জিয়া উঠিল, একেবারে কুড়িটা কামানের গভীর হুঙ্কার বাইরা দরজায় প্রহত হইল, অমনি দরজা ভাঙ্গিয়া গেল । সৈন্য-গণ তখন নিৰ্ভয়ে দুর্গে প্রবেশ করিল । রণবাদ্য অমনি বাজিয়া উঠিল, দুর্গ আক্রান্ত হইল । অত্যাচারী ইংরাজগণ কোথায় ? কাহার সাধ্য বক্রিব-বেগ নিবারণ করিবে ? বক্রি হত শব্দে জলিয়া উঠিয়া গৃহ বাড়ী সব ভস্মময় করিতে লাগিল ! ইংরাজ-পতঙ্গ উপায়হীন হইয়া বহিতে পুড়িয়া মরিতে লাগিল !! অধ্যক্ষ বলিতে লাগিল, “সাবধান ! চতুর ইংরাজদিগকে বিশ্বাস নাই, পৃথিবীর আর সকলকে বিশ্বাস করিও, কিন্তু বণিকবেশধারী চতুর ইংরাজ-দিগকে বিশ্বাস করিও না । সাবধান ! অশ্বারোহীগণ, অশ্ব হইতে অবতরণ করিও না ; ঐ দিকে অগ্রসর হও ! অহঙ্কারী—আত্মাভিমानी—কৃতঘ্ন—বিশ্বাস-ঘাতক ইংরাজগণ কোথায় লুকায়িত হইয়াছে, অন্বেষণ কর ! ঐ যে, দুই দল ইংরেজ সৈন্য । অগ্রসর হও ! হইলার এবং মুর সাহেবের মস্তক ছেদন না করিতে পারিলে নিস্তার নাই, অশ্বারোহীগণ নিৰ্ভয়ে অগ্রসর হও ! চতুর্দিক বেঠন কর । দেখ যেন একটা প্রাণীও না পলায়ন করে ; সাবধান ! সাবধান ?” রণবাদ্য বাজিয়া বলিতে লাগিল—“সাবধান, সাবধান !! মূর্খ অশ্বারোহীগণ ও কি করিতেছ ? লুট করিবার সময় এ নহে । অশ্বারোহীগণ ও কি করি-তেছ ? শত্রুর বীজ রাখিতেছ কেন ? ঐ যে বৃটিশ ললনাগণ সমরে আসি-তেছে, ঐ যে বালকগণ, সাবধান কেহ যেন পাশ কাটিয়া না যায় ! ঐ যে নৌকায় উঠিল, নিরোধ সৈন্যগণ কি চাহিয়া দেখিতেছ ? নৌকাকে ছাড়িয়া দিতে কে বলিল ? এলাহাবাদে নৌকা যাইবে ?—বাইতে দিও না । অগ্রসর হও ! মুলতান-সময়ের শেষ পরিণাম ছোমাদের স্মরণ নাই ? ইংরাজ-অত্যাচার ভুলিয়াছ ? শত্রুর বংশ ধ্বংস করিবার সময়ে আবার মায়া দ্বারা কি ?”

অধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ, বীরের ন্যায় অগ্রসর হও ! বম্-বম্, বমা-বম্ বাজিয়া রণবাদ্য বলিল, আর বিলম্ব করিও না । ধর্ম নৌকা, একটীকেও রাখিও না । সমস্তকে অসি-আঘাতে নিপাত কর । সাবধান ! প্রধান সিংহদ্বরকে বধ করিও না ! নৌকা নদীজলে ডুবাও, নৌকা নদীজলে ডুবাও ।

“সহর নিষ্কণ্টক হয় নাই । সাহেবের বাড়ী বাড়ী অমুসন্ধান কর ! অখারোহীগণ ! নির্ভয়ে বাড়ী বাড়ীতে প্রবেশ কর । কাহাকেও রাখিও না ; সমূলে ধ্বংস কর, ইংরাজ-গৃহে গৃহে আগুন লাগাও । ক্রতবেগে সৈন্যগণ, ক্রতবেগে অগ্রসর হও । চিরদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার সময় এই, মূর্খ সৈন্যগণ ! কি দেখিতেছ, অগ্রসর হও !—কৃত্য, কাপুরুষ ! তোমার অসি এখনও রক্তে সিক্ত হয় নাই ? শীঘ্র যাও, ঐ যে একটা শ্বেত-ভল্লুক পলাইতেছে, যাও নির্ভয়ে, অসিকে রক্ত-সিক্ত কর । দেখিব, কে কতবার অসিকে রক্ত-সিক্ত করিতে পারে । তুমি একবার করিয়াছ, আচ্ছা তুমি কিছু পুরস্কার পাইবে ! তুমি ছইবার, তুমি তিনবার, তুমি দশবার, তোমরা উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে । তুমি শতবার, এই ক্ষুদ্র রাজ্য তোমার হইবে । যাও সৈন্যগণ, নির্ভয়ে যাও, যদি রাজ্য পাইবার আশা থাকে, তবে শতবার অসিকে রক্তে সিক্ত কর ।”

অধ্যক্ষ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে, সৈন্যগণ ! অস্ত্র রাখিয়া যাইওনা ! কি বিশ্বাস ? উন্নত-ফণা বিষম ভুঞ্জঙ্গিনীকে গৃহে দেখিরাও বিশ্বস্ত মনে বিশ্রাম করিও, কিন্তু অস্ত্রধারী ইংরাজ যে নগরে, কি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সে গ্রামে কি নগরে স্বাধীনভাবে বাস করিতে, কি বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষ থাকিলে, ইংরাজের শোণিত ভূতলে না পড়িলে আর বিশ্বাস করিও না । একনও স্থানান্তর হইতে ইংরাজ আসিতে পারে । যাও নির্ভয়ে, ইংরাজের প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ কর । লুট করিবার এই সময়, যাও, নির্ভয়ে লুট সংগ্রহ কর ।”

এই প্রকার উত্তেজিত উপদেশে ক্রমাগত তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বিদ্রোহ-নৈল প্রজ্জ্বলিত ছিল ; ইতিহাসে তাহার জাজ্জল্যমান বিবরণ রহিয়াছে ; আমরা এখন আমাদিগের আখ্যায়িকার অংশ গ্রহণ করিব । ৬ই জুন হইতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ এক দিনও নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকিতে পারে নাই ।

যখন সমস্ত সৈন্যগণ শ্রেণীভঙ্গ করিয়া লুটপাটে নিযুক্ত হইল, তখন শরৎচন্দ্র অশ্রুতে ক্রত চালাইয়া একটা সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ;

তখন বেলা অবসান-প্রায় । বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটী নিস্তরু, কোথাও লোক আছে, বোধ হইল না ; তিনি অশ্ব নিয়ে বাঁধিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন—“আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ? কানপুর নিক্ষেপক হইল, পূর্বে এ বাড়ীতে প্রবেশ করে, কাহার লাভ্য ছিল ? পূর্বে এ বাড়ী ইংরাজ-দর্পে ও অহঙ্কারে পূর্ণ ছিল, আজ একেবারে সে দর্প চূর্ণ হইল ! ছাদের উপরে এখনও ইংরাজের বিজয় নিশান একাধিপত্যের পরিচয় দিতেছে, যাই, অগ্রে ঐ নিশানকে পদতলে মর্দন করি ; উহাকে মর্দন করিতে না পারিলে আর সুখ কি ?” এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্তভাবে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন ; উপরে উঠিবার সময় একটা শব্দ হঠাৎ কর্ণে প্রবেশ করিল ; ছাদে উঠিয়াই দেখিলেন, তিনি যে দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে । আরো দেখিলেন, যেখানে তাঁহার অশ্ব আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, সে স্থানে অশ্ব নাই । একটু বিস্ময়াগ্রস্ত হইলেন । তৎক্ষণাৎ আবার ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না । স্থানান্তরে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অশ্ব একবার শব্দ করিল, তিনি অশ্বের নিকট যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন ; মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল, ভাবিলেন, ‘শত্রু গৃহে আমি একা ।’ ক্ষণকাল পরেই আবার নির্ভয়ে উপরে উঠিলেন : উঠিয়া যেখানে সেই বিজয় নিশান উড়িতেছিল, সেইখানেই যাইয়া দাঁড়াইলেন । ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার মন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; স্বীয় কোষ হইতে অসি নিক্ষেপিত করিয়া, বাম হস্তে নিশান-দণ্ডকে ধরিলেন । নিশান সে হস্তস্পর্শে কম্পিত হইল, তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—

“বিজয় নিশান ! আর কেন ? ছুরাচারী, পাগিষ্ঠ, ঘোরতর অত্যাচারী ইংরাজ রাজত্বের তুমি একাধিপত্য প্রচার করিতেছ ? আর কেন ? এখনই তোমাকে পদতলে মর্দন করিব ! আজ কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে ? এই আমি তোমাকে ধরিয়াছি, কে তোমাকে আমার হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে ? আর এক মুহূর্ত ! আর মুহূর্ত পরে তোমার স্থানে স্বদেশীয় নিশান উড়াইয়া মনের বাসনা মিটাইব,—আর মুহূর্ত পরে তোমার অস্তিত্ব ভূতে মিশাইব !”

পতাকা দর্পে কম্পিত হইল ! শরৎচন্দ্র স্বীয় অসি উত্তোলন করিবেন,

এমন সময়ে হঠাৎ অসিতে আঘাত লাগিল।—একি ! শরৎচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, চারিজন ইংরেজ রণ-সজ্জার সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র যাই কটাক্ষ করিলেন, অমনিই তাহারা চারিজনে গজ্জিয়া, ভীমনাদে বলিল, ‘অগ্রে যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত কর, তারপর বিজয়-নিশান নমিত করিও।’ এই বলিয়াই তাহারা ভীমরবে শরৎচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎচন্দ্র আর সময় পাইলেন না, বলিলেন, ‘তবে তাহাই হইবে।’ এই বলিয়াই স্বীয় নিকাশিত অসি বেগে সঞ্চালন করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অসি বিদ্যাত্বেগে বায়ুভেদ করিয়া শরৎচন্দ্রের বাসনা পূর্ণ করিল, সেই প্রথম সঞ্চালনে সম্মুখবর্তী ইংরাজ সহস্র স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দূরবর্তী ইংরাজ-ক্রয় দেখিয়া আশ্চর্যগণিত হইল; শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পরাজিত ইংরাজের হস্ত হইতে অসি বল-পূর্কক্ষ কাড়িয়া লইলেন; দুইহাতে দুইখানি অসি বিদ্যাত্বেগে ক্রীড়া করিতে লাগিল। মুখ ইংরেজ ! এ কামান নহে, এ ভারতবাসীর অস্ত্রচালনা। শরৎচন্দ্র ভীমনাদে বলিলেন, ‘এখনও অস্ত্র রাখিয়া বশ্যতা স্বীকার কর, নচেৎ আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংসার হইতে বিদায় দিব।’ ‘এদেশীয়ের নিকট ইংরাজ বশ্যতা স্বীকার করিবে ? শেষ রক্ত বিন্দু শরীরে নিশ্চল না হইলে নহে,’ এই বলিয়া ইংরাজ-পতঙ্গ বহুতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র অসিধ্বংস সঞ্চালন দ্বারা আবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন; যে মুহূর্ত্তে বিদ্যাত্বেগে উঠিল, তারপর মুহূর্ত্তে আর একটা মাত্র ইংরাজকে দেখা গেল। শরৎচন্দ্র এবার আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; অসির বেগ চতুর্থ ব্যক্তির প্রতি সঞ্চালন করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ে বিষম আঘাত লাগিল। পড়িতে পড়িতে তিনি হস্তস্থ অসি, চতুর্থ ব্যক্তির প্রতি সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। ভূতলে পড়িতে পড়িতেই, সেই ইংরাজও ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শরৎচন্দ্র পড়িয়া অচেতন হইলেন। শরৎচন্দ্রের পায়ের আঘাত গুরুতর, সহসা সেইখানে একটা লোক আসিয়া শরৎচন্দ্রের পায়ের কি ঔষধ লাগাইয়া দিল; তারপর তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া একটা কামরায় প্রবেশ করিয়া একটা রমণীকে বলিল, ‘কি ভাবিতেছ, ইহার শুক্রবা কর।’ স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কে কথা বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; সেই লোকটা মুহূর্ত্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সেইখানে রাখিয়া অদৃশ্য হইল। কে আসিল ? স্ত্রীলোকটি ভাবিলেন, যুবক-সৈন্যকে এই যুযু

দশায় কে রাখিরা গেল ? বেই হউক, সাহেবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি ; আর ভয় নাই ;—স্ত্রীলোকটা এই প্রকার ভাবিলেন । রাজি হই প্রহরের সময় শরৎচন্দ্রের একটু চেতনা হইল ; বেদনার শরীর অস্থির, শিপাসার কণ্ঠ শুক, শরৎচন্দ্র বলিলেন,—‘জল, জল’ । কিন্তু জল কোথায় । সেই স্ত্রীলোকটা আলোক লইয়া সকল ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও জল নাই । ছাদের উপরে যাইয়া ইংরাজদিগের মৃতদেহ দেখিলেন । কিন্তু জল পাইলেন না, সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াও জল মিলিল না ।

তাহার এক ঘণ্টার পর আর একটা স্ত্রীলোক একটা পাত্রে জল লইয়া মহলা সেইস্থানে উপস্থিত হইল, পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটা চিনিয়া বলিলেন, “তুই আনিয়াছিস, বেশ হইয়াছে, তুই কেমন করিয়া আনিলি ।” এই সময়ে শরৎচন্দ্র আবার বলিলেন—“জল” । এবার পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটা একটা পাত্রে জল লইয়া বলিলেন,—“জল আনিয়াছি, আমি যবনী নহি, পান করুন ।” স্ত্রীলোকটার পরিধেয় যবনীর জায় ছিল ; শরৎচন্দ্র কথা বুঝিলেন না, আবার বলিলেন, ‘জল’ । প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটা মুখে জল ঢালিয়া দিলেন । শরৎচন্দ্র একটু জলপান করিয়া নিস্তরু ভাবে পড়িয়া রহিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

রাজদণ্ড ।

ভাল হউক, মন্দ হউক, হতভাগিনী মালতীদেবী যে সন্তান প্রসব করিয়া রজনী বাবুর কলঙ্করাশি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই বিষ-অরূপ হৃৎপোষ্য বালকটা এক মাস যাইতে না যাইতেই স্বীয় অস্তিত্ব অনন্ত কাল-প্রবাহে মিশাইল । মালতীদেবী অটল মনে, দশ মাসের সঞ্চিত রক্তকে চিরজীবনের জন্য বিসর্জিত হইতে দেখিলেন, একটুও চক্ষের জল ফেলিলেন না । মালতীদেবী,—গণিহারী-কণিনী, কিন্তু মাসতীর মন অটল ; ভাবিলেন, এই ঘটনার যদি পবিত্র রজনী বাবুর কলঙ্ক রাশি ধোত হইয়া যায়, তবে ভাল । জীবনের একখানি অমূল্য রত্ন খসাইয়া, মালতীদেবী, রজনী বাবুর কলঙ্ক অপনয়নের আশায় উৎফুল্লচিত্ত হইলেন ; কিন্তু গরল-কৃদয় নরনারী এই ঘটনাকে আরো দোষের করিয়া তুলিল । এই ঘটনার

রজনী বাবু রাজদ্বারে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইলেন । মালতীদেবীর অল্পমতামুসারে মৃত পুত্রটাকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইল ।

এই ঘটনার পর গোবিন্দপুরে রাষ্ট্র হইল যে, রজনী বাবুর ঔরসজাত মালতী দাসীর জারজ সন্তানকে মারিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়াছে । রজনীকান্ত ঘোষের নিঃসন্তান মাতুলের মৃত্যুর পর, যখন তিনি গোবিন্দপুরে আসিয়া বিষয় দখল করেন ; তখন কয়েকটা সন্ন্যাস লোক একখানি দলিল জাল করিয়া, একটা বিষয় তাঁহাদের নামে পাট্টা আছে, এই প্রকার শাস্ত করে ; কিন্তু হরগোবিন্দ চক্রবর্তী অনেক দিনের পুরাতন লোক, তিনি সকলই মিথ্যা প্রমাণ কল্পিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করেন । সেই সময় হইতেই রজনী বাবু তাহাঙ্গিণের নয়নের শূলসম হইয়াছিলেন । এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার ছিদ্র আবেষণ করিয়াও হরগোবিন্দ চক্রবর্তীর বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে দস্তফুট করিতে পারে নাই । হরগোবিন্দ চক্রবর্তী জমীদারী কার্যে বিচক্ষণতার জন্য গোবিন্দপুরে বিখ্যাত । সিংহ বেমন ডশেদ্যা সুদৃঢ় লোহকাঁদে আবদ্ধ হইয়া, অন্তরে অন্তরে, গর্জন করে, গোবিন্দপুরের এই কয়েকটা সন্ন্যাস লোকও, হরগোবিন্দ চক্রবর্তীর চূর্বেদ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, সেই প্রকার, খামিয়া খামিয়া গর্জন করিতেছিল । এখন মালতীদেবীর সন্তান প্রসব এবং সেই সন্তানের অসাময়িক মৃত্যু, রজনী বাবুকে জ্বল করিবার তাঁহাদিগের একটা প্রধান অস্ত্র হইল । যে দিন গ্রামের সকলে জানিল যে, মালতী দাসীর জারজ সন্তানকে হত্যা করিয়া গোপনে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়াছে, সেই দিনই তাহার একত্রিত হইয়া পুলিশ কর্মচারীগণের নিকট মিথ্যা জনরব-সম্বলিত একখানি পত্র লিখিল । সাধক হঠাৎ এই সময়ে গোবিন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি আদ্যন্ত সকল ঘটনা শুনিয়া একটু চুঃখিত হইলেন । যাহা হউক, চেষ্টা করা তাঁহার একটা প্রধান মন্ত্র ছিল । তিনি গ্রামস্থ সকল লোকের মনের গতি ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন ; চেষ্টার কতক কৃতকার্য্যও হইলেন । কিন্তু মকন্দমা তখন গবর্ণমেণ্টের হাতে গিয়াছে । সাধক যে দিন আসিলেন ; তাহার পরদিন প্রত্যুষেই পুলিশ কর্মচারীগণ আসিয়া রজনী বাবুর বাটার চতুর্দিক বেঠন করিল । সন্ন্যাস ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে মিথ্যা পত্র লিখিয়াছিলেন, এখন অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে পুলিশ তাঁহাদিগকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিবে,

এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদিগের পত্নের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অমুসন্ধানে নির্দিষ্ট স্থানে মৃত সন্তানের দেহ পাওয়া গেল। মকদ্দমার সত্যতা বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না, কারণ গ্রামের সকলেই একমত হইয়া বলিল, মালতী দাসীর জারজ সন্তানকে রজনী বাবু হত্যা করিয়াছে। রজনী বাবুর পক্ষে কেবল ষাট হরগোবিন্দ চক্রবর্তী, বিষ্ণুবাসিনী এবং মালতীদেবী, তাঁহাদিগের কথা পুলিশ কর্মচারীগণ তাচ্ছিল্য করিয়া শুনিল না। পুলিশ কর্মচারীগণ কি কারণে যেন গ্রাম্য লোকদিগের দিকে গড়াইয়া পড়িল; তাহারা যতদূর পারিল, রিপোর্ট দিবার সময়ে প্রমাণ করিয়া দিল, ‘রজনীবাবু কর্তৃকই সন্তানের মৃত্যুক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।’ মৃতদেহ পরীক্ষার্থ, গোবিন্দপুর মে জেলার অধীন, সেই জেলার সরকারী ডাক্তারের নিকট প্রেরিত হইল। ডাক্তার শরীর পরীক্ষা করিয়া লিখিলেন যে, সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হইল না। ছই সপ্তাহ কাল পরে এই মকদ্দমা মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মচারীগণ, তাহাদিগের মত পোষণার্থ কিছুই বলিল না, গোবিন্দপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি পরাস্ত হটল; কিন্তু সন্তানের মৃত্যুর পর ঐ ঘটনা গোপন করিবার জন্য তাহাকে মৃতিকায় পুতিয়া রাখা হয়; এ কথার বিরুদ্ধে মাজিস্ট্রেট সাহেব রজনীবাবুর প্রমাণ গ্রহণ করিলেন না। বিচারকগণের চিরপ্রসিদ্ধ রোগের বশবর্তী হইয়া, মাজিস্ট্রেট সাহেব রজনীবাবুর ৬ মাস কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানার আদেশ করিলেন। যখন রজনীবাবুর কারাবাসের আজ্ঞা হইল, তখন মালতীদেবী শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।

রজনীবাবুকে যখন কারাগারে লইয়া যায়, তখন তিনি হরগোবিন্দ চক্রবর্তীকে বলিলেন, ‘আমার বাহা হইল, তাহার আর কি হবে, শীঘ্রই হাইকোর্টে আপিল করিও। মালতীদেবীর জন্য আমার এই কষ্ট উপস্থিত, ইহা তাঁহার হৃদয়ে শেলয়রূপ বিদ্ধ হইয়াছে; তাঁহার শোকবিন্দু আবার উথলিয়া উঠিবে; তুমি তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে, যত শীঘ্র পার, পাঠাইয়া দিও; তারপর আমি যখন মুক্ত হইব, তখন আবার বাহা হয় করিব। আর বিষ্ণুবাসিনীকে সাধকের সহিত বাইতে দিও। মালতীদেবী, বিষ্ণুবাসিনী এবং সাধককে আর একবার আনার নিকটে লইয়া

আইস।” ঋণকাল পরে তাঁহার তিন জনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালতীদেবীর আকৃতি ক্ষীণ, মলিন,—মুখে কথা নাই, নয়নে জ্যোতি নাই, শরীরে ক্ষুণ্ণ নাই, দেখিলেই বোধ হয় যেন মনোমধ্যে কোন দুঃসহ কষ্ট হইতেছে, বোধ হয় যেন দারুণ কষ্টে প্রাণ অস্থির হইতেছে! মালতী দেবী কথা বলিলেন না, কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। বিদ্যাবাসিনী অনিমেঘ নয়নে রজনী বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টিতে কোমলতা ও পরদুঃখ-কাতরতার জলন্ত ভাব জলিতেছিল। সে দৃষ্টিতে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোমোহন ভাব জলিতেছিল। বিদ্যাবাসিনী আশ্তে আশ্তে বলিলেন, “আপনি আমাদের জন্ত যে কষ্ট সহ করেছেন, এ জন্মে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, সে আশা নাই; তবে ইচ্ছা এই,—বতদিন বাঁচিব, ততদিন আপনাকে মনে রাখিব, আপনি আমাদিগকে ভুলিবেন না।”—বিদ্যাবাসিনীর নয়ন হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাধক স্থিরভাবে বলিলেন—“রজনী, যাও, অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে দগ্ধ হও গিয়া; কীদিলে কি হইবে?”

রজনী বাবু বলিলেন—পিতা! আমি যখন বালক ছিলাম, তখন হইতে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত,—যে দিন পথহারা হইয়া সেই সাগর-সন্নিহিত অরণ্য-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীর মধ্যে আপনাকে দেখিলাম, সেই দিনই আমার ইচ্ছা হইল, আপনাকে ‘পিতা’ বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু আপনি কি ভাবিবেন, এই আশঙ্কায় তখন মনের বেগ সম্বরণ করিলাম। আপনার সহিত আবারও দেখা হইল, কিন্তু মনের সাধে এবারেও আপনার চরণ পূজা করিতে পারিলাম না; যাহাই হউক, আপনার নিকট আমার প্রার্থনা—সময় মতে আবার যেন আপনার দর্শন পাই।

সাধক বলিলেন—রজনী! কেন আক্ষেপ কর। সকল অবস্থায় যে মনের শান্তি রাখিতে না পারে, সে বালক; যখন যে অবস্থায় থাক, তাহাকেই স্নেহের বলিয়া জানিও। আমি এখন বিদ্যাবাসিনীকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইব; উপযুক্ত সময় হইলে আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে; স্নেহ ও দুঃখে বাঁহাদের মন সমভাবে থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য। তবে কেন বৃথা অস্থির হও?

রজনী বাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন; সাধক হস্তোত্তোলন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন।

রজনী বাবু মালতীদেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেবি, মনে হুঃখ রাখিবেন না ; আমি স্নায়ু কক্ষার্জিত পাপের ফলভোগ করিতে চলিলাম ; আপনার দোষে নহে । আপনি অথবা মনকে কষ্ট দিবেন না । মুক্ত হইলে আপনার শ্রীচরণ আবার দর্শন করিব । হরগোবিন্দ চক্রবর্তীকে বলিয়া দিয়াছি, তিনি সম্প্রতি আপনাকে আপনার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন । আমি নিশ্চয় বৃদ্ধিতেছি, হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পাইব, তখন আবার আপনাকে দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব ।

মালতীদেবী নীরবে রহিলেন । রজনী বাবু বিদ্যাবাসিনীর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, ‘বিন্দু ! পিতার সহিত যাও । তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইলে, আবার আমাকে স্মরণ করিও ।’

বিদ্যাবাসিনী নীরবে রজনী বাবুর চরণে প্রণাম করিলেন ।

পেয়াদারা আসিয়া বিলম্বের জন্ত কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিল । রজনী বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—‘চল, যাইতেছি ।’ রজনী বাবুর বন্ধ-হস্ত ধরিয়া পেয়াদারা লইয়া চলিল । বিদ্যাবাসিনী একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, মালতীদেবী ছিন্ন-বৃক্ষের শ্ময় সহসা ভূতলশায়িনী হইলেন ।

সাধক নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরগোবিন্দকে ডাকিতে গেলেন ।

হরগোবিন্দ চক্রবর্তী মালতীদেবীকে লইয়া, তাঁহার পিত্রালয়ভিমুখে রওনা হইয়া গেলে পর, সাধক বিদ্যাবাসিনীকে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, “মা ! তবে তুমি এখন কি করিবে, বল ?”

বিদ্যাবাসিনী।—কি করিব ?—আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও সেই খানেই যাইব ।

সাধক।—তোমার শরৎচন্দ্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে ত ? না, তাঁহার অব্যেগে যাইবে ?

বিদ্যাবাসিনী।—আশা পরিত্যাগ করিতে হয় কি প্রকারে, আমি জানি না । আমিই নয় আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আশা আমাকে ছাড়িবে কেন ? শরৎচন্দ্রের আশাকে বুকে বাঁধিয়াই আজও জীবিতা আছি ; নচেৎ আপনার পবিত্র চরণ আর দর্শন করিতাম না ।

সাধক।—মা ! এখানি কি জান ?

বিদ্যাবাসিনী।—সাধন-সঙ্গীত ।

সাধক।—পড়িয়া দেখ । তুমি ত গাইতে জান, একটা গান গাও ত ?

বিক্র্যবাসিনী ।—আমি কি গাইতে জানি ? তবে আমার স্বর মিষ্ট, এই পর্য্যন্ত ; আপনি গান করুন, আমি শুনি ।

সাধক একটা সঙ্গীত গাইলেন । গীত সমাপ্ত হইলে সাধক বলিলেন, মা ! শুনিলে ?

বিক্র্যবাসিনী ।—শুনলাম ; কিন্তু এখনও ইহার ভাব বুঝি নাই ; এখনও বুঝিবার উপযুক্ত সময় হয় নাই ।

সাধক ।—মা, তুমি শরৎচন্দ্রের চিন্তায় কেন মনকে কষ্ট দিতেছ ?

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, পিতা, শরৎচন্দ্রকে মনে ভাবি কেন ? তা আমি জানি না । কি বলিব ? আপনি কি না বুঝেন ? সমস্ত সংসারে আরো কত ভালবাসার পদার্থ রহিয়াছে, তা কি আমি জানি না ? কিন্তু মন তা আর কিছুই চায় না । শরতের মুখের সেই হাসি,—কেমনে বলিব, কেন সেই হাসি দেখিবার জন্ত এ নয়ন অনিমেবে চাহিয়া থাকে । আর কি হাসি নাই ? আর কি ফুল ফুটে না ? কিন্তু অজ্ঞ হাসিতে, অজ্ঞ ফুলে তা আমার মন আকৃষ্ট হয় না । পিতা ! আমাকে ক্ষমা করুন । আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না ।

সাধক ।—তবে চল ; আর তোমার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব না । মনে মনে ভাবিলেন, সময় হইলে অবশ্যই মন ফিরিয়া আসিবে ।

বিক্র্যবাসিনীকে লইয়া সাধক প্রথমতঃ কলিকাতায় গেলেন, সেখান হইতে সত্যভামাকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন । এক বৎসর পর্য্যন্ত কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, প্রয়াগ, অযোধ্যা, আগ্রা, পাটনা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও শরৎচন্দ্রের খোঁজ পাইলেন না ।

যে দেশে যে প্রকার বেশ ভূষা প্রচলিত, তাঁহারিও সেই দেশে সেই প্রকার বেশ ভূষা করিতেন । সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে কানপুরে অবস্থিতি করেন । কানপুরে অবস্থানকালীন তাঁহারি হিন্দুর বেশ পরিত্যাগ করিয়া ধ্বনের স্তায় বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ।

যখন কানপুরের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহার দুই দিবস পূর্বে বিক্র্যবাসিনী এবং সত্যভামাকে রাখিয়া, সাধক এক পক্ষের জন্য স্থানান্তরে লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন ।

চতুর্থ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনতোষণী ।

সেই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র গুরুতর আঘাতে ক্লান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। আহত-স্থান চিকিৎসার অভাবে দিন দিন ভয়ানক রূপ ধারণ করিতে লাগিল ; ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, কে চিকিৎসা করিয়া শরৎচন্দ্রকে আরোগ্য করিবে ? তাঁহার মনোহর রূপের উজ্জলতা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল ; বল, উৎসাহ, সাহস, মানসিক শক্তি এবং বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিল ; জীবনের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-শয্যা শয়ন করিলেন।

সেই যুবতী অহোরাত্র, একাগ্রমনে, যত্নসহকারে, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, উপকারী রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। শরৎচন্দ্রের মন অবিচলিত, এক মুহূর্তের জ্ঞত্রও চঞ্চল হয় নাই ; তিনি স্বয়ং দৈর্ঘ্য ধরিয়া সকল প্রকার কষ্ট সহ করিতে লাগিলেন। দিন বসিয়া থাকিল না। সেই শত্রুরক্ত-প্রাবিত, আশান-সদৃশ কানপুরের শূত্র পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র মৃত্যু-শয্যা শয়ান, সম্মুখে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যাহার মুখপানে তাকাইলে যন্ত্রণার উপশম হয় ; কিন্তু তত্রাচ সময়ের অবিশ্রাস্ত গতি ফিরিল না।

রোগের সময় রোগীর দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনকে মনে পড়ে ; শরৎচন্দ্রের মনে কি এই সময়ে বাড়ীর কথা উঠে নাই ? চঞ্চল মনুষ্য-জীবনে এই প্রকার দৈর্ঘ্য আজ পর্য্যন্তও আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। শরৎচন্দ্রের মন অস্থির হইল, বাক্য বন্ধ হইল। সেই যুবতী কথা বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, শরৎচন্দ্র কথা বলিতেন না।

এই প্রকারে তিন দিবস অতীত হইল, চতুর্থ দিনে জ্বীলোকটা পায়ের ধারে বসিয়া শরৎচন্দ্রের কৃত স্থানে প্রলেপ দিতেছিলেন ; শরৎচন্দ্র কাতর-

স্বপ্নে বলিলেন—‘আপনি ক্ষত স্থানে কি দিতেছেন ? আমার আর বাঁচি-
বার আশা নাই । আমি আপনার ঋণে চিরকালের জন্ত আবদ্ধ হইলাম ।’

যুবতী । ‘আপনি এত অস্থির হইবেন না ; ক্ষত স্থান দিন দিন পূর্ণ হইতেছে ;
ঔষধটি আমি অল্প বয়সে শিখেছিলাম ; ঈশ্বর করেন ত ইহাতেই আপনি রক্ষা
পাইবেন ।’ শরৎচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ; সংসারের মায়া আসিয়া মনকে
ভুলাইল, বলিলেন, ‘আপনি কে ? আপনি এত যত্নসহকারে আমার সেবা
করিতেছেন কেন ? আমাকে ঋণে আবদ্ধ করিতেছেন কেন ?’

পরহুঃখ-কাতর জ্বীলোকটি বলিলেন, ‘আপনি রোগী, মনের উদ্বেগ
বৃদ্ধি হইলে অনেক কষ্ট পাইবেন । আপনার পায়ের আঘাত আরোগ্য
হইলে, সকল কথা বলিব । আপনার হাতে আমার জীবন পাইয়াছি, তাই
আপনার সেবা করিতেছি ।’

শরৎচন্দ্র আর কিছুই বলিলেন না, বেদনায় আবার শরীর অস্থির হইল,
মুহূর্ত্ত মগের স্ত্রায় বোধ হইতে লাগিল, দণ্ড দিনে পরিণত হইতে লাগিল ;
শরৎচন্দ্র অচেতন হইলেন, চক্ষু নিম্নীলিত হইল ।

রমণীর কোমল হৃদয়, গলিয়া গেল । ব্যগ্রতা সহকারে মস্তকে জল
সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে বাতাস দিতে লাগিলেন । শরৎ-
চন্দ্রের সর্বশরীর উষ্ণবোধ হইতে লাগিল । এ কি জ্বর ? কে বলিবে ।
জ্বীলোকটি মনে মনে ভাবিলেন, জ্বর হইয়াছে । রমণী-প্রাণ হুর্ভাবনার মন্দির,
সেই মন্দিরে কত হুর্ভাবনা আসিয়া স্তান নিতে লাগিল ! ‘এবার আর রক্ষা
নাই’ এ কথা রমণীর হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইতে লাগিল । চক্ষু হইতে বিন্দু
বিন্দু জল নির্গত হইতে আরম্ভ হইল । পূর্ব দিন শরৎচন্দ্রের শরীরের যুদ্ধের
বেশ খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ মনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই বেশই মৃত্যুর
সহায় !’ নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল ।

অমুরোগের চিহ্ন বল, ক্ষতি নাই, কিন্তু কখনও যদি রোগী হইয়া মৃত্যু-
শয্যায় শুইয়া থাক, আর কখনও যদি এই প্রকার একটা যুবতীকে শয্যার
পার্শ্বে দেখিয়া ভুলিয়া থাক, তবে তোমরা রমণীর মন আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে
পার নাই । পর-হুঃখে যে মন গলিয়া যায়, সে রমণীর মন, তোমরা
ইহাকে না বুঝিয়া অমুরোগের চিহ্ন বলিতে চাও, বল । কিন্তু এক মুহূর্ত্ত
পরে যাহার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার প্রক্তি মন ধাবিত হয় কাহার ? অনেক সময়ে
পূর্ব-স্মৃতি-আশায় মৃত ব্যক্তিকেও আবার সজীব করিয়া, লোকেরা দেখিতে

চার । রমণীর পূর্ব-স্মৃতি ! মধু-স্মৃতি-মাখা সেই হাত, সেই মুখ, সেই জুয়ুগল, সেই ওষ্ঠ, সেই নাসিকা ; স্মৃতির হাত এড়াইয়া সময়ের পরাক্রম এ সকলকে লুকাইতে সমর্থ হয় নাই, বীর পুরুষের ত্রায় শরৎচন্দ্র পড়িয়া আছেন,—মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে,—শরীর ক্ষীণ, আকৃতি ও বর্ণ ম্লান হইয়াছে, কিন্তু তবুও স্মৃতির হাত ছাড়া হয় নাই । স্মৃতি বলিয়া দেয়, এই সেই !!

সমস্ত দিবসের মধ্যে আর শরৎচন্দ্রের চেতনা হইল না, অল্প বেলা থাকিতে বারম্বার মুখ ব্যাদান করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটা বুঝিয়া মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলেন । পূর্বাপেক্ষা শরৎচন্দ্র একটু সুস্থির হইলেন, স্নানার্থে বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন ;—

‘মানুষের কি স্মৃতি ! ভ্রমবশত লোকে বলে, সংসারে স্মৃতি আছে । আহা ! আমি মরিতে বসিয়াছি, আমার মনে যে প্রকার স্মৃতি হইতেছে, এ প্রকার স্মৃতি পৃথিবীতে কোথায় ? আমি কি পৃথিবী ছাড়িয়া আসিয়াছি ? আমার শরীর কি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ?’ শরৎচন্দ্র নিম্নলিখিত-নেত্র, বাহুজ্ঞান-শূন্য, আবার বলিতে লাগিলেন,—‘এইত এক রাজ্যে উপনীত হইলাম ; এস্থানের সকলেই আনন্দে নিমগ্ন । কোথায়ও নিরানন্দ দেখি না, যেন চিরকালের মত দুঃখ-রাজ্য হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি ! সংসারের কোলাহল কোথায় ? প্রবল-পবনহস্ত মহীকুহচয়ের সে ভীষণ নির্দোষ,—জীমূতবৃন্দের সে ভয়ানক গর্জন কোথায় ? সংসারের দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, শঠতা, ধূর্ততা অল্পে অল্পে কোথায় চলিয়া গেল ? চির আনন্দ-প্রবাহ, চিরকাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত, নৈরাশ্রের পরাক্রম এখানে নাই । এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? না সত্য সত্যই আমি এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি ? সংসারের পাপ, প্রলোভন ত এখানে মন ভুগায় না ; পুণ্যের বিমল জ্যোতি সর্বত্র বিস্তৃত, এ মধুর জ্যোতি, রাত্রি আগমনেও, তিরোহিত হয় না, রাত্রির আধিপত্য এস্থল হইতে অনেক দূরে । যাহা দেখিতেছি, সকলই যেন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, অবনতির দিকে কাহারও মন নাই । সময়ের গতি এখানে নাই, চন্দ্র সূর্য্য এখানকার দিন রাত্রি বিভিন্ন করে না ; কত আনন্দ, কত স্মৃতি-প্রবাহ,—বিবাদ, গল্পনা, শক্রতা—রিপুদিগের পরাক্রম এখানে নাই ; জ্ঞান কি আমাকে এই রাজ্যের স্মৃতি ভোগ করিতে দিলেন ?’

‘তোমার জ্ঞান পুণ্যবান লোকের জ্ঞানই এই রাজ্য ।’ হঠাৎ যেন এই কথা শুনিলেন ।

‘কে বলিল একথা ? কত আত্মা আমার নিকটে উৎসুকচিত্তে আসিতেছে, ইহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, আমাকে কোন কথা বলিবে, কিন্তু নিকটে আসিয়া অঙ্গিয়া ফিরিয়া যাইতেছে । ইহারাই কি বলিল, ‘তোমার জ্ঞান লোকের জ্ঞানই এই রাজ্য ?’ বুঝিতে পারি না । আমি শরীর হইতে পৃথক হই নাই । শুনিয়াছি, শরীরে পরলোকে প্রবেশ করা যায় না, তবে আমি অপৃথক অবস্থায় কি প্রকারে এসব দেখিতেছি ?’

‘মন ! ভাবিও না,—আজ সময় না হইয়া থাকিলেও অবশ্যই এদিন আবার আসিবে,—যখন সংসার ছাড়িয়া এই স্থানের সুখ সম্ভোগ করিবে । এখানে পার্থিব কিছুই নাই, পাপ নাই, অশান্তি নাই, কেবল চির পুণ্য-জ্যোতি বিস্তৃত । পাপ শরীরের, পুণ্য আত্মার ; পাপ, শরীরের ইন্দ্রিয়গণের বিপর্যয়ের ফল ; পুণ্য, আত্মার উৎকৃষ্ট সঞ্চিত ধন—মনের আদর্শ—অলঙ্কার ; তাই এখানে পাপ নাই । আত্মার আত্মা চিনিতে পারে, মনে মন চিনিতে পারে, তাই এখানে সকলেই সকলের সহিত কথা বলিয়া আত্মা প্রকাশ করিতেছে । আমাকে কেহই চিনিতে পারিতেছে না । তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ।’

‘আহা ! অপূর্ণ শোভা দেখিয়া তাপিত হৃদয় শীতল হইল । তাপিত হৃদয়—এত দিন যেন দগ্ধ হইতেছিল । উঃ আমি কি নির্ভর—অন্যাসে কত শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করেছি, মনে একটুও দুঃখ হয় নাই । কিসের জ্ঞান করেছি ? দেশ-উদ্ধারের জ্ঞান । হৃদয়-অগ্নি নির্বাণ করিবার জ্ঞান, এতদিন পরে যেন সেই কার্যের পুরস্কার পাইলাম ; হৃদয় শীতল হইল । হৃদয় মন পড়িয়া অঙ্গার হয়, হটুক, সে জ্ঞান তত দুঃখিত নহি, অন্তিম যেন এই সুখ হইতে বঞ্চিত না হই । জগদীশ ! আমি এই সুখ হইতে যেন বঞ্চিত না হই ।’

‘স্বদেশের জ্ঞান তোমার ন্যায় যাহাদের মন ব্যাকুল, তাহাদের জন্যই এই স্থান ।’ আবার যেন এই কথা শুনিলেন ।

‘আবার কে কথা বলিল ? চতুর্দিক নিস্তর, ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মানবের স্বর কি এতদূর আসিতে পারে ? তবে কোন্ স্থান হইতে শব্দ আসিতেছে ? না—আমি স্বপ্ন দেখিতেছি । একটু স্থির হই ।’

ক্ষণকাল পরে শরৎচন্দ্র চক্ষু-উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে মলিন সেই বেশে যুবতী তাঁহার গুঞ্জন করিতেছেন, দেখিয়া বলিলেন ;—

“দেবি ! আপনার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীতলাভ করিয়াছি, মানবীর পক্ষে এতাদৃশ নিঃস্বার্থ পরোপকার-সাধন অসম্ভব, আপনি কি স্বর্গীয় দেবকন্না?”

যুবতী । আপনার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনি অগাদিতে মনকে ফিরাইবেন না, আরোগ্য হইলে আমার পরিচয় পাইবেন ।

শরৎচন্দ্রের আবার যাতনা বৃদ্ধি হইল, মুচুর্ভুত শ্বাস বহিতে লাগিল, অতি কষ্টে বলিতে লাগিলেন—“উঃ আর সহ হয় না । এই দূরদেশে আমার সমদ্রুতী আর কেহই নাই । এ সংসারে আমার আপন জনই বা কে ? আমি বন্ধু-শুভ্র—আত্মীয়-শুভ্র—আমি জগতে একা । এই সংসার-সাগরের আমিই যেন একমাত্র ক্ষুদ্রতম বুদ্ধুদ ; হায়, আমার আর কেহই নাই । উঃ প্রাণ যায় । আর সহ হয় না । গলা শুষ্ক হয়ে গেল ;—জল—ল—ল !”

যুবতী পাত্র হইতে একটু জল মুখে ঢালিয়া দিলেন । শরৎচন্দ্র আবার হিজি, বিজি, বাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই বলিতে লাগিলেন ;—

“আমি এখানে কেন ? আমি সংসারের কীট—উড়িব, খেলিব, কোন ভয় নাই ; এখানে আমাকে কে আবদ্ধ করিল ? আমি এখনই চলিয়া যাই” এই বলিয়াই শরৎচন্দ্র উঠিতে চেষ্টা করিলেন, যুবতী হস্ত দ্বারা বেগ নিবারণ করিয়া ভাবিলেন—“একি বিকারের লক্ষণ ?”

শরৎচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন, “আরো কষ্ট—আরো কষ্ট, উঃ প্রাণ যায় । আমি এই ভব-সাগরের জল-বুদ্ধুদ, জলে মিশিতে বসিয়াছি । আমি সংসারের পতঙ্গ, পুড়িয়া মরিতে বসিয়াছি, ঠেহাতে আবার স্বার্থ আছে । আমি যে প্রকারে মরিতে বসিয়াছি, এ প্রকারে কয় জন মরিতে পারে ? এ প্রকার মৃত্যুতেও আমার কষ্ট হয় কেন ? জন্ম কিসের জন্ম ? মৃত্যুর জন্ম ? স্বদেশের হিতের জন্ম । তবে মরিব, তাহাতে ক্ষোভ কষ্ট কি ?”

“মন চঞ্চল হ’ল কেন ? উঃ এই আবার প্রাণ যায়—এই আবার বেদনা । মৃত্যু, আর বিলম্ব কেন, এখনই আমাকে লও ।”

শরৎচন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, অক্ষুট স্বরে আবার বলিলেন ;—“আমি মরিব”—আর বাক্য দুটল না, চক্ হইতে জল ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল । মনোকষ্টের সহিত আবার আহত-স্থানের বেদনা বৃদ্ধি হইল, ধক্ ধক্ করিয়া জ্বগিতে লাগিল ।

স্ত্রীলোকটা সে কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । প্রলেপ-পাত্র হইতে শীতল প্রলেপ লইয়া আশ্তে আশ্তে মালিস করিতে লাগিলেন ;

অনেকক্ষণ পরে বেদনা আবার একটু থামিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—“বেলা কতক্ষণ হইয়াছে ?”

যুবতী । ‘আপনার ভ্রম হয়েছে, এখন রাত্রি প্রায় ১১০ প্রহর হইয়াছে, আপনি একটু নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করুন ।’

শরৎচন্দ্র অগ্নিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন ।

কতকক্ষণ পর আবার চক্ষু নিম্নীলিত হইল, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সংজ্ঞা চলিয়া গেল; জ্বীলোকটা বলিলেন, ‘আপনার কেমন বোধ হইতেছে ?’

শরৎচন্দ্র উত্তর করিলেন না । জ্বীলোকটা বসিয়া কতই কি ভাবিতে লাগিলেন । ভাবিতে লাগিলেন,—‘যুবকের হাত, মুখ, নাসিকা, ওষ্ঠাধর, ঈষৎ ক্ষীত ললাট, সেই ললাটে ঘর্ম্ম—প্রশস্ত বক্ষস্থল ; পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন ; দেখিয়া একবার আশা হইল, আবার ক্ষণকাল মধ্যেই সে আশা চলিয়া গেল—এ দূরদেশ, এখানে পূর্ব্বস্মৃতির সাদৃশ্য অসম্ভব ।’ আবার ভাবিতে লাগিলেন, যুবককে এত করিয়াও বাঁচাইতে পারিলাম না, মনে এই দুঃখ রহিল, একবার পরিচয় পাইয়াও যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে না হয় আজই এ জন্মের স্মৃথের আশা বিসর্জন দিতাম । জ্বীলোকটা কঁাদিতে কঁাদিতে ভাবিতে লাগিলেন ; ‘আমার পরিচয় দিলাম না কেন ?’ এই কথাটা মনে পড়িয়া তাঁহার আরো কষ্ট হইতে লাগিল । ‘আর দেখিব না ! এইবারই সৈনিকের প্রাণ বাহির হইয়াছে,—যুবতী এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন । রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, কয়েকটা পাখী কর্কশস্বরে ডাকিয়া নীরব হইল, জ্বীলোকটা মৃতদেহ কল্পনায় শরৎচন্দ্রের নিকট বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

ক্রমে ক্রমে রজনী তিল তিল করিয়া অবসান হইয়া আসিল ; শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, শরৎচন্দ্রের আবার চেতনা হইল ; রাত্রি পোহাইল, পরিষ্কার আকাশে ক্রমে ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলী অদৃশ্য হইতে লাগিল, জ্বীলোকটার হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল ; মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চারিত হইল, মুহূর্ত্তের জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কেমন বোধ হইতেছে ?” শরৎচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে চাহিয়া রহিলেন, উত্তর করিলেন না । মনের মধ্যে কতকগুলি বিষয় আন্দোলিত হইতেছিল, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? জ্বীলোকটা নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আশার ছলনা ।

বালুকাময় প্রান্তর, এক সীমা হইতে সীমান্তর দৃষ্টির অতীত ; আকাশে মেঘ নাই, জলের আশা নাই ; সূর্যের প্রথর তাপে বালুকণা অগ্নি সদৃশ, বৃষ্ণাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, জলাশয় শূন্য, পশু চরে না, পক্ষী উড়ে না, পবন ভীষণ বেগে উত্তপ্ত বালুকণা বক্ষে করিয়া সোঁ সোঁ রবে বহিতেছে । দিক্-শূন্য পথহারা পথিক ! তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে ? মৃত্যুকে নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া ভয় পাইতেছ ? নীরবে মনে প্রবেশ কর, দেখিবে, কে যেন মুহু মধুর স্বরে বলিয়া দিতেছে—ঐ জলাশয়—ঐ—জলাশয় । যাও দৌড়িয়া,—উত্তাপের ভয় করিও না, পা পুড়িয়া অঙ্গার হইতেছে, তাহা চাহিয়া দেখিও না, দৌড়িয়া যাও । কি আশ্চর্য্য ! কোথায় জলাশয় ? বাহা দেখা গিয়াছিল, তাহা ভ্রম, ঐ জলাশয় । আবার যাও ; ভুলিও না, যাও দ্রুত । এবারেও প্রতারণা । আশা পরাস্ত হইল, মৃগ-তৃষ্ণিকায় লোকের মন তৃতীয় বারে আর ভুলিলনা, জলাভাবে সেই পথিকের কৃন্দ শরীর অনন্ত বালুকণার পরমাণুতে মিশাইয়া গেল । ভাষণ মকভূমে শুষ্ক-কণ্ঠ পথিকের মনে যে আশা, মৃগতৃষ্ণিকার স্বপ্ন দেখাইয়া, দূরবর্তী মৃত্যুকে নিকটে আনয়ন করত, অসময়ে তাহার জীবন নাশের কারণ হইল, উহাই আশার ছলনা । যে আশার হাত এড়াইয়া মানব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, সময়ে সেই আশাই জীবন-নাশের অবশ্যস্তাবী কারণ হইয়া পড়ে ; এই আশাকে আমরা আশার-ছলনা বলি ।

' আশা সৃষ্টির গোপন মন্ত্র, ইহা আপনা আপনিই আদিয়া মানব-মনে আধিপত্য স্থাপন করে । এই আশাকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি আজও আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত হইয়া সময়ের আবর্তনে আবর্তনে ' মাস, বৎসর, শতাব্দী অতিবাহিত করিতেছে । সংসার চঃখময়,—এই চঃখ-ময় সংসার-সাগরের-আশাই একমাত্র কাণ্ডারী । ইহার আধিপত্যে বিষাদিত মনেও হর্ষ-পবন বয়, আনন্দ-লহরী নৃত্য করে, চঃখ-তরঙ্গ স্ফংহারী সূখ-

শরৎের দ্বারা পরাজিত হইয়া সংসারকে আনন্দের বলিয়া পরিচয় দেয় । এই আশা না থাকিলে, নৈরাশ-সাগরে সকলের প্রাণ ডুবিতে, চিরকালের জন্য আনন্দ-প্রবাহ পৃথিবী হইতে অবসর লইতে ।

যে বস্তুর বৈপরীত্য আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর অতীত, তাহার আদর জন-সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প । ধনী, অর্থ রাশির মধ্যে বসিয়াও, নির্ধন সহসা মন পাইলে যে আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দ প্রাপ্ত হন না, কারণ তাহার বৈপরীত্য তাঁহার শিক্ষা হয় নাই । ছুঃখীই জানে, ছুঃখের পর সুখ কত সুখদায়ক, চিরসুখী জন কখনও সে সুখ পায় না । নৈরাশের পর যখন আশা, অলঙ্কিত ভাবে, মৃদু মৃদু-বরষা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন সে আশার বস্তুর কত প্রীতিকর ! আশার স্থানে আশা তত সুখপ্রদ নহে, নৈরাশের পর আশা যত সুখের ; নৈরাশের পর আশা যেমন বিমল আনন্দদায়িনী, আশার পর নৈরাশ তেমনি ছুঃখদায়ক, জীবন-সংহারক । আশার পর নৈরাশ আসিলেই মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, মরুভূমে নিপতিত শুষ্ককণ্ঠ পথিকের তায় মনের সহিত অঙ্গের বাধনি ছিঁড়িয়া পড়ে, জীবন-ভার কষ্টদায়ক বোধ হয় । আমরা সৃষ্টির এই মন্ত্রকে আশার ছলনা বলি । আশার ছলনা বড় বিপজ্জনক ও অহিতকর ; যে লোক ইহার আধিপত্যে মস্তক নত করিয়াছে, তাহার মত নিস্তেজ, উৎসাহশূন্য জীবন সংসারে আর দৃষ্ট হয় না ।

এ সকল কথাই কেন সূত্রপাত হইতেছে ? বাগানে ফুল ফুটে, তোমরা তুলিয়া লইয়া আনন্দে হউক, নিরানন্দে হউক, একবার তাহার গন্ধ লইয়া থাক । কিন্তু পাঠক, কোন্ ফুলে কীট বাস করে, কোন্ ফুলে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, তাহা না জানিয়া, আশার ছলনায় জড়িত হইয়া, সকল সুন্দর পুষ্পকে তুলিয়া একেবারে নাসিকার নিকটে ধরিতেছ ? ঐ দেখ, নাসারকু, দিম্বা কি. যেন সম্মুখবর্তী গর্ভে চলিয়া গেল । কষ্ট পাইল কে বল দেখি ? কষ্ট কে পাইতেছে, বল দেখি ? গোলাপ, মল্লিকা, যুতি, জাতি, চাঁপা, সেফালিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; তোল, নিঃসন্দেহচিত্তে ইহাদিগকে নাসিকায় ধর, নিঃসন্দেহ ভ্রাণে বিমল আনন্দ পাইবে । আর এই যে অপরিচিত একটা ফুল মলিন ভাবে মৃদু মৃদু ফুটিতেছে, সাবধান, অগ্রে ইহার গুণ জান, তার পর তুলিও ; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পথিকের ন্যায় বাসনা পূর্ণ করিতে যাইও না ; কে জানে, ইহার ভ্রাণেও তোমরা সুখী হইবে ? হইতে পারে, এক জন ভাল গন্ধ পাইয়াছে, কিন্তু বিশ্বাস করিও না ; এক জনের

কথার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিও না । নিজ জীবনে প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে ; বিশ্বাস কর, নিশ্চয় আশার ছলনায় জড়িত হইবে । এই দেখ, একটা নূতন ফুল ফুটিল,—আমরা আশার ছলনায় জড়িত হইয়া ইহার সুব্রাণ পাইতেছি, আর অগ্রসর হইতেছি, আবার ফুল তুলিতেছি, তোমরা ইহার গন্ধ পাওনা, আসিও না ; মতক্ষণ নিঃসন্দেহ রূপে ইহার সুব্রাণ নিশ্চিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুলিয়া নাগিকার ধরিও না !

আমারা ত আশার ছলনায় জড়িত হইয়া ফুল তুলিয়া মালা সাজাইতেছি, কিন্তু বাহারা ইহাকে গলায় পরিবেন, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত । সংসার প্রেলোভন-পূর্ণ । প্রেলোভন সকল প্রফুল্ল অন্তরে সংসার-পথিকের নয়ন সন্নিধানে যাইয়া তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের বহির্ভূত করিতেছে, সামান্য কীটাপ্তকীটগণ তাহাতে ভুলিয়া, জীবনকে নিঃসন্দেহচিত্তে, অপরের করে অর্পণ করিতেছে । যখন প্রেলোভন আসিয়া মনকে প্রবঞ্চনা করে, তখনই অন্তরে অন্তরে, তিল তিল করিয়া, আশা সঞ্চারিত হইতে থাকে । মানবের শক্তি সীমাবিশিষ্ট, মন একবার ভুলিলে তাহাকে আবার জ্ঞানের অধীনে আনা, সকলের সাধ্যাত্মক নহে ! প্রেলোভনে মন ভুলিল, আর অপ-র্য্যাপ্ত আশা আসিয়া হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল ; পথিক অন্ধ হইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার মানসে ধাবিত হইল, কিন্তু হার ! সময়ে সকলই অগ্নের ঞ্চার বোধ হইল !

প্রকৃতির নিয়মামুসারে জগৎ সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে । পরমাণু সকল সময় ও কালভেদে নূতন নূতন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া আশ্চর্য্য-রূপে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে । আবার অল্পদিকে ষাত প্রতিঘাত না হইলেও সকল মনয়ে সংসার চলে না । কণ্টকবিহীন সংসার বিনাশের মূল । সমস্ত দিবস প্রথর ধরতর কিরণ জগৎকে উত্তপ্ত করিয়া, যদি রজনী-কণ্টকে আঘাত না পাইত, তবে কে না স্বীকার করিবে, এ জগৎ পুড়িয়া ছারখার হইত ? পক্ষান্তরে দুঃখ-কণ্টক সুখ-কণ্টকে আঘাত না পাইলে, চিরদুঃখ হৃদয়কে মগ্ন করিয়া রাখিত । এই জগুই আমরা কণ্টকের আবশ্যকতা স্বীকার করি । দিনের কণ্টক রাত্রি, জোয়ারের কণ্টক ভাঁটা ; বৎসরের কণ্টক বৎসর ; এই প্রকারে ভৌতিক জগৎ, আশ্চর্য্যরূপে, পরমাণু সংঘটনে গঠিত না হইয়াও,

পৃথিবীকে সুখের আবাসস্থান করিয়া রাখিয়াছে। ভৌতিক-জগৎ ছাড়িয়া যখন মানব-প্রকৃতির গুঢ় রহস্য অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনও এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাই না। মানবের আত্মা, বাত, প্রতিঘাতে, অনবরতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতিই মানব আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। সুখের অভ্যুদয়ে দুঃখ চলিয়া গেল, পূর্ণস্বাস্থ্যের সময় রোগ অবসর লইল, ধর্মবীজ রোপিত হইলে, পাপতাপ জ্বলাল হৃদয় হইতে অবসর লইল, শোকী-তাপী আত্মার মন হইতে স্মৃতির শেষ চিহ্নও তিরোহিত করিয়া, আবার সুস্থভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, এ সকল উন্নতির লক্ষণ। কারণ কে না স্বীকার করিবে, শোক-জর্জরিত মন হইতে যদি স্মৃতি অবসর না লইত, তাহা হইলে তাহার পরিণাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। কিন্তু কখন কখন এই উন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে আত্মা গম্যপথের পরিবর্তে, প্রলোভনে ভুলিয়া, অগম্যপথে যাইয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং উন্নতির স্থানে অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিল তিল করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া মানব-আত্মার স্বাভাবিক গতি, সময়ে সময়ে প্রলোভনে মন ভুলিয়া অপরিপাক্ত লম-আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে, আশার মত্ততায় অন্ধবিশ্বাস আসিয়া মনকে আক্রমণ করে; চক্ষু নিমেষ-শূন্য হইয়া যাহা দেখে, সকলই উন্নত বলিয়া বোধ হয়। মন ভুলিয়া এত সুখ অমুভব করিতে থাকে যে, সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই যেন তাহার আয়ত্ত বলিয়া মনে হয়। এ সকল ক্ষণস্থায়ী সংসারের কণ্টক বিশেষ, উন্নতির পথের বাধা মাত্র। ধৈর্য্যকে সহায় করিয়া মৃদু মৃদু অগ্রসর হও, কোন দিনও কণ্টকের আঘাত পাইবে না। আর অস্থির হও, অস্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, ঐ কণ্টকের আঘাতে তোমাকে অতল জলধির নিম্নে লইয়া ডুবাইবে। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা কতক্ষণ থাকে? পৌষ মাঘের মেঘ, কতক্ষণ গর্জন করে? নিদাঘ কালে আর্দ্রভূমি কতক্ষণ শীতল থাকে? দেখিতে দেখিতেই শুষ্ক হইয়া যায়। বৃষ্টিধারা বসন্ত কালে উত্তপ্ত পস্তুরে পড়িতে পড়িতেই শুষ্ক হইয়া যায়; মেঘগর্জন গর্জিয়াই পলক মধ্যেই তিরোহিত হয়। মানব-আত্মার অন্ধতাই বা কতক্ষণ থাকে? অসাময়িক আশার কুহকজাল কতক্ষণ মনুষ্যের মনে সুখ বিতরণ করিতে পারে? এক বণ্টা, দুই ঘণ্টা, দশমাস, দশ বৎসর। তার পর? আবার মন অবশ হয়, আবার নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। সুখের পরিবর্তে অসুখ কষ্ট

উপস্থিত হইয়া মনকে সংসার-অষ্টস্থ্যের পরিচয় দিতে থাকে । মন অর্পণ থাকিতে পারে না, কেননা প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে; আশার স্বপ্ন ভাসিয়া গেল, নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়া ক্রকুটী দেখাইয়া মৃত্যুর অদূরবর্তী অস্তিত্বের পরিচয় দিতে লাগিল; ইহাকে আশার ছলনা বলিব না ত কি বলিব ?

আশার ছলনা উন্নতির পথের কণ্টক, ক্ষণকালের জ্ঞান উন্নতির বাধা জন্মাইবার অবলম্বন; আমরা আশার ছলনারূপ কণ্টকের উপকারিতা স্বীকার করি । যাহাদিগের মন সবল, অন্ধরূপে পড়িলে উঠিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের পক্ষে আশার ছলনা প্রশস্ত জীবন-ক্ষেত্রের শিক্ষা । শরৎচন্দ্র কতবার আশার-ছলনায় জড়িত হইয়াও আবার মুক্ত হইয়াছেন ! কিন্তু তাঁহার জীবনের ভাবী অঙ্কে কি আছে, কে জানে ?

আশার ছলনা আসিয়া কখন যে মনকে ভুলাইতে থাকে, তাহা পূর্বে কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, কারণ জ্ঞানস্কু তখন অন্ধ-বিধানে অন্ধকার দেখে । শরৎ-জীবন যতবার আশার-ছলনায় জড়িত হইয়াছে, তাহা তাহার জীবনের প্রত্যেক অঙ্কেই পরিচয় দেয় । তিনি সর্বদাই ইহার হাত হইতে বিমুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে ? কখন যে আশার ছলনা মনে উপস্থিত হইয়া প্রতারণা দ্বারা মনকে ভুলাইতে আরম্ভ করিত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না; তাই শত শত বার ভুলিয়াছেন, আমরা সে অংশ সকল দেখাইব কি ? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, পড়িয়া দেখিবেন ।

আমরা শরৎচন্দ্রের জীবনের যে পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহার শেষ অধ্যায় মনে করিলে—শরীর সিহরিয়া উঠে । কানপুরের সেট প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে শরৎচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ান, পার্শ্বে একটা মাত্র স্ত্রীলোক; সংসারের আয়ী বন্ধ বাধব সকলের মুখ হইতে চিরবঞ্চিত, মৃত্যু নিকটবর্তী, শরৎচন্দ্র আশার জাল ছিঁড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন; দিন বাইতে লাগিল । দিনে দিনে দিনের তরঙ্গ বিলীন হইয়া আবার নূতন তরঙ্গের দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিল, কতস্থান আবার পূরিয়া উঠিল; আশা-প্রদীপে আবার তৈলের ছিটা পড়িল; সেই যুবতী শরৎচন্দ্রের নিকাণোমুখ আশা-প্রদীপ আবার উজ্জ্বল হইয়া দিলেন ।

শরৎচন্দ্রের জীবনের এই পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি । আশার পর নৈরাশ্য

এবং নৈরাশ্যের পর আশা, এই ছই ভাবই আমরা অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে আজও দেখি নাই। আশার সূত্র ও নৈরাশ্যের কষ্ট সম্যক্রূপে শরৎচন্দ্রের জীবনে উপলব্ধ হয় নাই, তাই আমরাও এ পর্য্যন্ত প্রতারিত হই নাই। কিন্তু এবার ? অন্ধবিশ্বাস-জনিত সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের পরও আবার যখন আশা সঞ্চারিত হইল, তখন আবার যে নৈরাশ্যের উদয় হইবে না, তাহা কে জানে ? এ সকল কথা ভাবিলে আমাদের শরীর কম্পিত হয়। যে জীবন মুহূর্ছে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আবার দিন দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বারা মনকে সন্তোষ করিতেছে, এ মনের ভাব, অবস্থা কি প্রকার, ভাবিলে শরীর কম্পিত হয়। এই স্থির-প্রতিজ্ঞ জীবনে আবার নৈরাশ্যের উদয় হইলে, আর রক্ষা নাই ; পথিক সাবধান হও। যে পর্য্যন্ত আশিয়াছে, ইহাতেই সন্তুষ্ট হও। শরৎচন্দ্র নৈরাশ্য-জীবনের আদর্শ নৌকা, আমরা নিঃস্বার্থ দাঁড়ী, তোমরা স্বার্থ সাধনের জন্ত সেই নৌকায় উঠিয়াছে ; সাবধান ! শরৎ-নৌকা ভীষণ তরঙ্গকে ভয় করে না, মনে বিশ্বাস আছে, ডুবিলে আবার উঠিতে পারিবে ; তরঙ্গ ভেদ করিবার ক্ষমতা এ নৌকার বিলক্ষণ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে ইহার দাঁড় টানিতেছি, হয় পথিকদিগকে অপর পারে লইয়া যাইব, না হয় ভীষণ তরঙ্গে ডুবাঁইব, জলমগ্নের দোষের ভাগী আমরা হইব না। আমাদের সাধামত চেষ্ঠা করিয়াও যদি পথিকদিগকে পারে লইয়া যাইতে না পারি, সে জন্ত মনে কষ্ট পাইলেও আমরা দায়ী নহি। বিধিলিপি আমরা কি করিব ? ঈশ্বরের কার্য্য কুশল-ময়, ভাবিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিব, আমাদের ভয় কি ?

তবে তোমরা পথিক, তোমাদেরই ভয়। তোমরা পয়সা দিয়া এই নৌকায় চড়িয়াছ, তোমাদের জীবন আশা-ছলনা সমুদ্রে ডুবিলে, তোমাদেরই কষ্ট, কে ইচ্ছা করিয়া জীবনকে বিসর্জন দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে ? ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, নিঃস্বার্থ-তরঙ্গের চেউ গর্জন করিতেছে, শরৎ-নৌকা চঞ্চল হইয়া আন্দোলিত হইতেছে, আমরা সঙ্কুচিত মনে সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া অল্পে অল্পে দাঁড় টানিতেছি ; তোমরা ভয় পাইয়া থাক, নৌকা ছাড়িয়া পলায়ন কর। নচেৎ নিঃস্বার্থের ভীষণ তরঙ্গে তোমাদের জীবন-প্রতিমা বিসর্জিত হইলে আমরা দায়ী হইব না ; আমাদের নৌকা লইয়া বসিয়া থাকিব, সময় হয়, তখন পার করিব ; না হয় অতল বিশ্বাস-মাগরে এ নৌকাকে ডুবাঁইয়া জন্ত নৌকা বাহিতে চলিয়া যাইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

স্মৃতি-কল্পনায় ।

স্মৃতি আলোচনা, মানব জীবনের ভাবী উন্নতি এবং অবনতির মূল সোপান। আজ উৎসাহিত মনে যে তুমুল আন্দোলন তুলিয়া মানবকে আশার চক্ষে স্বর্গপুরী দেখাইতেছে, যখন উৎসাহ থামিয়া আসিবে, আশা থাকিতেও ভয়ে ও বিষাদে মানব নৈরাশ হইয়া যখন মৃত্যুকে স্মৃৎ এবং শাস্তি বোধে, তাহার ক্রোড়ে শায়িত হইবার জন্ত প্রতীক্ষা করিবে, তখন দণ্ডে দণ্ডে, মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে, যে স্মৃৎ-স্বপ্ন নয়ন সমীপে নৃত্য করে, সে কি, জ্ঞান ? সে জীবনের পূর্ব-স্মৃতি। স্মৃতির জায় স্মৃৎ-দুঃখ-উদ্দীপক আর কিছুই নাই। পুত্রশোক-কাতরা জননী অহোরাত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছেন, মৃত সন্তানের জন্ত বিলাপ করিয়া স্বীয় মনকে স্বর্গের উপযোগী করিতেছেন, উঁহার এত দুঃখ কেন ? ঐ একমাত্র স্মৃতি। আর ঐ যে ফরাশি-জননী দিন রাত্রি ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেছেন, আর মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইতেছেন, স্মৃতি না থাকিলে উঁহার আবার দুঃখ কি ? উঁহার দুঃখের কারণ স্মৃতি ; আবার অন্তরিক্তে ভাবী আশাও স্মৃতি হইতে দিন দিন সঞ্চারিত হইতেছে। স্মৃতিই উদ্দীপনা, স্মৃতিই বিড়ম্বনা। স্মৃতিই অনন্ত দুঃখ, স্মৃতিই অনন্ত স্মৃৎ। স্মৃতি না থাকিলে বিক্র্যবাসিনী প্রেমের দাগে জীবনকে স্রোতে তানাইতেন না ; স্মৃতি না থাকিলে, শরৎচন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় বিক্র্যবাসিনীর জন্ত অস্তির হইয়া অসারত্ব প্রকাশ করিতেন না। সেই গৃহে শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে মলিনা যুবতী, স্মৃতির স্বপ্ন দেখিয়া মোহিত হইতেছেন, 'সেই মুখ, সেই হাত, সেই নয়ন, সেই বিশাল বক্ষস্থল, সেই প্রশস্ত ললাট ; পরিচয় না পাইয়াও স্বী-লোকটির মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন ? ঐ একমাত্র স্মৃতি। আর শরৎ-চন্দ্র ? তিনি কি করিতেছেন, আমরা এখন দেখিব।

দিনে দিনে শরৎচন্দ্রের ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠিল। মনে আবার একটু একটু আশা-পবন বহিতে লাগিল ; মৃত্যুর প্রাক্কালীন কঠোর অবস্থা তিরোহিত হইল ; আবার স্মৃৎ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। শরীর যতই স্নস্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পূর্ব স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; অতীত ঘটনা

সকল একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন স্বপ্নে তিনি এক-
খানি পত্র দেখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কাহিনী হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল,
যে চিন্তা হৃদয়কে আক্রমণ করিল। সেই যুবতী অধোবদনে তাঁহার
নিকটে বসিয়া রহিলেন।

শরৎচন্দ্র ভীবিতে লাগিলেন—“আমার মন বড়ই অস্থির হইতেছে, কি
ধেন মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই, ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝি না। এই
স্ত্রীলোকটার দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, ইহার ঋণ আর এ জন্মে
পরিশোধ করিতে পারিব না। দেখিয়া বোধ হয়, স্ত্রীলোকটার ভদ্রবংশে
জন্ম হইবে। ইহার যবনীর স্নায় পরিধেয়, কিন্তু বোধ হয়, যবনী নহে।
মন কি বলে ? মনের ভাব তত ভাল নহে। মন মৌসাদৃশ্যের মায়া ছাড়িতে
চাহে না। কি করিব ? পরিচয় পাইলে একটু ভাল হইত।”

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আপনি আজ আমাকে কেমন দেখিতে-
ছেন ?’

স্ত্রীলোক ।—আর ভয় নাই। আপনার শরীর সুস্থ হইতেছে।

শরৎচন্দ্র । আপনার বাড়ী কোথায় ? আপনি এখানে কেমন করে
আসিলেন ?

স্ত্রীলোক । ‘আমি স্ত্রীলোক’ আপনার পরিচয় না পাইলে, আমার
পরিচয় কি প্রকারে দিব ? যদি বাধা না থাকে, তবে আপনার পরিচয়
দিন।

শরৎ ! আপনি আমার পরিচয় লইয়া কি করিবেন ?

‘আপনি আমার পরিচয় লইয়া কি করিবেন,’ একথা রমণীর হৃদয়ে
বিধিল। তদুত্তরে সেইখানে বজ্রপাত হইলেও তত আশ্চর্যের বিষয় হইত
না, স্ত্রীলোকটা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

‘আপনার পরিচয় লইয়া কি করিব ? হৃদয় থাকে, যেমন হৃৎকেন্দ্র
ভাগী হইয়াছি, সেই প্রকার আবার আপনার হৃৎকেন্দ্র ভাগী হইব। আমি
অহোরাত্র বন্ধ-সহকারে, আহাৰ নিজে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার শুশ্রূষা
করিয়াছি, আপনি এখন বাঁচিয়াছেন ; আপনার জীবনের পরিচয়ে আমার
স্বার্থ না থাকিলেও, তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতে পারে। আমি আর
কিছুই চাই না, কেবল পরিচয়, এই পরিচয়ের আশাতেই আপনাকে বাঁচাই-
য়াছি। আপনি কি প্রকারে ওরূপ কথা মুখে আনিলেন ?’

শরৎচন্দ্র ।—আপনি আমার জীবন দান না করিলে আমি বাঁচিলাম না ; কে ইচ্ছা করিয়া এই কষ্টের জীবনের অল্প অল্পের দাসত্ব করিতে চায় ? মনুষ্যের কি ক্ষমতা যে, এক জনকে বাঁচাইতে পারে ? সময় হইলে মরিব, যখন সময় আসিবে, তখন কেহ এ জীবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না । সময় হয় নাই, তাই বাঁচিলাম । তবে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, সেজন্য যদি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, তবে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিতে পারেন । পরিচয়ের কথা বলিলেন ? আপনি স্ত্রীলোক, পুরুষের পরিচয়ে আপনার অধিকার নাই । আপনি পরিচয় পাইবেন না ।

যুবতী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—“আমি স্ত্রীলোক, আমার অস্ত্রের পরিচয়ে কাজ কি ? কিন্তু স্মৃতিতে বলে কেন, “সেই মুখ, সেই হাত ?” ভাবিতে ভাবিতে শরীর একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে ; মন সকল সময়েই চিন্তায় অভিভূত ; যাহা দেখি, তাহা যেন দেখিয়াও দেখি না । যাহা শুনি, তাহা যেন শুনেও শুনি না । মনে কেন সেই হাত, সেই মুখ জাগিতেছে ? পরিচয় না পাইলে তাহা কি প্রকারে জানিব ? হঠাৎ কোন কথা বলিলে, যদি যুবকের অপমান হয় ? সেই হাত, সেই মুখ, আর কি কাহারও নাই !” বলিলেন—“আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করুন । আপনাকে দেখিয়া মনের কেমন এক প্রকার ভাব হইয়াছে ! কি যেন মনে পড়ে, পড়ে, পড়ে না ; আবার ভয়ে সে কথা বলিতেও সাহস হয় না ; আমাকে ক্ষমা করুন ।”

শরৎচন্দ্র । যতদূর জানি, আপনার কোন অপরাধ হয় নাই, আপনাকে সাবধান করিবার জন্তই ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম । আপনার নিকটে আমি চিরঞ্জে আবদ্ধ আছি, সাধ্যমত প্রত্যাশা করা আমার উচিত । যাহা হউক, আমার সময় হইয়াছে, আর বিলম্ব করিবার অবসর নাই, আমি এখানে আর ঐ প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারি না । আমার জীবনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে আর স্ত্রীলোকের নিকট পরিচয় দিব না ; দ্বারে পড়িয়া আপনার সাহায্য সাধরে গ্রহণ করিয়াছি ; এখন আমার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই ; আপনি কোথায় বাইবেন, বলুন, আপনাকে সেইখানে রাখিয়া আসি ।

যুবতী দুঃখের স্বরে বলিলেন—“আমাকে আর আপনি কোথায়

রাখিয়া আসিবেন? আমি এইখানেই থাকিব; জীবনের অবশিষ্ট দিন, এইখানেই অতিবাহিত করিব।’

অতীত জীবন-কাহিনী মনে জাগিয়া উঠিল, জীবন ভার-স্বরূপ বোধ হইল; শরৎচন্দ্র দেখিলেন, যুবতীর ছই চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পুড়িতেছে; ঠাঁহার মনে একটু দুঃখের উদ্রেক হইল, বলিলেন—আমি এখানে থাকিলে কি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন?

যুবতী একটু পরে ভাবিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—‘না, আপনি এখানে থাকিলে সন্তুষ্ট হই না;—আপনার ক্ষতি করিয়া আমার উপকারের প্রত্যাশা করি না,—তবে একটা কথা—

শরৎ ।—বলুন কি কথা । প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিব ।

স্ত্রীলোক ।—কথা এই,—এতদিন আপনার মলিন মুখ দেখিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, আজ আপনাকে একবার সাজাইয়া দেখিতে বড়ই বাসনা হইতেছে ।

শরৎ ।—আপনার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই করুন ।

যুবতীর মনে একটু আফ্লাদ হইল, একখানি পরিষ্কার ধূতি আনিয়া বলিলেন, ‘এইখানি পরুন ।’

যুবতীর শয়ন-গৃহে পরিষ্কার ধূতি ছিল ।

শরৎচন্দ্র তাহাই করিলেন, অনেক দিন পরে আবার রণসজ্জার পরিবর্তে দেশীয় ধূতি পরিধান করিলেন, শরৎচন্দ্রের মনে এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হইল, তিনি সহসা একটু হাসিলেন । সেই হাসি রমণীজুদয়ে প্রতিবিক্ষিত হইল । শরৎচন্দ্র বলিলেন, তবে এখন যাইতে পারি ?

যুবতীর মন, সহসা মলিন হইল । শরৎচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—‘আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন ।’

শরৎচন্দ্র ‘তবে বিদায়’ এই বলিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই নিষ্কণ পুরী পরিত্যাগ করিলেন ।

যুবতী সেইখানে বসিয়া কতই কি ভাবিতে লাগিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নিয়তি ।

সৌরজগৎ আবর্তিত হইতে হইতে এক বৎসরে কতদূর যাইবে, জ্যোতিবিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া তাহা ঠিক বলিতে পারেন। মানব-জগৎ সম্বন্ধেও, যদি কোন মানব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত থাকেন, তবে এই প্রকার গণনা অসম্ভব নহে। কালচক্রে পড়িয়া কোন্ মানব কতদিনে কোন্ পথ অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা হইতে পারেন, বাহারা পরমাণু-সমষ্টির বর্তমান গুণ দেখিয়া ভাবী গুণাগুণ জানিতে পারেন, বর্তমান স্বভাব দেখিয়া ভাবী স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নতুবা হাত গণিয়া মানবের ভাবী সম্পদের কথা বাহারা বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক বলিতে কুণ্ঠিত নই। অদৃষ্ট লইয়া মহা গোলযোগ, সকল সময়েই সৰ্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল। মনের এতটুক বেগ থাকিলে, এতদিনে এই বেগে এতদূর চলিবে; এই দুর্কল মনের এই বেগে এই প্রকার বিপদ উপস্থিত হইবে; সবল মন এই প্রকার বিপদ কাটিয়া যাইতে পারিবে; বাহারা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথা প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন। কালচক্রে পড়িয়া মানব ভবিষ্যতে যে সকল পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা সে সমুদয়কে ঘটনাপরম্পরা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু অদৃষ্টে এই লেখা ছিল বলিয়া ইহা ঘটিল, এ কথা কখনও বিশ্বাস করি নাই, কখনও করিব না। যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির লিখিত অদৃষ্টের হাত এড়াইয়া কেহই স্বায় ক্রমতায়, পরিশ্রম করিয়া উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতে না পারেন; তবে আর চেষ্টা কি? তবে আর উন্নতি উন্নতি বলিয়া চীৎকার কেন? অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই; চূপ করিয়া বসিয়া থাক, লিখিত সৌভাগ্য কিম্বা বিপদ আসিবেই আসিবে। ইহা আলস্য-বৃত্তির কথা। তোমরা এই অদৃষ্টের সেবা করিয়া দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে ভালবাস, তাহাই কর; কিন্তু আর চেষ্টা করিও না, বিপদে পড়িলে তাহা হইতে আর উঠিবার জন্য যত্ন করিও না! যদি কর,—তবে বুঝি, তোমরা অদৃষ্টের সেবক হইতে

অন্যাবধিও শিক্ষা কর নাই, অথবা মুখে এক কথা, মনে আর এক কথা রাখিতে ভালবাসে। যদি অদৃষ্টের ন্যায় কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে সচেষ্ট মানবকে, চিরকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইত; আর সেই সর্বদর্শী, সর্বমঙ্গলময়, অহিংসাপরায়ণ, অপকৃপাতী ঈশ্বরকে ঘোরতর অত্যাচারী, ঘোরতর ‘পক্ষপাতী জানিয়া মানব-সন্তান এ সংসার হইতে ধর্মের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত করিয়া দিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। নিরতি বলিলে আমরা বুঝি—কালক্রমে এ পথে আসিতেই হইবে; চেষ্টা করিলেও, ঘটনার যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে এ পথ অপরিহার্য হইয়াছে; অদৃষ্ট বলিতে বুঝি—আলস্ত-পরায়ণ ব্যক্তির স্বীয় কল্পনার বিভ্রম—অধার্মিকের অসার কথা। এই নিরতি সম্বন্ধে মানব মনে বিপদের সময় কি প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, আমরা বিদ্যাবাসিনীর চরিত্রে তাহা দেখাইব।

শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলে পর, বিদ্যাবাসিনী একাকিনী সেই বাড়ীর মধ্যে বসিয়া জীবনের কণ্টকিত পথের কথা ভাবিতে লাগিলেন। জীবনের চিত্রিত বনিকা তাঁহার অন্তর পথ অবরুদ্ধ করিল, তিনি একাগ্র মনে সমস্ত জীবনের হুঃখ গণনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘটনা বিন্দুর মনে জাগিল, বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই হুঃখ-কালিমায় চিত্রিত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন;—‘আমি সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ গণিতেছি। ভীষণ তরঙ্গ সমূহ দেখিলে, শরীর কাঁপিয়া উঠে। একদিনও একটা তরঙ্গ দেখিয়া মন শীতল হয় নাই;—কেবল হুঃখ-তরঙ্গ—কেবলই যন্ত্রণার তরঙ্গ। সুখতরঙ্গ তবে বুঝি এ সমুদ্রে খেলা করে না? কতদিন তরঙ্গ গণিতেছি, কৈ এক দিনও একটা সুখতরঙ্গ গণি নাই। ‘এইত আর একটা দিন চলিয়া বাইতেছে,—আজ কি গণিলাম? ঐ একটা—ঐ একটা—ঐ একটা—হার, ও সকলই হুঃখের তরঙ্গ! আমি হুঃখিনী, তাই হুঃখের তরঙ্গই গণিতে শিখিয়াছি,—সুখ-তরঙ্গ গণিতে শিখি নাই। শিখি নাই, কেন বলিব? কৈ সুখতরঙ্গ ত একদিনও এ সমুদ্রে নৃত্য করে না; করিলে কি গণিতে পারিতাম না?’ দেখি না, তাই পারি না। কিন্তু আমি দেখিই বা না কেন? কতদিন আমার জীবন-পাখীকে দেহ-পিঞ্জরায় আবদ্ধ করিয়া এই সংসার সমুদ্রের তীরে বসে রয়েছি, কৈ একদিন, একদিন কেন, এক মুহূর্তের জন্যও একটা সুখতরঙ্গ দেখিলাম না। তবে কি আমি সুখতরঙ্গ চিনি না? তাই বা বলি কেন? যদি না চিনিতাম- তবে সকলই কেন না সুখের মনে হইল?

হুঃখ মনে হয় কেন ? সুখ, হুঃখের প্রভেদ না জানিলে, সকলই সুখের হলো না কেন ? আমি সুখ-তরঙ্গ দেখি নাই, তাতে কি ? সুখ-তরঙ্গের মুহু মুহু আন্দোলিত লহরীর কথা অনেকবার শুনেছি ; শুনেছি, সে তরঙ্গ দেখিলে চক্ষু পলকশূন্য হয়, সজীব হয়, মন আফ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে । কই তরঙ্গ ত অনেক দেখেছি, কিন্তু মন ত এক দিনও আফ্লাদে নৃত্য করে নাই ? বাহা দেখিতেছি—সকলই যেন বিবাদ-মাগরের হুঃখ-তরঙ্গ উৎখালিয়া দিতেছে ;—মনে কত কষ্ট পাই ! কষ্ট পাই ?—সেত আমার জীবনের সম্বল ! আমার জীবনে সুখ নাই, তাই কষ্ট, তা জানি ; কিন্তু কেন আমার জীবনে সুখ নাই ? আমার ভাগ্যে নির্দারুণ বিধি কেন সুখ লিখেন নাই ? ষষ্ঠ রাত্রে মধ্য আমি এমন কি অপরাধ করেছিলেম যে, সেই অপরাধেই, আমার কপালে আজন্মের মতন হুঃখরাশি লিখিয়া দিলেন ? আমি শৈশবে এমন কি কার্য্য করেছিলাম যে, সেই দোষে আমার ভাগ্যে এত যন্ত্রণা ঘটিল ? ভাগ্য কি ? অদৃষ্ট । তাই বা কি ? আমার জীবনে বাহা ঘটবে, তাহা সকলই কি লেখা রয়েছে ? তবে আর বৃথা চেষ্টা করি কেন ? বাহা হবে, তাহা হবেই ; তবে আমি আবার কষ্টকে কষ্ট বোধ করি কেন ? বিধি কি এমনি নির্দারুণ যে, পূর্কেই তিনি সুখ, হুঃখ কপালে লিখে রেখে-ছেন ? আর যদি তাই হয়, তবে আমার কপালে সুখ নাই কেন ; আমার ভাগ্যে কেন এত হুঃখ ? কে বলিবে ? অবলাজ্ঞাতি, কিছুই বুঝি না । বিধির দোষ কি ? তাঁহার বাহা ইচ্ছা, তাহাই করেছেন ; তবে মা আমাকে বলিলেন না কেন ? আমার জীবনে এত হুঃখ জেনেও, কেন আমাকে রাখিলেন ?”

বিন্দুর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া চলিল, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

“আমার কপালে এই লেখা ছিল, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না ; জানিলে তখনই প্রাণত্যাগ করিতাম । তখন যদি বিধির লিখিত হুঃখ ও বিবাদময় চিত্রপট আমার নয়ন সমীপে পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইত, তা হলে তখনই মরিতাম । তখন দেখি নাই, কিন্তু—এখন ত দেখিতেছি ! বা দেখিতেছি, সকলই হুঃখের ; তবে এখন মরি না কেন ? কি অস্ত্র মরিব ? বা দেখিতেছি, এ সকলই অতীত ঘটনা, তাবী জীবনের অংশ যেন তুবারে আবৃত, কিছুই দেখা যায় না ; উহার ভিতরে কি আছে, কেমন করিয়া জানিব ? যদি সুখ থাকে ? এত হুঃখের পর যদি সুখ পাই, তবে অর্ধেক মরিব কেন ?

মাহুঃখের সুখে শুনেছি, হুঃখের পর সুখ হয় । আমার জীবনে

কি তা হবে না ? এত ছুঃখ সহ্য করেও কি সুখের সুখ দেখতে পাব না : কে জানে ? ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে ? যদি সুখ না-ই থাকে, যদি বিধি সুখ না লিখে থাকেন ? তবে মরি না কেন ? মন, আইস তবে মরি।” আবার ভাবিতে লাগিলেন—“এই দূরদেশে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়া আসিয়াছি ; কষ্ট-তরুণি বহিয়া বহিয়া, অকূল সময়-সাগরের ছুঃখ-তরঙ্গ গণিতে গণিতে কতদূর এসে পড়েছি ? এই নির্জন বাটীর মধ্যে আমি একাকিনী যেন প্রদীপের স্মার জলিতেছি ! আমি আর জলিব কেন ? কার জন্ত আমি এখানে আসিলাম ? কার জন্ত কষ্ট-তরুণি বহিলাম ? কার জন্ত ছুঃখ-তরঙ্গ গণিলাম ?—আর কার জন্তই বা এই নির্জন বাটীর মধ্যে একাকিনী জলিতেছি ? আমার নিজের জন্ত ? আমার কি সাধ মিটে নাই ? কত দেখিলাম—কত শুনিলাম, তবু আমার পোড়া সাধ মিটিল না ? আমি জলিতেছি,—ক্রমে ক্রমে আয়ুতৈল নিঃশেষিত হয়ে আসিতেছে, আর কত দিন বাঁচিব ? তবে সাধ মিটে না কেন ? পোড়া স্মৃতি আজও মনে জাগে কেন ? মন হইতে সকল রূপ-চিহ্ন অন্তর্হিত হয় না কেন ? স্মৃতি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আশা ত যায় না ?—আশা ত ছাড়িতে পারি না ? আশা ছাড়িতে পারি না, যাহা দেখিলাম, তাহা আবার না দেখিয়া মনকে ঠিক করিতে পারি না ? এও কি অদৃষ্ট ? ইহাও কি আমার কপালে লেখা ছিল ? আমি এ প্রদেশে কেন আসিলাম ? আমার কপালে লেখা ছিল। আমার জীবনের সুখ, অসময়ে অন্তমিত হলো কেন ? আমার কপালে লেখা ছিল। স্মৃতিতে সেই মুখ-ছবি আজও জাগে কেন ? আমার কপালে লেখা ছিল। যাহা দেখিলাম, তাহা পাইলাম না কেন ? আমার কপালে লেখা ছিল ? আমি পিতৃ মাতৃ মেহ হইতে বঞ্চিত হইলাম কেন ? আমার কপালে লেখা ছিল। সকলি আমার কপালে লেখা ছিল ;—কেবল একটী নাই ; একটী নাই—আমার জীবনে সুখ নাই। তবে মরিনা কেন ? না—এ শরীর যাহার, তাহার নিকটে মরিতে হয়, মরিব। তবে যাই,—যেখানে স্মৃতি যায়, যেখানে স্মৃতিতে সাদৃশ্য আছে, সেইখানে যাই, যাইয়া যদি না পাই, তবে কি মরিব ?” আবার ভাবিলেন, “এ বেশে যাইব না। স্বনীর বেশ পরিত্যাগ করি। স্বদেশে যে বেশে থাকিতাম, সেই বেশে যাই,—হয় ত এই জন্মের মত চলিলাম। না হয় আবার ফিরিব। সত্যতামা দেখিলে কি বলিবে ? যাই বলুক, আমার আর লজ্জা কি ?

তবে এইক্ষণই যাই ।” মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া বিদ্যাবাসিনী কষ্টের জীবন খানিকে লইয়া কোথায় চলিলেন ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

আবার সেই ছবি ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎচন্দ্র ! তুমি নির্ধূর, নির্দয় । যে অবলার একমাত্র সাহায্যে তুমি মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে, কোন্ প্রাণে তুমি সেই স্মৃতি-বিমোহিত অবলাকে একাকিনী ফেলিয়া আসিলে । মানিলাম, স্ত্রীজাতি স্বার্থপর ; মানিলাম, রমণীর মন চঞ্চল ; মানিলাম, পুরুষের মন যুবতী-কাঁদে ধরা পড়িয়া থাকে ; মানিলাম, রমণী-কটাক্ষ পাপের প্রলোভন ; কিন্তু সে কোন্ মনের কথা ? যে মন, পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও আত্মশুদ্ধি, আত্মপবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারে, সে মন আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কি ? তুমি কোন্ হৃদয়ে, তোমার জীবনতোষিণীকে বিসর্জন দিয়া আসিলে ?

রমণীর বাসনা ছিল, তোমাকে দেখিয়া স্মৃতির অনন্ত জালা নিবারণ করিবে ; তাঁহার পরিশ্রম এবং যত্নের পুরস্কার তুলিয়া লইবে । তুমি সে পথে কণ্টক পুতিলে, তোমাকে নির্ধূর বলিব না ত কি বলিব ? স্ত্রীলোকের নিকট পরিচয় দিলে না কেন ? একজনের উপকারের জন্ত কি না করা যাইতে পারে ? সামান্য পরিচয় দেওয়া ত তুচ্ছ কথা, প্রাণ পর্য্যন্ত পরোপকারের জন্ত পরিহার্য্য । তুমি রমণীর বাসনা পূর্ণ করিলে না, স্বীয় মত বজায় রাখিবার জন্ত, মনের কৃতজ্ঞতাকে বিসর্জন দিলে ? তুমি নির্ধূর ! নয়ন ভরিয়া তোমার দেখিয়া, স্মৃতির দুর্লভ জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে বাঁহার ইচ্ছা, তুমি তাঁহাকে দেখা দিতে না দিতে চলিয়া আসিলে । তুমি নির্দয় ; তোমার হৃদয় পাষণময় ! দ্রুতবেগে বহিষ্কৃত হইয়াছ, চলিয়া যাও । বিলম্বের প্রয়োজন নাই । ছি, আবার মূঢ় মূঢ় পদ সঞ্চারণে অগ্রসর হইতেছ কেন ? আহত স্থানে বেদনা বোধ হইতেছে ? সে কথা অগ্রে ভাবিয়া দেখ নাই কেন ? এখন বিলম্ব করিও না ;—আবার কাঁদে পড়িবে !

শরৎচন্দ্র ধীরে, ধীরে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একটু চলিতে না

চলিতেই পা নিস্তেজ হয়ে আসিতে লাগিল ; ক্ষতস্থানে আবার বেদনা বোধ হইতে লাগিল । আর চলিতে পারিলেন না । কোথায় যাইবেন, বসিবার স্থান কোথায়, তাহা অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে একটা স্থান পাইলেন, সেইস্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

অল্পে অল্পে দিবা অবসান হইয়া আসিল ! প্রথর-সূর্য্যের তেজ আবার পড়িয়া আসিতে লাগিল ; বাল-সূর্য্য যৌবন অতিবাহিত করিয়া আবার বৃদ্ধের সাজে সাজিল, ক্ষীণরশ্মি যুহু উষ্ণতা এবং উজ্জলতার সহিত সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল । শরৎচন্দ্রে যে স্থানে উপবিষ্ট, তাহার নিকটে একটা ক্ষুদ্র খাল । খালের তীরে তীরে অসংখ্য বর্ণের পত্র, পুষ্পময় বৃক্ষ সুশোভিত । জলে সেই সকল বৃক্ষের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিতেছিল,—অন্ন অন্ন কম্পিত পত্রপুঞ্জের প্রতিকৃতি যেন জলের নিম্নে ডুবিতেছিল । কখন কখনও উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া জলের মধ্যে মৎস্যের ছায়া জৌড়া করিয়া বেড়াইতেছিল । মধ্যে মধ্যে দুই একটা বৃক্ষের ফল স্থান-দ্রষ্ট হইয়া, ঈষৎ শব্দে জল-কম্পিত করিয়া পড়িতেছিল । কম্পিত জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের প্রতিকৃতি সমূহও কম্পিত হইতেছিল । মধুর দৃশ্য ।

সূর্য্য ত্রস্ত হইয়া, স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিয়া অন্তাচলচূড়ে আরোহণ করিলেন ; তাঁহার রক্তিম ভীম মূর্ত্তি জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শত শত শোভা বিস্তার করিতে লাগিল । কম্পিত জলের সহিত সেই রশ্মি ঝিকিমিকি করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল । কাননের পক্ষা সকল সহসা ডাকিয়া উঠিল, এক ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে যাইয়া পড়িতে লাগিল, অন্য ডালের পক্ষীর আবার ডাক ছাড়িল । দূরস্থ জঙ্গল স্ব স্ব আবাস স্থানে সমাগত হইতে লাগিল । কত সহস্র সহস্র কীট বৃক্ষে আশ্রয় অবেষণ করিতে লাগিল । দুই একটা কোকিল অস্বাভাবিক রবে ডাকিয়া নীরব হইল । ভ্রমরগণ গুন গুন রব করিতে করিতে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল । বৃক্ষের উপরে এবং শূন্য স্থান সমূহে জলীয় ধুম্রবৎ পদার্থ সকল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল, দিক সমূহ দেখিতে দেখিতে ঈষৎ তুষারে আবৃত হইল । পশ্চিম-গগন রক্তিম বর্ণে বিভূষিত, সে দৃশ্য দেখিলে মনে ভয় হয় । দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ সকল ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল, বায়ু থামিয়া থাকিল না, কানন ভরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । এক প্রকার পিপী-লিকা নবপালকে ভূষিত হইয়া, মাটি ছাড়িয়া উড়িতে লাগিল, বায়ুগণ

আহ্লাদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে উদয়স্থ করিয়া পাকস্থলী পূর্ণ করিতে লাগিল। ভেকগণ নীরবে স্ব স্ব স্থানে গিয়া ডাকিতে লাগিল। আর এক প্রকার কীট বি বি করিয়া তীব্র স্বরে ডাকিতে লাগিল। দূরস্থ নবহুর্দাদলোপরি কখনও কখনও সর্প দ্রুতবেগে পথ কাটিয়া যাইতেছিল ; কোমল স্বভাবসম্পন্ন হুর্দাদল সমূহ যেন ভয়ে মস্তক নত করিয়া, পথ ছাড়িয়া দিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে দুই একটা নক্ষত্র আকাশে দেখা দিল ; পঞ্চমীর টান, পশ্চিম গগনে মুহু মুহু হাসিতে লাগিল ; কুমুদগণ মুখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। শরৎ-চন্দ্রের পশ্চাতে অনেকগুলি বেলফুলের ঝাড় ছিল, সমস্ত বুঝিয়া বেলফুল ফুটিয়া গন্ধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল, বায়ু সেই গন্ধ বহন করিয়া শরৎ-চন্দ্রের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতে লাগিল। দূরে দুই একটা গাছের ভিতর দিয়া পবন একটু দ্রুত যাইতেছিল, তাহাতে সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছিল। আকাশের এক দিকে একটু একটু মেঘ উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

রজনী আসিল, চন্দ্র সমস্ত বুঝিয়া অর্ধ-বিকশিত হাসি হাসিল ; নক্ষত্র সহচরীর বেশ পরিণত, উদ্যান নীরব হইল ; পানীয় কলত্রব ধামিয়া আসিল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল ; শরৎচন্দ্র বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতেছেন। কে হঠাৎ মধু-মাখা স্বরে একটা গান গাইয়া উঠিল।

কে গান গাইল ? না বুঝিতে পারিয়া শরৎচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। স্বপ্ন ভূমিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইল, স্বর রমণীর, কিন্তু কে গাইল ? নির্জ্ঞান কাননে এই সময়ে কে আসিয়া গান গাইল ? শরৎচন্দ্র সে স্থান হইতে উঠিয়া অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কাহাকেও দেখিলেন না ; অগত আবার শুনিলেন, দূর হইতে কে যেন মধুর স্বরে আকাশ ভাসাইয়া গাইতেছে—“নারীর শরীর বিধি—কোমল করিল কেন ?”

যে দিক হইতে স্বর আসিতেছিল, সেইদিকে দ্রুতগমনক্রমে চলিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু না দেখিয়া, আবার আসিয়া পূর্বস্থানে বসিলেন। প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ইচ্ছা হইল না ; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন;—“কানপুরের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থানটীতে একটু স্ত্রী আছে। এ স্থানটির ভাব বড় ভাল বোধ হয় না। কে এমনি করিয়া প্রাণস্পর্শী স্বরে গান গাইয়া আমাকে বিরক্ত করিতে আসিল ? যে কথা ভাবিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, তাহাই আবার উল্লীপ্ত করিয়া মনকে অস্থির করিয়া দেয়

কেন ? আহা, স্বর কি মিষ্ট !! মন একেবারে মোহিত হয় ! সঙ্গীতের কি অপূর্ব শক্তি !! অঙ্গ শীতল করিয়া দেয়, এক সময়ে বিদ্যাবাসিনী এই প্রকার গান করিয়া আমাকে মজাইত । বিন্দুর কথা এখন আবার ভাবি কেন ? যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখন আবার তাহাকে এ স্মৃতি পটে রাখিব কেন ? বিন্দুর সরল মনের কথা ভাবিলে মন অস্থির হয় ! তাহাকে আমি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিলাম ; আমার মনে একটুকও দয়া হলো না ? বিন্দু কি এখনও জীবিত আছে ? কে বলিবে ? ইচ্ছা হয়, বিন্দুকে একবার দেখি। মন ! সে কি ? এই যদি বাসনা ছিল, তবে তাহাকে ছাড়িয়া আসিলে কেন ? দুর্বল মন, সহসাই চঞ্চল হইয়া উঠে ।” শরৎচন্দ্র স্থির হইয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন ;—“আমার জীবন-তুল্যা বিদ্যাবাসিনীকে আমি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবনের কর্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি । বিন্দুর জীবনের আর কি আছে ? আমাকে ভিন্ন, বিন্দু আর কি জানে ? ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে বিন্দুর নিকটে যাই। হায় ! আমি কেন মানুষ হইলাম ? পার্থী হইলাম না কেন ? আমি উড়িতে শিখি নাই কেন ? কেন আমি এই মুহূর্তে বিন্দুকে দেখিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে পারিলাম না ?” হৃদয়-দর্পণ ! তুমি কাহার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ ? স্মৃতি-পটে এই ত সেই সরল হাসি, এই ত বিন্দুর সেই সরল স্বভাব,—এই ত বিন্দুর কেশ এলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, এই ত বিন্দুর সেই ক্র ঈষৎ বক্রভাবে শোভা পাইতেছে, এই ত বিন্দুর সেই মুখ—সেই মলিন মুখ, কে এ সকল আঁকিল ? স্মৃতি ! তুমিই একমাত্র সর্বত্র স্মৃৎকরী । যাহা দেখিতে বাসনা, তাহা তুমি যেমন মানুষকে দেখাইতে পার, এমন আর কে পারে ? হৃদয় তৃপ্ত হইল, বিন্দুর প্রতিকৃতি দেখিয়া অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইল ! আবার কি শুনা যাইতেছে ? আবার গান ? মন দিয়া শুনি,” এই বলিয়া শরৎচন্দ্র নিস্তব্ধভাবে গান শুনিতে লাগিলেন ;—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ।

আমি করি কি উপায় ?

সে মনোমোহন বিনে মরি প্রাণ যায় ।

আসিলাম দেশ ছেড়ে, পিতামাতা রেখে ঘরে,

নিবাতে মন-আগুন, টেলে প্রেম-জল,—

কিন্তু সে অনল হয়, নিষে না যে এ সময়,

(বুঝি) অবলার প্রাণ যায়, ছাড়িয়া হৃদয়।

একাকিনী এ নির্জনে আত্মীয় বান্ধব-হীনে,

দিবানিশি ভাসিতেছি, নয়ন-সলিলে ;

কত আর সহে প্রাণে—যন্ত্রণায় সদা হানে,

করণা নয়নে প্রাণে দেখে না আমার । *

গীত সমাপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র এবার স্থান ছাড়িয়া উঠিলেন না। ক্রমকাল পরে সহসা যেন দুইটা প্রক্ষুটিত কোমল পুষ্প শরৎচন্দ্রের চক্ষুকে দৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত করিল। কোথা হইতে কে আসিয়া নয়নকে আব-
য়িত করিল? স্মৃতি সহসা যেন প্রেম-নিকেতন হইতে, বলিয়া দিল,
'জীবনের সেই একদিন।' শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন; পাষাণ আঁধ হইল;
বীর পুরুষের মনের যে লুক্কায়িত স্থানে কঠিন আবরণে প্রেমবস্ত্র বিকসিত
হয়, সেই আবরণ যেন সহসা অপহৃত হইল, সহসা সেই প্রেমফুল হইতে
একটা পাপড়ী ধসিয়া পড়িল;—শরৎচন্দ্র বিগলিতচিত্তে আশ্চর্যের সহিত
বলিলেন—'আপনি কে?'

নিমেষ মধ্যে উত্তর হইল—'আপনি কে? অগ্রে পরিচয় দিন।'

স্বর শুনিয়া শরৎচন্দ্র বুঝিলেন—'নির্জন পুরীর সেই জীবনদায়িনী।'
বলিলেন—'আপনি আমার নয়ন আবরিত করিলেন কেন?'

'আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি না, তাই জানিবার জ্ঞান।'

'আপনাকে পূর্বে চিনিতে পারি নাই, ক্রমা করিবেন।'

'অঙ্ককারে কি প্রকারে চিনিবেন?'

'আপনি এখানে আসিলেন কেন?'

'আপনাকে দেখিবার জ্ঞান, আর আমাকে দেখাইবার জ্ঞান।'

'আপনাকে ত দেখিয়াছি? যাইবার সময় আবার আসিলেন কেন?'

'আপনাকে পরিচয় দিব।' এই বলিয়া নয়ন ছাড়িয়া নুবর্তী শরৎচন্দ্রের
সম্মুখে দাঁড়াইলেন। স্বীয় অঞ্চল হইতে বাতি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সে
স্থান আলোকময় করিলেন।

শরৎচন্দ্র দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়গ্ৰস্ত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন,
'আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না কুহকিনীর দ্বারা প্রতারণিত হইতেছি?
রমণী বলিলেন, 'আমার নাম বিজ্ঞাবাসিনী।'

শরৎচন্দ্র বলিলেন, তোমাকে চিনিয়াছি। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তোমাকে

দেখিয়া মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু সহসা তোমাকে কিছু বলিতে সাহস পাই নাই ; তুমি আমাকে পূর্বে পরিচয় দিলে না কেন ?

“তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই,ইহা বুঝিয়া কোন্ সাহসে পরিচয় দিব ?”

‘তুমি এই দূরদেশে কি প্রকারে আসিলে ?’

‘কি প্রকারে আসিলাম ?—মন যেখানে, সেখানে যাইব, ভাবনা কি ?’

এই কথা শুনিয়া সহসা শরৎ উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “সাবাস মেয়ে ! তুমি সামান্য স্ত্রী নও । তোমাকে আমি আর দেখিব না । যেখানে ইচ্ছা যাও । আমি চলিলাম ।” এই বলিয়া শরৎচন্দ্র উঠিলেন ।

‘কার জন্ত এই দূরদেশে আসিলাম, শরৎ ? তোমার জন্ত পৃথিবীর সমস্ত সুখের আশা ছেড়ে আমি কাঙ্ক্ষালিনীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে তোমার নিকটে আসিলাম কেন ? তুমি যে হস্তদ্বারা বলবীৰ্য্যশালী ইংরাজদিগকে বধ করিয়া আমাকে বাঁচাইলে, সেই হস্তদ্বারা আমাকে বধ কর, আমার জীবন সার্থক হউক ।’

শরৎচন্দ্র বলিলেন—‘পাপীয়সি, তাহাও করিতাম । কিন্তু তাহাতে পুরুষ কি ? তুই কুলটা—আমার হস্ত তোর রক্তে কলুষিত করিব কেন ? তোর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যা । এই বলিয়া বিদ্যাবাসিনীকে হস্ত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, বিদ্যাবাসিনী ভূতলে পড়িয়া গেলেন । আর শরৎচন্দ্র ? বিন্দুর মস্তকের ছই এক স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইল দেখিয়াও, দ্রুত পদসঞ্চালনে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন ।

হৃদয় আবার পাষাণে বাঁধিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পৃথিবীর সব যায়, দুঃখ যায় না ।

আজ বিদ্যাবাসিনীর সব ফুরাইল । যে আশ্বাসে বিন্দুর আশা-প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা আজ নিঃশেষিত হইল ! আজ বিন্দুর মৃত্যু হইলেও কোন দুঃখ থাকিত না । আশা না থাকিলে লোক বাঁচিতে পারে না, বিদ্যাবাসিনীর আর কি আশা আছে ? আজ বিন্দুর সব ফুরাইল, আর বাঁচিয়া সুখ কি ? সুখ নাই, কিন্তু কে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে ? দুর্লভ্য অপার সমুদ্রে নিপতিত

হইলে, কাহার না ইচ্ছা হয়; প্রাণ বাহির হইয়া বাউক ? এই ভব-সংসারের কষ্টজালে আবদ্ধ হইলে, কাহার মরিতে না ইচ্ছা হয় ? অনেক সময়ে অনেকরই মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মৃত্যু আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় না । ইচ্ছার জীবন-প্রদীপ নির্দোষ করিতে পারিলে, এই সংসারের কষ্ট যন্ত্রণার ভয়ানক কষাঘাত-দাহন নির্দোষ হইয়া যাইত, সংসারে কষ্টের তরণী আর কাহাকেও বহিতে হইত না । কিন্তু কালের দুর্ভাগ্য প্রভাব কে বুঝবে ? আজ বিদ্যাবাসিনীর মৃত্যু হইলে, সকল কষ্ট নিবারিত হইত; কিন্তু তাহা হইলে কে কষ্ট ভোগ করিবে ? পৃথিবীর সব যায়, কিন্তু কষ্ট যায় না, দুঃখ কষ্ট মানুষের কোমল হৃদয়কে ছাড়ে না ।

তিমিরময় রজনীর ভয়ানক ক্রকুটী দণ্ডে দণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল, বিদ্যাবাসিনী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেইখানে মৃত্যু-কামনার অচেতন হইয়া রহিলেন ! অচেতন হইতে হইতেই সংসারের সমস্ত কথা স্মৃতি-পথ হইতে পলায়ন করিল, তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন ;—

“এক আশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন, বিদ্যাধরী যেন তাঁহার শিরস্থানে বসিয়া বলিতেছে, ‘ভগ্নি ! এই দেখ এ রাজ্য কেমন মনোহর, দুঃখ যন্ত্রণা, শোক তাপ, কিছুই নাই । সংসারের মায়ায় ভুলিয়া কেন বৃথা এত যন্ত্রণার ভাগ বৃদ্ধি করিতেছ ? বিচ্ছেদ-অনলে পুড়িয়া কেন ছারখার হইতেছ ? সংসারে যাহাকে আপনার ভাবিতেছ, বাস্তবিক সে আপনার নহে, তাঁহা চইতেই তোমার এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ! তা কি বুঝিতে পারিতেছ না ? তবে ভুলিতেছ কেন ? আইস, আমার ক্রোড়ে পুরিয়া তোমাকে এই রাজ্যে লইয়া যাইব । চিরকালের মত তোমার কষ্ট যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে ! তোমার দেহের আশা করিও না, এই দেখ তোমার জন্য স্বর্গের দ্বারযুক্ত রহিয়াছে ।”

বিদ্যাবাসিনী দেখিতে লাগিলেন,—“বিবাদ-বিসম্বাদশূন্য, স্বর্ণ-মণ্ডিত এক আশ্চর্য্য পুরী । তাহার ভিতরে দ্বিবদ-রত্ন-নির্ম্মিত পর্যাঙ্কোপরি শত শত কুল-কামিনীগণ সানন্দে বিচরণ করিতেছেন ! সকলের মুখ প্রকুল, যন্ত্রণার চিরুমাঞ্জ ও তথায় নাই । নয়ন মন যেন তৃপ্ত হইল ।” দেখিতে দেখিতে সেই রমণীগণের মধ্যে একজন যেন বিদ্যাবাসিনীকে গোপনে কি বলিলেন, বিদ্যাবাসিনীও মস্তক নত করিয়া তাঁহার কথায় সাগ দিলেন । রমণী একখানি স্বর্ণ-নির্ম্মিত আসন দেখাইয়া বলিলেন, “ভগ্নি ! স্বর্গে যাইবে ত এই আসনে উপবিষ্ট হও ।”

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, “আসনে বসিবার পূর্বে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ;—ওখানে গেলে আমার শরৎকে দেখিতে পাইব ত ?”

রমণী বলিলেন, “আবার সেই পামরের কথা ? মুখে আনিতে একটুও লজ্জা বোধ হলো না ? কার জন্ত তুমি এত কষ্ট পাইতেছ ? কার জন্ত তোমার এত যত্ননা ? শরৎ তোমাকে গ্রহণ করিবেন না, তা কি তোমার এখনও বিশ্বাস হয় না ? ছি ! কোন্ মুখে তুমি সেই পামরের কথা আবার বলিলে ?”

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, “তিনি আমারই। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইব ! তিনি আমাকে ভাবুন আর না ভাবুন ; তিনি আমাকে গ্রহণ করুন আর না করুন, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিব ? আমার কষ্ট হইতেছে, এ আমার স্বীয় কষ্টের ফল ! দেবতুলা শরতের দোষ কি ?”

রমণী বলিলেন, “সংসারের মন্ততায় তুমি আজও অন্ধ রহিয়াছ, নচেৎ যে নিষ্ঠুর শরৎ তোমাকে এই পাষণ্ডের উপর ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কথা তুমি কখনও ভাবিতে না। তাঁহার আশা তুমি এখনও ছাড়িতে পারিতেছ না ? সেত তোমাকে একবারও ভাবে না !”

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, “আমাকে ক্ষমা করুন ! শরৎচন্দ্রের ধ্যান করিলেও মনে যে বিমল সুখ পাই, সে সুখ হইতে আমি বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা রাখি না। শরতের আশা ছাড়িয়া আমি সুখ পাইব, আমার মনে ইহা স্থান পায় না। তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বর্গও চাই না।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে সেই রমণী অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন ; সেই স্বর্ণ-মণ্ডিত পুরী ক্ষণকালের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল ; সেই স্বর্ণাসন নিমিষের মধ্যে কোথায় গৃহীত হইল, তাহা আর বিক্র্যবাসিনী দেখিতে পাইলেন না ; তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তবুও চেতনা হইল না।

রজনী গাঢ়তর হইল ; আকাশের মেঘ কোথায়ও নীলবর্ণ, কোথায়ও দীপং শাদা, কোথায়ও একেবারে গাঢ়তর কালিমাময়, সময়ে সময়ে বিদ্যাতের আলোকে দেখা যাইতে লাগিল। নীরব কানন, আকাশে মেঘ, চতুর্দিক নিস্তরু, শীতল বায়ু ছাড়িল ; এক একটা পাখী কলরব করিয়া নীরব হইল। বিন্দু কিছুই জানেন না। আকাশের মেঘ জলে প্রতিবিম্বিত হইল, বিদ্যাতের সঙ্গে সঙ্গে জলের ভিতরে সকলই দেখা যাইতে লাগিল, ঘোরতর অন্ধকার

ঘনতর হইতে আরম্ভ হইল, তবুও বিন্দুর চেতনা হইল না । অচেতন অবস্থায় কত কি চক্ষের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, কষ্টের কথা সকল একবার একবার মনে পড়িতে লাগিল, কিন্তু কিছই ধারণা করিতে পারিলেন না ; এক চিন্তা দণ্ডে দণ্ডে অন্য চিন্তার স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল ; মনে দুঃখ হইল, স্বর্গের কথা মনে হইল, ভাবিলেন, কেন গেলান না ? সংসারের কষ্টের হাত কেন ইচ্ছা করিয়া এড়াইলাম না ? আবার সম্পূর্ণরূপে সকল বিশ্বস্ত হইলেন, আবার অচেতন হইলেন ; আবার ক্ষণকাল পরে একটু চৈতন্য হইল, ভাবিলেন—‘কেন গেলান না ? ভাবিতে ভাবিতে আবার ক্ষণকালের মধ্যে সকল ভুলিয়া অচেতন হইলেন ।

এই প্রকার বিদ্যাবাসিনীর দুঃখের নিশি তিল তিল করিয়া অতীত হইতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে আবার শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বিদ্যাবাসিনীর মলিন মুখ ধরিয়া বলিলেন—‘বিন্দু ।’

বিদ্যাবাসিনী সিহরিয়া উঠিলেন ; মনে এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হইল, মহা মুখ তুলিয়া বলিলেন—‘কে, শরৎ ?’

শরৎচন্দ্র বলিলেন, হাঁ আমি । তুমি অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছ বুঝি ?

বিদ্যাবাসিনী—‘তুমি কি সেই পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া রহিয়াছ ? এতক্ষণ কথা না বলিয়া চুপ করিয়া ছিলে কেন ?’

এই সময়ে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল, হঠাৎ একবার বিহাতের আলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া শরীরকে বিকম্পিত করিল ; জলের উপর যে সকল মৎস্য ভাসিতেছিল, তাহারা শব্দ করিয়া ভীত মনে জলের ভিতরে আশ্রয় লইল ।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—‘বিন্দু ?’

বিদ্যাবাসিনী বলিলেন—‘কি, প্রাণের শরৎ !’

শরৎচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—‘বিন্দু ! তুমি গুরুতররূপে আহত হয়েছ ?’

বিদ্যাবাসিনী আশ্চর্যের সহিত বলিলেন—‘কই ? আমিত কখনও আঘাত পাই নাই ; তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ ?’

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—‘আমি তোমাকে এই পাবাণের উপর সজ্ঞানে ফেলিয়া দিয়াছিলাম ; তুমি আঘাত পাও নাই ?’

বিন্দু । কই ? তাত আমার স্বরণ হর না । তুমি কখন আমাকে ফেলিয়া গিয়াছিলে ?

শরৎচন্দ্র । তোমার মনে নাই । অনেক কষ্টের সময় সকল কথা মনে থাকে না । আমি তোমাকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম ।

বিন্দু । গিরেছিলে, আবার আসিলে কেন ?

শরৎ ? তোমাকে দেখিতে আবার ইচ্ছা হইল ।

বিক্র্যবাসিনীঃ নয়ন প্রাপ্ত হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিল, বলিলেন, 'শরৎ ! আমি অপরাধিনী, আমাকে দেখিতে তোমার ইচ্ছা হইল কেন ?

এই সময় বৃষ্টি জোরে পড়িতে লাগিল, শরৎচন্দ্র বিক্র্যবাসিনীর হাত ধরিয়া নিকটস্থ একটা পর্ণকূটারে আশ্রয় লইলেন ।

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, শরৎ ! এতদিন পর তোমার হস্তস্পর্শ ক'রে, আমার ভাপিত হৃদয় শীতল হইল, তুমি কি প্রকারে এতদিন ভুলে ছিলে ?

শরৎচন্দ্র বলিলেন, বিন্দু ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত আমার মন বড়ই উৎসুক হইতেছে ; অনুমতি পাইলে বলিতে পারি ।

বিন্দু । আমার আবার অনুমতি কি, তোমার ইচ্ছা হইলেই ত বলিতে পারি ।

শরৎচন্দ্রের মুখ গভীর হইল, বলিলেন,—বিন্দু ! যে পর্যন্ত আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না পাইব, সে পর্যন্ত তুমি আমার নও । আমার প্রশ্ন—'তুমি একাকিনী কেমন করে এই দূরদেশে আসিলে ?'

বিক্র্যবাসিনীর মন চঞ্চল হইল, বলিলেন, নাথ ! সে সকল কথায় প্রয়োজন কি ? আমার অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করিবে না ?

শরৎচন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বলিলেন, বিন্দু ! আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না ; তোমাকে দেখে আমি কত স্নেহী হইয়াছি, তা ঈশ্বরই জানেন, তুমি আমার সেই স্নেহ হরণ করিও না ; যথার্থ উত্তর দাও ।

সহসা কাক ডাকিল ; আকাশ ঘন অন্ধকারে আবৃত ; বৃষ্টি অনবরতই পড়িতেছে । বিক্র্যবাসিনীর হৃদয় অস্থির হইল ; কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্য নির্গত হইল না, চক্ষু প্লাবিত করিয়া জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, অনেক কষ্টে বিন্দু শরৎচন্দ্রের গলা ধরিয়া বলিলেন,—নাথ ! আমি কি—আর বাক্য ফুটিল না । শরৎচন্দ্রের মনে মনেই দ্বিগুণতর নুঙ্কি পাইল, বলিলেন, বিন্দু ! আমাকে আর কষ্ট দিওনা । তুমি কি প্রকারে এই দূরদেশে আসিলে, যতক্ষণ না জানিব, ততক্ষণ আর আমার মন স্নেহ হইবে না । আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে ; আর বিলম্ব করিও না ।

বিক্র্যবাসিনী কাতর-স্বরে বলিলেন,—“শরৎ এই কি তোমার পরীক্ষার সময় ? এতদিন পরে কোথায় তোমার সহিত ভালভাবে দুটা কথা বলিব, না তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলে ? শরৎ ! আমাকে ক্ষমা কর, সকল কথা পরে বলিব ।

শরৎচন্দ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, ‘বলিলে ন? তবে আমার গলদেশ হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া লও । অপরাধিনি ! আমার নিকট সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হও ?’

বিক্র্যবাসিনী নীরব রহিলেন, কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও বাক্য ফুটিল না ।

শরৎচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমার মন কেন অস্থির হয় ? বিন্দুর স্মৃতি স্মৃতি হইব, সে আশা অনেক দিন হইল পরিত্যাগ করেছি, তবে আজ আবার মন অস্থির হইতেছে কেন ? ‘বিন্দুর আয়ত্ত্ব সন্দেহ আমার সন্দেহ হইতেছে ! বিন্দু যথার্থ উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হয় কেন ? আমি তখনই ত ভাবিয়াছিলাম—‘বিন্দুর চরিত্রে কলঙ্ক পড়িয়াছে,’ জানিয়াও আবার আসিলাম কেন ? আর আসিলাম যদি, তবে উত্তর পাইলাম না কেন ? উত্তর পাইলাম না, তাতেই বা মন অস্থির হয় কেন ? বিভ্রমনা আর কি ? আমি কি স্ত্রীলোকের ফাঁদে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ করিতেছি ? না হইলে কেন আসিলাম ? তবে যাই ; এখনই যাইব—বিন্দু আমার কে ?’

বিক্র্যবাসিনী বলিলেন, যাইও না, বলিতেছি ।

শরৎ ।—বল ।

বিক্র্য ।—কি বলিব ?

শরৎ ।—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথার্থ উত্তর দেও—তুমি এখানে আসিলে কেন ?

বিক্র্য । তোমাকে অহুসন্ধান করিবার জন্ত ।

শরৎ । কেমন করিয়া আসিলে ?

বিক্র্য । কেন একজন লোকের সঙ্গে ধরিয়া আসিয়াছি ।

শরৎ ।—সে লোক কে ?

বিক্র্য ।—তুমি চিনিবে না ।

শরৎ ।—তুমি অপরিচিত লোকের সহিত কি প্রকারে আসিলে ?

বিন্দ্যা ।—কি প্রকারে আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না ।

শরৎ ।—তোমার আত্মশুদ্ধি সম্বন্ধে তোমার কি প্রকার বিশ্বাস ?

বিন্দ্যা ।—এই কথা বলিবে ? আমি যদি অবিশ্বাসিনী হই, আমি বলিলেই বা তুমি আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন ? আমার উপর তোমার যে সন্দেহ হইতেছে, সে সন্দেহ আমি কি প্রকারে দূর করিব ?

শরৎ ।—তুমি সত্য কথা বলিবে, এ বিশ্বাস আছে ?

বিন্দ্যা । কি প্রকারে বলিব ? আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানি না, তুমিই যখন আমাকে সন্দেহ করিতেছ, তখন আমার প্রতিও আমার সন্দেহ হইতে পারে । কি প্রকারে বলিব ?

শরৎচন্দ্র ক্রোধে স্ফীত হইলেন, সামান্য সংসারী লোকদিগের ত্যায় বলিলেন ; ‘পাপীয়সি ! আপনার মুখেই তুই দোষ স্বীকার করিলি—‘দূর হ’—’ এই বলিয়া পুনরায় বিন্দ্যাবাসিনীকে সেইস্থানে ফেলিয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন ; বিন্দ্যাবাসিনী পুনরায় অচেতন হইলেন ।

আকাশ পরিষ্কার হইল, বৃষ্টি থামিল, নিশি অবসান হইয়া আসিল, নিকটের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে সরিয়া যাইতে লাগিল, পূর্বাধিক পরিষ্কার হইল, পূর্বাধিকের অন্ধকার পশ্চিমে, আরো পশ্চিমে যাইয়া স্থান লইল, বিন্দ্যাবাসিনীর চেতনা হইল না । কত পাখী কত মধুর স্বরে আচ্ছাদে ডাকিল, কিন্তু সে সকল ডাকে বিন্দুর চেতনা হইল না । বিন্দ্যাবাসিনীর হৃৎকের জ্বল ছিঁড়িল না । সেইস্থানে অচেতন অবস্থায় তিনি কষ্টের চক্ষেণ্ড্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা সহ করিতে লাগিলেন । এদিকে শরৎচন্দ্র আর ফিরিয়াও দেখিলেন না

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

স্বদেশাভিমুখে ।

বসন্তকালে কোকিল ডাকিলে যাহাদের মন চঞ্চল হয়, তাহারা শ্রুণয়ের অধস্তন কূপে পড়িয়া সর্কদাই ছট্-ফট্ করে, মনে এক মুহূর্তের জগুও স্মৃতি শাস্তি পায় না । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেম-শুভ্র জীবন, পাশব-জীবনের সহিত তুলনীয় । মানবের উৎকৃষ্ট শিক্ষাই প্রেম, এই প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

যাহারা কুটিল প্রণয়ের অনুসরণ করে, তাহাদিগের মন্তব্য সংসার জলিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হইতেছে, উৎকৃষ্ট মানবজন্ম অসারক্বে পরিচয় দিতেছে। বৃত্তিশূত্র রিপূর উত্তেজনা বড় ভয়ানক, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অভ্যাস দোষেই রিপূর আধিপত্য বিস্তার হয়। রিপুশূনা হইলেই যে উৎকৃষ্ট মানব হইল, তাহা আমরা বলি না; যে মানবদেহ পাইয়াছে, তাহার মধ্যেই রিপু থাকিবে। রিপুকে সংযত রাখিতে পারিলেই মনুমান্ব। যদি সংযত না কর, দেখিতে দেখিতে রিপু তোমাদের উপর একাধিপত্য ক্ষমতা বিস্তার করিবে, তোমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা দেখিবে, সে সকলই মন্ত রিপূর আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইবে; সকলই সেই রিপুচরিতার্থের উপকরণ বলিয়া বোধ হইবে। তখনই প্রেমশূন্য মন্তপ্রণয়ী বলিবে,—বসন্তে কোকিলের ঝঙ্কার শুনিলেই রিপু উত্তেজিত হয়। আর বলিবে—ঐ যে স্নগন্ধযুক্ত পুষ্প প্রক্ষুটিত হইতেছে, ঐ যে মৃচ্ মন্দভাবে অল্পে অল্পে দিক্ ব্যাপিয়া মলয়ানিল বহিতেছে, আর ঐ যে রূপের বাহার, এ সকলই প্রণয়ের উপকরণ। কি যুগিত অসার কথা! প্রেম মানবের সাধনার উপযুক্ত বস্তু, প্রণয় পশুত্ব। এই প্রণয় রিপূর সেবা, প্রেম বৃত্তির পরিচালনা। রিপু চরিতার্থ কর আর না কর, পেম শিক্ষা করিয়া দেখ, ঐ বসন্ত, আর ঐ কোকিল, ঐ মলয়ানিল, আর ঐ প্রক্ষুটিত পুষ্প, সকলই হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিবে, বিষের পরিবর্তে সকল হইতেই অমৃত বর্ধিত হইবে।

জগদীশ বাবু প্রেম সাধন করিতে পারিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি উৎকৃষ্ট প্রণয়ী। বসন্তের কোকিল ও মলয়ানিল, এ সকলের আধিপত্যে জগদীশ বাবুর মন বিচলিত হয়; মালতী দেবীর অদর্শনজনিত কষ্ট, অসহনীয়। কি করিবেন, গবর্ণমেন্টের কৰ্ম ছাড়িয়া দিবার ঘো নাই, তাই এ পর্যন্ত নীরবে পাটনায় ছিলেন। যে দিন শরৎচন্দ্র পাটনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তার পরদিন হইতেই তিনি অস্থির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আরো অস্থির হইলেন, সে পত্রের মর্ম্ম এই,—

“আপনার দ্বারা আমি যে উপকার পাইয়াছি, তাহা বিস্মৃত হই নাই, এ জীবনে কখনও হইব না। আমার জীবনের কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনাকে বলিলে আপনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন, এই ভয়ে আপনাকে না বলিয়াই চলিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আমার জীবনের কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিতে করিতেই যদি এ জীবন শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার নিকট চিরঞ্জনী থাকিয়াই মরিব। কি করি, জীবনকে বিক্রয় করিয়া, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে কখনও শিক্ষা করি নাই,—কখনও শিক্ষা করিব না।

‘আপনি আমার পারিবারিক সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, সে কাহিনী আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন কি না, জানি না, তবু এই সময়ে আপনাকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

‘আপনার ভাগিনেয় অবিনাশচন্দ্র আমার সুহৃদের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পুত্র। আমার আর চারিটা সহোদর বর্তমান আছেন; শিতা, মাতা, কেহই জীবিত নাই। আমার একটা বিধবা ভগ্নী আছে, তাহার নাম নীরদা,— নীরদা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার মন অটল, না হইলে সমাজ-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, তাহাকে আবার বিবাহ দিতাম, কিন্তু নীরদা সে প্রকার মেয়ে নহে। আর আমার বিবাহ? বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনি একদিন অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; বাস্তবিক ধরিতে গেলে, আমার বিবাহ হইয়াছে। বিদ্যাবাসিনী আমার শৈশব-সহচরী,—যৌবনের ভূজঙ্গিনী। এ সকল কর্কশ কথা লিখিলাম কেন? একমাত্র কারণ, আমি বিবাহ করিয়া একদিনও সুখ পাই নাই, বিবাহ-সুখ আমি স্বীকার করি না।’

‘আমি কোথায় চলিলাম, তাহা আজও বলিলাম না, বোধ হয় শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। তবে অদ্য বিদায় হই।’ স্নেহাকাজ্ঞী—শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের পলায়নের ১৫:১৬ দিন পরেই অগদীশ বাবু শরৎচন্দ্রের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন—শরৎচন্দ্র বালকত্ব-শূন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সজীব পুরুষ; বুঝিলেন, রাজনীতি তাঁহার জীবন ভূষণ; যুদ্ধশিক্ষা এবং বীরত্ব তাঁহার চিত্তবিনোদক। ভাবিলেন, বীর পুরুষদের হৃদয় কঠিন না হইলে কি প্রকারে প্রজ্জলিত বহ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিবে? ভাবিলেন, হতভাগিনী বিদ্যাবাসিনী মালতীর অপেক্ষাও দুঃখিনী।

এদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। মে মাস অতীত হইতে না হইতেই বারাণসীর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। বারাণসীর শ্রায় মহা-শ্মশান আর কোথাও নাই;—এই শ্মশানে মহাপরাক্রমশালী শিক বংশের অধঃপতন, এই শ্মশানে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরমদীপা, এই শ্মশানে দিল্লির সম্রাট-গণের শেষ জীবন-অভিনয়! এখানে না আছে, এমন কিছুই নাই! যোগন,

মহারাত্রি, সিপাহি, সকল জাতির ক্ষমতা ও প্রভুত্ব এইখানে ধ্বাবলুপ্ত ! ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বারাণসীর শ্মশানে অগ্নি জলিবে না, ইহা বাহারা ভাবিতে পারেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও রাজনীতির কঠোর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও ক্রীড়া কোঁতুকে মত্ত । যেখানে এত প্রজ্বলিত অগ্নি ভস্মে পরিণত হইতেছে, সেই শ্মশান যে এই সময়ে একু-বারে নির্ঝাঁপ থাকিবে, তাহা কল্পনার অতীত । বাস্তবিক বারাণসী এই সময়ে নীরবে ছিল না । জুন মাসের তিন দিন অতীত হইতে না হইতেই আজিম-ঘরে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয় । এই ঘটনার সংবাদ পাটনার পৌঁছিলে, তথাকার সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া দিক্দিগন্তরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারীগণ ভয়ে জীবন বাচাইবার জন্য অগ্রেই পাটনা নগর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল । জগদীশ বাবু নিতান্ত ভীৰু, তিনি অগ্রে পাটনা ছাড়িলেন । পাটনা ছাড়িবার সময় এত ভ্রস্ত ছিলেন যে, কোথায় যাইবেন, তাহাও ঠিক করিতে অবসর পান নাই । কল্পনায় একটা স্থান ক্রীড়া করিতেছিল, মনে সন্দেহই জাগরিত ছিল, সেই বিপদের অবলম্বন, সুখ-স্বপ্নময় স্বদেশ, আজ সেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সক্ষম নহি । এই স্বদেশে জগদীশ বাবুর শৈশবে পিতা মাতার অভিনয়,—কত প্রীতিকর, কত সন্তোষজনক ! সেই জন্মভূমি,—বালা কালে সুখ-সমৃদ্ধির হিল্লোলেপূর্ণ ছিল, দূরদেশ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী যাইবার সময় কত সুখকর বোধ হইত ! জন্মভূমি শৈশবের আনন্দবর্ধক,—বালাকালের সুখের লীলা-স্থল,—আর যৌবনে ? যৌবনে যোগিনীর সহিত মিলনের মধুময় স্থান !—জন্মভূমি কত সুন্দর, কত মনোহর,—মন হইতে এক দিনের তরেও সেস্থান অবসর লয় না ; কল্পনারও কত সুখ ! বৃদ্ধের ধর্মসাধনের উপযুক্ত আবাস ভূমি !—কে জানিবে, জন্মভূমি কত প্রীতিকর ? এত সাধের জন্মভূমি দিন দিন বখন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তখন জগদীশ বাবুর মন কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিল । তবুও এখন কিছু নাই,—তবুও সময়শ্রোতে পূর্ব্বের যে সকল আদরের বস্তু ভাদিয়া গিয়াছে,—আর সে শৈশব নাই, আর সে শৈশব-সহচর নাই, আর সে বালাকাল নাই, আর সেই বালাকালের আশ্রয় নাই ! আবার যৌবন ? যৌবনও যায় যায় হইয়াছে ! কিন্তু স্মৃতি ত যায় না । যতদিন স্মৃতি, ততদিন

জন্মভূমির আদর! আর মৃত্যু সময়ে? সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিয়া দেখ, আর কোথাও মরিতে অভিলাষ হইবে না; সেই জন্মভূমিতে শয়ান—নাড়া ক্ষৌণ, অঙ্গ শীতল—সংসার-আশা তিল তিল করিয়া বাইতেছে, চতুর্দিকে স্বদেশী অস্বীয় বন্ধু বান্ধব উপবিষ্ট—সেই মৃত্যু সময়েও কত সুখ! জগদীশ বাবুর পিতা নাই, মাতা নাই!—আর মালতী? মালতী আজও জগদীশ বাবুর জন্ত জন্মভূমিকে স্বর্গ সুখের উপযোগী করিয়া রাখিতেছে কিনা, কে জানে? জগদীশ বাবু জানেন না, মালতী মৃত্যু কি জীবিতা; তবুও স্বদেশের দিকে বিপদের দিনে ধাবিত হইলেন। জগদীশ বাবু এবার ঠিক করিলেন, মালতীকে না দেখিলে প্রাণত্যাগ করিবে। ভাবিলেন, “তবুও স্বদেশে মরিব। যেস্থান হইতে এই শরীরের উৎপত্তি, সেই প্রিয়তম স্থানে এই শরীরকে বিলীন করিব!” এই প্রকার ভাবিয়া জগদীশ বাবু স্বদেশের দিকে চলিলেন, জগদীশ বাবু ঢাকায় পৌঁছিয়াই এক বিপদে পড়িলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

দীপ নিবিল ।

কাঞ্চনপুর, বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ভিতর, সূর্যাস্তের সময় একটা লোক, ব্যস্ততা সহকারে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে কোটরদ্বার অতিক্রম করিয়া একখানি পর্য্যটকের নিকট দাঁড়াইলে, কেহ যুহু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘অনুসন্ধানের শেষ ফল কি হইল?’ সেই লোকটির শ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, বলিল—শেষ ফল, জগদীশ বাবুকে পাওয়া যায় নাই,—সকল লোকই ফিরিয়া আসিয়াছে।

পর্য্যটকে একটা পীড়িত স্ত্রীলোক শয়ান ছিল, উত্তর শুনিয়া তাঁহার শ্বাস দীর্ঘ হইল, কথা বলিতে কষ্ট হইলেও বলিলেন, ‘তবে আমার আর বিলম্ব নাই।’ কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; দূরস্থ ধমনী নিস্তেজ হইল, চক্ষু দাঁড়াইল, জীবনেব শেষ অভিনয়ের পূর্ব লক্ষণ সমূহ স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নিকটস্থ বৈদ্য বলিল,—এইবার বাহির কর।

বলিতে বলিতেই চতুর্দিকের লোকেরা জীবনের শেষক্রীড়া সম্পন্ন করিবার মানসে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল। ঘরের মধ্যে

সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পাড়ার লোক সকল বিপদ গণনা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলের চক্ষু হইতেই জল পড়িতে লাগিল।

চক্ষের জল কাহারও আপনার বশে নহে, পড়িলার সময় চক্ষুই পড়িলেই পড়িবে। তোমার বৈরাগ্য গুণ আছে, তুমি সেই জল অঞ্চল দ্বারা আপনা আপনি মুছিতে পার, কিন্তু জল পড়িলেই পড়িবে। মানব স্নান সময়ের মধ্যে যত লীলা খেলা করে, তাহার মধ্যে মৃত্যুই নখনীর পতনের সময়। এত যত্নের মানবলীলার অভিনয়ের শেষ পটক্ষেপণ,—এত সাধের, এত আড়ম্বরের, এত আশার এই শেষ ফল,—শেষ লীলা! আর দেখিব না—কেহ কখনও দেখে নাই, এই পটের অপর ধারের অভিনয় আর পঞ্চাশ কাহারও নয়নকে জুড়ায় নাই; এখানে কল্পনা পরাস্ত হয়; ভাবিতে বিশেষে সময় হ্রাসে আসন্ন হয়, নৈরাগ্য আসিয়া আপনা আপনি নয়ন হইতে জল ঝরাইতে থাকে। সংসারে এই উন্নতির শেষ, এই মানবজন্মের অহঙ্কারে শেষ সীমা কাহার নয়ন জলে প্রাণিত না হয়? আজ বাহা দেখিলাম, কাল আর ভাঙ্গা দেখিব না, এজন্মে আর সে দৃশ্য নয়ন-পথে পড়িবে না, এজন্মে আর সেই মৃগ-মাথা বদন-হাসি দেখিব না! আজই শেষ, চিরকালের মত এই শেষ, এ জন-মের সাধ এই মিটিল; ইহা ভাবিতে জানিলে, কাহার চক্ষে না জল আসে? ধর্মজীবনের চিরমঞ্চিত আশাভরসা এই স্থানে পরাজিত। কে বলিতে পারে, আবার পরকালে নিশ্চয় মিলন হইবে? অন্ধকার—জ্ঞানচক্ষুর অতীত; কাহার মন, এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মৃত্যুকালের চক্ষু-জল নিবারণ করিতে পারে? সব অকারণ,—বোদনে ফল নাই? এ সকল জ্ঞানের কথায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি নিবারিত হয় না; এতদিন দেখিলাম, আর দেখিবনা, এ শোক অনিবার্য। সহ্য করা পরের কথা; আমবাও জানি, চক্ষের জল চিরকাল পড়ে না; কিন্তু সাময়িক বেগ নিবারণ করে, কাহার সাধ্য?

মৃত্যু-স্মরণে জীবিত ব্যক্তির মন, ধর্মের জন্য তৃষিত হয়; ধার্মিকের মন পবিত্র হয়, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু পাবাণ ব্যতীত সকলের মনই অশ্রু হয়; সকলের মনই ক্ষণকালের জন্য সংসার অর্ধবর্ষের কল্পনায় অস্থির হয়।

এই নবীনা স্ত্রীলোকটির অসাময়িক মৃত্যু ঘটনায় সকলেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কেবল একজন লোক দেখা গেল, কাহার চক্ষু হইতে জল পড়িল না;

সে জীলোকটির মাতা । মাতার প্রথম উচ্ছ্বাসের শোক ক্রন্দনের অতীত ; যখন শোক ক্রন্দনের সীমার পৌঁছে, তখনই শোকাগ্নি নির্ঝাঁপিত হইয়া আসিতে থাকে ।

রজনী বাবুকে কারাগারে লইয়া গেলে পর, মালতীদেবী ভূতলে পড়িয়া ক্ষেতেচন হইলেন ; হরগোবিন্দ চক্রবর্তী রজনী বাবুর আদেশানুসারে তাঁহাকে স্তম্ভা করিয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত রাখিয়া গেলেন । কাঞ্চনপুরে আসিয়াও মালতীর মন সুস্থ হইল না ; যে ছুর্কিসহ মনঃকণ্ঠে মালতীদেবী ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন, সে কণ্ঠ এখনও মনকে দগ্ধ করিতেছে । মালতীদেবী দিন রাত্রি বসিয়া চিন্তা করেন, কাহারও সহিত আলাপ করেন না—কেবল ভাবেন—রজনী বাবুর দুর্দশা । সেই দুর্দশার কথা মনে হইলেই মন অস্থির হয়,—সেই শিশু, সেই জগদীশ বাবুর প্রতিবিম্ব—আর সেই জগদীশ বাবু । এই সকল ভাবিতে ভাবিতে শরীর শীর্ণ হইল, অবশেষে ঘোরতর পীড়া আসিয়া আক্রমণ করিল । ঘোরতর পীড়া আক্রমণ করিল, দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া মালতী দেবীর জীবনের আশা চলিয়া গেল ; মৃত্যুকে মালতী দেবী এই ছুর্কিসহ কণ্ঠের হাত হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র অবলম্বন ঠিক্ করিলেন । মৃত্যুও সময় বুঝিয়া সংসারের কণ্ঠ, সংসারের যন্ত্রণার হাত হইতে মালতীকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল । আর এক মুহূর্ত্ত,—আর এক মুহূর্ত্ত পরে মালতীর অস্তিত্ব লোপ হইবে ।

সধবা জীলোকের মৃত্যু সময়ে স্বামী নিকটে থাকিলে বড় সৌভাগ্য । তাঁহার পুত্র থাকে, তাঁহার ত কথাই নাই, পুত্র না থাকিলে স্বামীই মুখে অগ্নি প্রদান করে । মালতী দেবীর পীড়া যখন মারাত্মক হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ বাবুর অমুসন্ধানার্থ ৩।৪ জন লোক স্থানে স্থানে প্রেরিত হইল ; জগদীশ বাবু ইতিপূর্বে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি পাটনাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, তজ্জন্য সকলের পূর্বে পাটনায় লোক প্রেরিত হইল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাটনার লোক তাঁহার অমুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল । তার পর কলিকাতা এবং ঢাকায়ও লোক পাঠান হইল, তাহারাও নৈরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল । মালতী দেবী মৃত্যুশয্যার শুইয়াও জগদীশ বাবুর আশা পরিত্যাগ করেন নাই, যখন তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, তখন তিনি আশ্বাসিত হইয়া একটু সুস্থ হইয়া-

ছিলেন। মন স্তম্ভ হইলে পীড়ার পরাক্রম কথকিত পরিমাণে হ্রাস হয় ; মালতীদেবীও একটু স্তম্ভ হইলেন ; যে দিন পাটনার লোক কিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতেই তিনি নৈরাশ হইলেন, পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল। আজ সেই পীড়া মৃত্যুর অভিনয় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত ; হতভাগিনী মালতী আজ এ সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিবে !! মালতী দেবীর স্পন্দহীন দেহ বাহিরে আনীত হইল,—চক্ষু দাঁড়াইল, কর্ণ দীর্ঘায়তন প্রাপ্ত হইল, হস্ত পদাদি সহসা একবার প্রসারিত হইয়া পড়িল, আর নড়িল না ; মুখদ্বারা বারম্বার ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল ; এসময়েও কথা বলিবার একটু শক্তি ছিল, অতি কষ্টে বলিলেন—‘আমার—র,—র’ কতকণ পর্য্যন্ত মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, আবার শ্বাস সকলের ভাড়া বৃদ্ধি পাইল, দস্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন,—‘এখনও আসিল—না—না ?’ আবার মুখ বন্দ হইল, চক্ষু মুদিত হইল, বৈদ্য ভাব দেখিয়া বিষাক্ত ঔষধ উদরস্থ করাইবার জন্ত চেষ্টা দেখিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না ; মালতীর দস্তে দস্ত দৃঢ়তর আবদ্ধ, ঔষধ মুখ ভাসাইয়া পড়িয়া গেল। কতকণ পর কবিরাজ বিরক্ত হইয়া বলিল, ‘তোমরা মুখ খুলিয়া ধর, আমি ঔষধ মুখে ঢালিয়া দেই। নিকটস্থ আয়ুর্বিদগণ তাহাই করিল, বৈদ্য ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু মালতীর মুখ মেলিল না ; মুখ বেদ্য বলিল—‘মালতীর মৃত্যু হইয়াছে।’

চতুর্দিকে গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। গৃহের ক্রন্দন ধ্বনির সহিত বাহিরের বিলাপধ্বনি একত্রিত হইয়া গগনে উঠিল। কেহ কেহ পরোপকার করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, ‘সৎকারের’ আয়োজন করিবার জন্ত ব্যস্ত হইল।

দিন গেল, রাত্রি আসিল। অন্ধকার রজনী, দুই একটা ক্লীণালোক জ্বলিতেছে, মালতীর নিকটে কেবল একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উপবিষ্ট।

অনেককণ পর মালতীদেবীর শরীর আবার নড়িয়া উঠিল, চক্ষু সহসা উন্মীলিত হইল, আন্তে আন্তে কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন।—এবার বাক্য ফুটল, বলিলেন, “অস্তিম্বে—পতির মুখ—দর্শনে—না মিলিল।’

আরো অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, মুখ হইতে আর শব্দ বাহির হইল না ; মস্তক কম্পিত হইল, মুখ বিকৃত করিয়া বহুকষ্টে অক্ষুট শ্বসে বলিলেন—‘মনের—যাতনা মন—মনেতেই রহিল।’

কি আশ্চর্য্য ! মৃত ব্যক্তি কথা বলিতেছে ? ইহা ভাবিয়া, অনেকে ভুতের

আশঙ্কা করিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামময় এই কথা ছড়াইয়া পড়িল।

নিকটের স্ত্রীলোকটি দীপ উচ্কাইয়া বলিল—‘মা ! কি বলিতেছ ?’

এই অস্থিম সময়ে সহসা একটা লোক উপস্থিত হইল। অনেক খবর বহিয়া আনিয়া খলিল—‘জগদীশ বাবু আসিয়াছেন। মালতীর কর্ণে শব্দ গেল, মালতী আবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

জগদীশ বাবু বাড়ীতে পৌছিয়াই শুনিয়াছিলেন, ‘মালতী আজও জীবিত আছে। ইহা শুনিয়াই তিনি কাঞ্চনপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কাঞ্চনপুর জগদীশ বাবু বাড়ী হইতে এক প্রহর পথের ব্যবধান।

জগদীশ বাবু আসিয়া মালতীর মৃত্যু-শব্দ-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মালতীর জীবন প্রদীপ নির্ঝাণোন্মুখ দেখিয়া আঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কণা বলিতে পারিলেন না ; একদৃষ্টে মালতীর মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মালতী দেবীও প্রেম-দৃষ্টিতে জগদীশ বাবুকে দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া নীরবে নয়ন মুদিত করিলেন। এ দৃশ্য জগদীশ বাবুর প্রাণে বিধিল, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রেম উৎস উগলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে মুহু মুহু, ক্রমে ক্রমে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল, মালতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—‘মালতি ! মালতি ! জীবনের সুখের বাসনা কি এই স্থানেই শেষ হইল ?’ একে একে সকল কথা জগদীশ বাবুর মনে পড়িল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

মালতীর চক্ষু বুজিল, বারম্বার মুখ বাদান করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ স্ত্রীলোকটি মুখে জল ঢালিয়া দিল, জল উদরস্থ হইল না, গগনস্থ ভাসাইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কথা বলিবার শক্তি থাকিলে, মালতী দেবী কথা বলিতেন, কিন্তু কথা ফুটল না ; শুষ্ক কণ্ঠনালী দ্বারা কেবল দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে কদম্ব অতীত হইলে, মালতীদেবী আবার একটু চাহিলেন।

জগদীশ বাবু বলিলেন, ‘মালতি ! আমি আসিয়াছি !’

মালতী দেবী ক্র-কুঞ্চিত করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, উত্তর করিলেন না। জগদীশ বাবু পুনরায় বলিলেন—‘মালতি ! এখন কেমন বোধ হইতেছে ? আমি আসিয়াছি।’

এবার মালতী দেবীর মুখ খুলিল, বিরক্তি সহকারে বলিলেন—‘আসি-

য়াছ ? কিন্তু যখন আসিলে আমি বাচিতাম, তখন আসিলে না ! এখন তোমাকে দেখে আমার আরো কষ্ট হইতেছে ।

জগদীশ বাবুর চক্ষু হইতে জল পড়িল, বলিলেন, 'মালতি ! তুমি চলিলে ? মালতী দেবী আবার বলিলেন, এতদিন পরে আমি তোমার মনো-বাহা পূর্ণ করিলাম !

জগদীশ বাবুর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, হৃদয়-গ্রস্থি সহসা যেন ছিন্ন হইল, বলিলেন—'মালতি ! আমি কি তবে তোমার শত্রু ছিলাম ?

মালতী দেবী এবার বলিলেন, না—তুমি আমার শত্রু ছিলে না ; পূর্বে তোমাকে দেখিলে এ হৃদয় শীতল হইত। তুমি চিরকালই আমার হিতৈষী। আমি এখন মরিতে বসিয়াছি, আমার ইহাই সুখ ; তুমিও আমার স্মৃতি সন্তুষ্ট হও, এই প্রার্থনা। যদি সন্তুষ্ট না হও, তবে নিশ্চয় তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার উন্নতির পথের কণ্টক ছিলাম। আমার এই আনন্দের সময় যদি তুমি দুঃখিত হও, তবে তোমাকে শত্রু বলিব না কি বলিব ?

জগদীশ বাবু অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন—'মালতি ! আমাকে কি অপরাধে ছাড়িয়া চলিলে ?

মালতী দেবী শেষবার অতি কষ্টে বলিলেন—তোমার আর কি অপরাধ ? আমার অপরাধেরই ফলভোগ করিতেছি। তোমার কি অপরাধ ? মরিবার সময় কাহারও অপরাধ বৃদ্ধিবার ক্ষমতা থাকে না,—আমি জানি না, কেন অপরাধে আমার এত কষ্ট হইতেছে। মরিতে বসিয়াছি, সে জন্ত কষ্ট নাই, সংসার ছাড়িয়া চলিয়াছি, সেইজন্ত একটুও কষ্ট বোধ হইতেছে না, জীবনের অবশিষ্ট বাসনাও তোমাকে দেখিয়া পূর্ণ হইল ; কিন্তু তবুও কষ্ট নিবারণ হয় না। নাথ ! তোমার চরণে যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমাকে ক্ষমা কর, আমার আর কষ্ট সহ্য হয় না।

জগদীশ বাবু ক্ষণকাল নারবে থাকিয়া বলিলেন—'মালতি, কি প্রকার কষ্ট ?'

কি প্রকার কষ্ট, তা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ? মরিবার পূর্কের কষ্ট কি প্রকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। যদি কেহ মরিয়া আবার বাচিয়া থাকে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও, 'কি প্রকার কষ্ট ? এই বলিয়াই মালতী দেবী জগদীশ বাবুর কর ধরিয়া বলিলেন—নাথ ! আমি চলিলাম—আমার অপরাধ ক্ষমা করিও ।

জগদীশ বাবুর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, প্রেমাক্রম নিমেষ মধ্যে শত শত-বার পড়িল, বারম্বার ডাকিলেন—‘মালতি ! মালতি !!

মালতী দেবী আর কথা কহিলেন না, জীবন-দীপ এই ধানেই নির্কাপিত হইল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কণ্টকিত পথে ।

বিদ্যাবাসিনীর পবিত্র স্বভাব-চিত্রে পাপ-রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, এবিষয়ে যখন শরৎচন্দ্রের আর সন্দেহ রহিল না, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে অসহায়্য বিন্দুকে সেই কাননে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন ।

রজনী প্রভাত হইলে, তিনি আপন গম্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পূর্বদিনের ঘটনা সকল মনে হইতে অপসৃত হয় নাই ; ইঞ্জিয়ের দাস মানব—মনে ভাবিতেছিলেন—“সংসারে ভালবাসা নাই, আমি বিদ্যাবাসিনীকে এত ভালবাসিতাম, কিন্তু বিন্দু আমাকে চরণে ঠেলিল ! কে বলিবে, এই ভালবাসা কি প্রকার ? আমি বিন্দুকে ভাল বাসিতাম, কিন্তু তাহাকে বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম কেন ? ভালবাসার অর্থ কি, বুঝি না ? আমি তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সেও নয় আমাকে চরণে ঠেলিল, তাতে আমার মনে কষ্ট হয় কেন ? বিপুল প্রণয় কি ? যে প্রণয়ে মুহূর্ত্তকাল অদর্শন সহ হয় না, তাহা কি বিপুল প্রণয় ? তাহাই যদি হয়, তবে প্রণয়ে কি সুখ ? সমস্ত জীবন কেবল প্রণয় লইয়া থাকিব ? আর কোন কর্তব্য নাই, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই ? ভালবাসিতে হয়, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিব, প্রণয় প্রার্থনীয় হয়, সমস্ত জগৎকে প্রণয়ে বাঁধিব । একদিনও সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে রাখিব না । কিন্তু আবার মন অস্থির হয় কেন ? যে সঙ্কীর্ণ প্রণয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্তও সুখ পাই নাই, তাহারই অমুরোধে বিন্দুকে দেখিতে এত অভিলাষ হইল কেন ? বিন্দু আমাকে কি সুখ দিয়াছে ? যে সুখ আমি অধারনে পাইতাম, যে সুখ আমি দেশের কথা কল্পনার ভাবিয়া পাইতাম, সে সুখের সহিত কি বিন্দুর প্রণয়-সুখের তুলনা হয় ? তবে কেন ভুলিলাম ? মুহূর্ত্ত

পূৰ্ণ রজনীতে কেন আমার প্রণয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যাবাসিনীর কথা স্মৃতিতে পড়িল ? রমণীর কি মনোমোহিনী শক্তি ! মনকে এককাল দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য হইলাম না ? এককাল হইলাম না, তবে আর কবে হইব ? আমার প্রণয়ের সুখ কল্পনা করি কেন ? অথবা আমার মত সংসারের সম্পূর্ণ বিপরীত । এই প্রণয়ের জন্ম, সকলই ত লালায়িত । বোধ হয়, তাহারা এই দর্শনমাপেক্ষ প্রণয়ের মধুরতা বুদ্ধিতে পারিয়াছে । আর আমি ? আমি একদিন, এক মুহূর্তের জন্মও এই প্রণয়-সুখ পাই নাই, একদিনও বিন্দুকে দেখিয়া সুখী হই নাই ! তবে মন ভুলে কেন ? জীজ্ঞাসিত্তে কি সুখ, তাহা একদিনও বুদ্ধিতে পারি নাই ! তবে বুদ্ধিগাছি, মনের সংপ্রবৃত্তি বিনাশ করিবার জীই একমাত্র সহায়, জীবনের সুখ-সেতু ডাকিবার জীই প্রণয়ই একমাত্র শাণিত অস্ত্র, পবিত্র সরল মনে চিন্তার মেঘ উঠাইবার প্রতিকূল বায়ু, ধৰ্ম্মজাহাজ ডুবাইবার একমাত্র ভীষণ তরঙ্গ । এই সুখশূন্য তরঙ্গে বঙ্গদেশ ডুবিয়াছে, আর আমি শরৎচন্দ্র, সুখ না পাইয়াও ডুবিতে বসিয়াছি ।

আবার ভাবিতে লাগিলেন,—“জীই প্রণয়ে সুখ, বড়ই আশ্চর্য্য কথা ! সংসারে যদি নরকভোগ থাকে, তাহাই এই জী সহবাস, তাহাতে কি সুখ ? কে বলিবে, কি সুখ ? আমি এতদিন সংসারে ভ্রমণ করিয়া একদিনও জীসহবাসে সুখ পাই নাই । সুখ পাই নাই, কিন্তু বিড়ম্বনা যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি । আমার মনে বিলাসের ইচ্ছা কেন হইত ? ভাল কাপড় পরিব, ভাল বেশে থাকিব, এ ইচ্ছা হইত কেন ? আমাকে দেখিয়া সুখী হইব বলিয়া ? কই সে ইচ্ছা ত ছিল না । যে মুখের সৌন্দর্য্য আপনি দেখিতে পাই না, সে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দর্পণ ধরিয়া কেন সাজাইতাম ? কেন কৃত্রিম শোভায় ভূষিত হইতাম ? কেন সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতিতাম ? এখন বুদ্ধিতে পারিয়াছি, কেবল জীই মন বাধিবার জন্য । জীই মন ধরিবার জন্য আমি বিলাসের দাস হইয়াছিলাম ! অবশেষে মনে ভাবিতাম, রৌদ্রে বাহির হইলে বর্ণ স্নান হইয়া যাইবে । তজ্জন্য আর রৌদ্রে বাহির হইতাম না ; ক্রমে ক্রমে আমার রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল ! প্রথমে সর কাপড় পরি-তাম, বিন্দুর বনতুটীর্থ ; কিয়ৎদিন পরে তাহাই আমার শিক্ষা হইল, অবশেষে আমি মোটা বস্ত্রের ভার সহিতে পারিতাম না । এই প্রকারে এক প্রণয়ের সেবার আমি বিলাসের দাস হইয়া পড়িলাম । এখন আমি পরীক্ষার ফেল

হইলাম, তখন আমার মনে জাগিল,—ভবিষ্যতে আমার বিলাসের এ সকল পদ কে বোগাইবে ? এই ভাবিয়া দেশ ছাড়িয়া, মনের বাসনা পূর্ণ করিতে আঁ লাম ; তখন ভাবিয়াছিলাম, এই দেহ, এই শরীর দেশের জন্য বিদর্জন করিব । ইহাপেক্ষা মানবজীবনে আর কি সুখ আছে ? তবে কেন আবার ভুলিলাম ? কেন আবার সেই প্রণয়ের কথা মনে পড়িল ? দুর্বল মন কেন এখনও সবল হইল না ? কেন বিলাস-প্রিয়তাকে আজও উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না ?”

“এ সংসারে বিন্দু আমার কে ? আমার সুখের কণ্টক,—হৃৎখের সোপান ! আমি কেন এই হৃৎখের সোপানে উঠিলাম ? কেন আমার জীবনের কর্তব্য কার্য্য ভুলিয়া এই সময়ে বিন্দুর অনুসরণ করিলাম ? আমি বাঙ্গালী তাই যুক্তি আমার মন এত অসার ? বিন্দুর জন্য আমার মন অস্থির হয় কেন ? এ সংসারে আমার সকলই, অথচ কেহই আমার নহে । আমার বাহা তাহা ত আছেই, তবে আবার মন অস্থির হয় কেন ? আমি বাহাকে আপন ভাবি, সে আমাকে আপন না ভাবিলে, মন হৃৎখে অবসন্ন হয় কেন ? আমার মন দুর্বল, তাই এ সকল বিষয় এতদিন ভাবি নাই,—কিন্তু এখন দেখিতেছি, বুঝিতেছি, বিন্দুর জন্য আমি অস্থির হইব কেন ? যদি তাহাকে আপন ভাবিয়া থাকি, তবে চিরকাল ভাবিব । সে আমাকে আপন না ভাবিলেও মনকে অস্থির হইতে দিব না । সে আমাকে তাহার মন দিল না বলিয়া, আমি হৃৎখিত বা নৈরাশ হইব কেন ? বিন্দু আমার কে ? না—ভালবাসার বস্তু,—প্রেম শিক্ষার মূল মন্ত্র । ভালবাসা স্বর্গের জিনিস । বিন্দুকে যদি আমি ভালবাসিয়া থাকি,—সে ভালবাসা ত আছেই, তবে এখন মন অস্থির হয় কেন ? বিন্দুর চরিত্রে কলঙ্ক রেখা উঠিয়াছে ? যদি তাই হয়, তাতেই বা আমার ভালবাসা যাইবে কেন ? বিন্দুর মন আমার হটুক বা না হটুক, তাতে আমার কি ? তাহাকে যদি ভালবাসিয়া থাকি, তবে কেন আজও বাসিব না ? মন ! বল ত কেন চঞ্চল হও ? বিন্দুর মন অস্তুর, আমার স্বার্থের কণ্টক, তাতে তোমার ভালবাসিতে বাধা কি ? দোষ দেখিলে যে ভালবাসা টিকে না, তাহা আমি চাই না । দোষশূন্য গুণাধার মানুষ কোথায় ?”

“এতদিন ভাবিতাম, আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের । কত বন্ধুর সহিত এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতাম । আমার ভালবাসা স্বার্থযুক্ত, তাহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিত না । এখন আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছি,

আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের ছিল না। আমি আজও নিঃস্বার্থ ভালবাসার মৰ্ম্ম বুঝি নাই; না হইলে 'বিন্দু অশ্রুকে মন দিয়াছে,' তাতে আমার কষ্ট হইতেছে কেন? আমি স্বার্থের আশা ছাড়িয়া যদি কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত ভালবাসিতে না শিখিলাম, তবে আর আমার সাধনা কি? বিন্দুর মন এখন আমার নহে, এ কথায় আমার কষ্ট হয় কেন? আমি কেন বিন্দুকে ফেলিয়া আসিলাম? আমার হৃদয়ে কেন ক্রোধ হইল? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমার স্তায় নরাদম আর নাই।"

"মন দুর্বল, এ সকল কথা ভাবিলেও মন প্রবোধ মানেন না। নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে নাই; রিপূত্র আধিপত্যে মাহুষ যখন মাতিয়া উঠে, তখনই মৃগতৃষ্ণিকার স্তায় এই ক্ষণস্থায়ী অসার প্রেমজলে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা কখনই পূর্ণ হয় না, সে তৃষ্ণা কখনই মিটে না। কিন্তু তবুও সতর্ক হইয়া চলা যায় না। কে না জানে, মৃগতৃষ্ণিকায় পতিত হওয়া বড়ই দুঃখকর? কিন্তু সকলই মনের দুর্বলতা প্রযুক্ত, এই ভ্রমে পতিত হয়। আমিও বাহা মনে ভাবি, তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি কই? এখন বোধ হইতেছে, যদি আমার জীবনের প্রথম দিন পাইতাম, তাহা হইলে, এখন হইতে সতর্ক থাকিতাম। কিন্তু রূতকার্য্য হইতাম কি না, কে জানে? যা'ক, সে সকল আর ভাবিব না। সমস্ত সংসারকে প্রেমে আবদ্ধ করিব, তা দূরে থাকুক, একজনকেও নিঃস্বার্থ রূপে ভালবাসিতে পারিব না? আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থের হইল না কেন? বিন্দুর চরিত্রে দোষ আছে থাক, আমি তাহাকে চিরকাল একই ভাবে ভাল বাসিব। নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে মন কখনই অল্পে প্রলয় গণিত না। বিন্দুকে যদি আমি নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে, অদর্শনে আমার কষ্ট হইত না। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ-সাধনের উপায় যে ভালবাসার রঞ্জিতে আবদ্ধ, সেই ভালবাসাই দণ্ডে দণ্ডে প্রলয় দেখে, অল্পেই প্রণয় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় মজে। হায়, কতদিনে আমি নিঃস্বার্থ প্রেমের দাস হইতে পারিব?"

"মহুষ্য চরিত্র, বিচিত্র, কেন যে মত্ত হইয়া চিরকালের সুখ-পথে কণ্টক রোপণ করিতে যত্ন করিতেছি, তাহা কিছই বুঝি না। কেন আমি ভুলিলাম, — যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কেন আমার মনে বিন্দুর রূপ প্রতিবিধিত হইল? কেন আমি সকল কথা ভুলিয়া সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইবার দ্রষ্ট

কঁাদ পাতিলাম ? আমার শরীর মন অস্থির হয় কেন ? সংসার-মুখকে কেন এত আদর করি,—অথবা আমি নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্মে কেন আজও বুঝিলাম না ?”

“সংসারের ভালবাসা নির্দিষ্ট সীমার আবদ্ধ ; যাই সমস্ত স্বার্থের পথে কণ্টক পড়ে, ‘অমনিই সেই ভালবাসা যাইয়া অন্যে বর্তে। ভালবাসার সহিত স্বার্থের সংশ্লিষ্ট মিলন। আমি কেন এই নিয়ম ছাড়া হইতে পারিলাম না ? কেন স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িয়াছে বলিয়া ক্রোধে অস্থির হইতেছি ? অথবা মন কেনই বা এত নিস্তেজ যে, প্রণয় ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে ইচ্ছা হয় না ?”

“বিন্দুকে যদি কখনও ভালবাসিয়া থাকি, তবে চিরকাল বাসিব। দূর হউক,—যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের কথা মনে হইলে শরীর বিকম্পিত হয় ; কেন নারীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইলাম ? জানিলাম না ত কেন আবদ্ধ হইলাম ? কেন ইচ্ছা করিয়া জীবনকে অস্ত্রের করে সমর্পণ করিলাম ? ষিক্ আমার জীবনে ! ষিক্ মনুষ্যত্বে !”

“আমি কি জন্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ? আমার জীবনের কর্তব্য কার্য কি করিলাম ? শরীর সিহরিয়া উঠে,—আমার জীবনের অভিনয় শেষ হইয়া আসিল, আর কদিন বাঁচিব, বাঁচিয়া আর কাজ কি ? যাহার জীবন কেবলই ইন্দ্রিয় সেবার জন্ত,—পশুত্ব প্রচার ভিন্ন যাহার আর কোন কার্য নাই, তাহার বাঁচিয়া কাজ কি ? যাহার দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকার হইল না, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা। আমি বাঁচিতেছি কি জন্ত ? মরিলে আর এ সকল ছঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না ; আর ঘৃণিত স্ত্রীজাতির পদমেঘা করিবার জন্ত, জীবনের কর্তব্য-কার্যের প্রতি অবহেলা করিয়া, ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে হইত না ! সংসারে আসিয়া কি করিলাম ?—জীবনের কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলাম না ত কেন বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ? আমার জীবনে ষিক্, জন্মে ষিক্ ! যাই এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? আর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিব না ! যতদিন মনের বাসনা পূর্ণ না হইবে, ততদিন সংসার, আশ্রয়, পরিজন, সকলকে ভুলিয়া সেই পাক্তীয় প্রদেশে সময়াতিপাত করিব।”

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে শরৎচন্দ্র জীবনের ভাবী কর্তব্য কার্য-

ক্ষেত্রের দিকে একাগ্রমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সখল কেবলমাত্র ছই-
খানি ভরবারি ।



দশম পরিচ্ছেদ ।

স্বার্থ এবং অসার প্রণয় ।

বিদ্যাবাসিনী একদিন সত্যভামার নিকটে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে,
সত্যভামা এই প্রকার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিল ।

‘আমার বাড়ী নদিয়ায়, আমি একজন দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ।
আমার মাতা অতি সামান্ত বংশজের মেয়ে । টাকার লোভে আমার
পিতা নীচ-বংশীয়া কন্যা বিবাহ করেন । পিতা পূর্বেই দরিদ্র ছিলেন,
তারপর আবার ১০টা বিবাহ করেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের বড়ই কষ্ট
হইত, অবশেষে দারিদ্র্য উপস্থিত হয় । আমার বিমাতা সকল, যাহার
যেখানে সুবিধা ছিল, সকলেই পিতাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন
করিলেন । আমার মাতুলেরও কিছুই ছিল না, সুতরাং আমার মাতার
আর উপায় ছিলনা, তিনি আমাকে লইয়া পিতার আবাসেই রহিলেন ।
এক সময়ে তাঁহারা ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত প্রায় অনাহারে ছিলেন, কিন্তু আমার
জ্ঞান কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন । এই সময়ে, দরিদ্রতা
নিবন্ধন, অনাহারে ও উপবাসে পিতার গীড়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই
তাঁহার মৃত্যু হয় । পিতার মৃত্যু সময়ে আমার বয়স ১২ বৎসর মাত্র ছিল ।
পিতার মৃত্যুর পর মাতা আমাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করেন, সেখানে
এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সামান্ত চাকরাণীর বেশে দিন যাপন করিতেন ।
আমিও এই সময়ে প্রাণপণ করিয়া মাতার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতাম ।
কিছুদিন পরে মাতাও অসময়ে আমাকে সংসারে রাখিয়া চিরকালের মত
পলায়ন করিলেন ; আমি নিরুপায় হইয়া একাকিনী সংসারে বাঁপ দিলাম ।
পৃথিবীতে তখন আমার আর আপনার বলিবার কেহই ছিল না ; সৌভাগ্য-
ক্রমে এই সময়ে এই মহাপুরুষের সহিত একদিন কালীঘাটে আমার সাক্ষাৎ
হয় ; ইহার নিকটে আমার সমস্ত জীবনের কাহিনী বলিলে, ইনি আমার
ভ্রুংখে ভ্রুংখিত হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচিত একস্থানে রাখেন । কিছু

আমার অদৃষ্টক্রমে আমি সেখানে অনেকদিন থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে আমার ভরার্ষ্যেবন, অনেকেই আমার পানে বিঘনরনে তাকাইত। এই কথা মহাপুরুষের নিকট ভাঙ্গিয়া বলিলে, তিনি আমাকে অত্র একস্থানে রাখিয়া (আমি যেখানে ছিলাম) স্থানান্তরে গমন করিলেন। বাইবার সময় আমি কাঁদিতে লাগিলাম; তিনি বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমি আবার কয়েক বৎসর পর তোমাকে লইয়া বাইব।' এই সময়ে আমার মৃত্যু হইলেও কোন দুঃখ থাকিত না; আজও সেই কষ্ট সহ্য করিতেছি। আমার মাতার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। মহাপুরুষের গমনের পর আমি এই ৬ বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্থানেই ছিলাম, তারপর তিনি আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই।'

এই সৰ্ব্ব কথ্য বিদ্যাবাসিনী বেদিন গুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই দুই জনের মধ্যে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠবোগ স্থাপিত হয়। উভয়ের হৃদয়ে উভয়ের হৃদয় একীভূত হয়।

যে সময়ে শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া বিদ্যাবাসিনী কানপুরের সেই নির্জন পুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে সত্যভামা গৃহান্তরে কার্য্য করিতেছিল; সন্ধ্যা অতীত হইলে বিদ্যাবাসিনীকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন বিন্দুকে দেখিতে পাইল না, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, এই সময়ে স্থানান্তরে অনুসন্ধান করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অসাধ্য, বিশেষতঃ সত্যভামা কখনই রজনীতে গৃহের বাহির হইত না।

বিদ্যাবাসিনী সেই কাননে একাকিনী মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন, নিশি অগ্নে অগ্নে অবসান হইল। প্রকৃতির শোভা পরিবর্তিত হইল। বিদ্যাবাসিনীর চতুর্দিক শূন্য স্থান সমূহ মেঘে আবৃত। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব মলিনবেশে মেঘের আড়াল হইতে উকি মারিয়া একটু হাসিতে লাগিলেন; একটু একটু বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল। বিন্দুর বসন সেই জলে আর্দ্র, শরীর মৃত্তিকায়, লুপ্তিত, কিন্তু তথাপি চেতন হইল না। এদিকে সত্যভামা অতি প্রত্যাঘে বিন্দুর অনুসন্ধানার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রথমে কোথাও দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময়, কি ভাবিয়া যেন, এই কাননে প্রবেশ করিল। কাননের অত্রান্ত স্থান অনুসন্ধানের পর, বিদ্যাবাসিনী যেখানে পড়িয়াছিলেন, সেই

স্থানে উপস্থিত হইয়া, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—বিন্দু! তুমি এখানে এ
ভাবে রয়েছ কেন ?

বিন্দুবাসিনীর চৈতন্য ছিল না ; সত্যভামা উত্তর পাইল না ।

সহসা সত্যভামার মনে কি ভাবের উদয় হইল, সজোরে অঙ্গুলি দ্বারা
নাসিকা টিপিয়া ধরিতে ধরিতেই বিন্দুবাসিনীর চৈতন্য হইল।

সত্যভামা পুন বলিল—‘বিন্দু তুমি এখানে কেন ?’

বিন্দুবাসিনী লজ্জার অঙ্গের স্থানভ্রষ্ট বস্ত্র ঠিক করিয়া লইলেন, উত্তর
করিলেন না ।

সত্যভামা পুনরায় বলিল, আমি তোমাকে ঘরে না দেখে, পাগলের স্থায়
হয়েছি, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখানে রয়েছ ? বিন্দু এর কারণ কি ?
তুমি এখানে কেন ?

বিন্দুবাসিনী কেবল বলিলেন—‘তাইত!’ আর কোন কথা বলি-
লেন না ।

সত্যভামা পুন বলিল, বিন্দু, তুমি কি পাগল হয়েছ ?

বিন্দু।—তোকে আর কি বলিব ? আমার হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে !

সত্যভামা বলিল, সে কি বিন্দু ?

বিন্দুবাসিনী মনের কবাট খুলিয়া বলিলেন—‘যাঁহাকে আমরা স্তম্ভিত
করিয়াছিলাম, তিনিই শরৎচন্দ্র । যখন তিনি আমার নিকট হইতে বিদায়
লইলেন, তখন আমার মন একেবারে অস্থির হইল । তাঁহার অনুসরণ
করিয়া এই পর্য্যন্ত আসিলাম । যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না, আমার
কপাল ভাঙ্গিয়াছে ।

সত্যভামা ।—কেন, তাঁহার দেখা পাও নাই ?

বিন্দু ।—দেখা পাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে কুলটা বলিয়া এইখানে
ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।

সত্যভামা ।—যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ! কেন একটু ধৈর্য্য ধরিলে কি
দোষ ছিল ?

বিন্দু ।—তুই আমার কাটা ঘায়ে আর ছুনের ছিটে দিস্ না । আমি
এতদিনে বুঝিলাম, এ সংসারে কেহই কাহারও নহে । আমি যার লক্ষ
সংসারের সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া, এইখানে আসিলাম, তিনিও
আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ! আমি এতদিনে বুঝিলাম, শরৎ আমাকে

ভালবাসিত না,—ভালবাসিলে আমাকে ফেলিয়া বাইত না । তোকে হৃৎখের কথা আর কি বলিব ! আমার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকল ছেড়ে যাহাকে পাইবার জন্ত আসিলাম, সে আমার দিকে একবারও করুণানয়নে ফিরিয়া চাহিল না । দিক জীবনে ! আর বাঁচিতে অভিশাস্য নাই,—আমার দেহ ধারণে আর ফল কি ? আমি কাহার জন্য আর এই কষ্টের জীবন বহন করিব ? আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব ।

সত্যভামা ।—দেখ বিন্দু ! তুমি বালিকার ছায় অল্পেই উৎখলিয়া উঠ, আবার অল্পেই গলিয়া যাও । তোমার কষ্ট হইতেছে, তাহা মানিলাম । তোমার আর একদণ্ডও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই, তাহা সত্য ! কিন্তু ভেবে দেখত এ সকল কি জন্য ? কেন তোমার মন অস্থির হইতেছে ? তুমি মরিতেই বা চাও কি জন্ত ? শরৎচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করিলেন না, তাই ভাবিতেছ, দেহ-ধারণে ফল কি ? সংসারে অস্ত্রের সূখে সূখী হইবে বলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাই ভাবিতেছ, মরাই ভাল । তুমি মরিবে— তাহাতে আর কাহার কি হইবে ? একা আসিয়াছ, একা যাইবে, কিন্তু আজ ইচ্ছা করিয়া মরিতে চাও কেন ? কি জন্য অনাকে মন সমর্পণ করিয়া ছিলে ? কেন সংসারের প্রণয়ের অনুসরণ করিয়াছিলে ? বিষ পান করেছিলে ত, যখন শরীর জর্জরিত হইল, তখন কেন সাবধান হইলে না ? সংসারে কে কাহার ? সংসারের সূখ কতক্ষণের ? আজ আছে ত কাল নাই । প্রণয়ই বা কতক্ষণ মনের সূখ দেয় ? একদিন, দুদিন—না হয় দশ দিন, তার পর যখন পাখী দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবে, তখন ? তখন সে প্রণয় কোথায় থাকিবে ? আবার দেখ, জগতে সকলেই স্বার্থপর ! স্বার্থপর ভিন্ন জগতে লোক নাই, সকলেই এক একটা অভীষ্টসিদ্ধ করিবার মানসে এক একটা ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেই ফাঁদে পড়িলেই মনোরথ পূর্ণ হয়, তারপর ! তারপর সকলই ফাঁকি ! এই বলিয়া সত্যভামা আপন হৃৎখময় জীবন-কাহিনী বিন্দুকে পুন বলিল । অবিবাহিত হইয়া যে সূখ পাইয়াছে, তাহা বলিল । আরো বলিল, শরৎচন্দ্র তোমাকে দেখিলেন না, তাহাতে তোমার কি ? তুমি চিরকাল তাহাকে ভালবাসিও ! নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বৃষ্টিতে পারিবে, তাহাকে না দেখিলেও তোমার মন অস্থির হইবে না । নিষ্কার্ণ ভালবাসা স্বর্গের জিনিস !

বিন্দুবাসিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই যা যা বলিলি, তা

সকলই বুদ্ধিমান, এখন সাধক আসিলে বাহা হয় হইবে। এই বলিয়া সত্যভামা এবং বিদ্যাবাসিনী উহাদিগের কুটীরে গমন করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড-১

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বড় লোক ।

রজনী ঘোষের বিষয় সম্পত্তি অনেক, সুতরাং রজনী ঘোষ বড় লোকের মধ্যে গণ্য। বড় লোকের বিপদ প্রায় বসিয়া থাকে না—টাকার শ্রদ্ধা করিয়া হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন।

বড় লোকের স্বভাব বুঝা বড় দায়। লোক সামান্য অবস্থা হইতে যখন উন্নত হয়, তখন আর পূর্ব-স্বভাব থাকে না; ইহার কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি, বড় লোকের স্বভাব, সাম্য অবস্থাপন্ন লোকের ভ্রায় হইলে, সংসারের অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়া বাইত—কিছুই অভাব থাকিত না।

রজনী ঘোষের পূর্ব অবস্থার কথা আর স্মরণ নাই—বালাকালে কত কথাই মনে হইত—ভাবিতেন, আমি বড় হইলে, আমার ক্ষমতা হইলে, আমি কত কর্তব্য পালন করিব—‘এই যে গরীব ভ্রুখী রাস্তায় বসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিতেছে—ইহাদিগের চক্ষের জল মুছাইয়া দিব—ঐ যে দেশের বালক সকল স্কুলের অভাবে বিদ্যা উপার্জন করিতে পারিতেছে না, উহাদের জন্য স্কুল স্থাপন করিব—ঐখানে দেশের সাধারণ লোকের উপকারের জন্য একটা পুকুর কাটাইব—এই স্থানে একটা ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিব। এই প্রকার কত কি মঙ্গলের কথা ভাবিতেন। ভাবিতেন,—আমি বড় লোক হইলে টাকার জন্য লালায়িত হইব না—টাকার জন্য লালায়িত হইয়া মনের উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে ছদয় হইতে দূর করিব না। ভাবিতেন—‘অহঙ্কার, দ্বেষ হিংসাদি মনের অপকৃষ্ট আবরণ, বড় হইলে কখনই ইহাদিগকে ছদয়ে স্থান দিব না।

কিন্তু বালাকালের সে সকল করণার স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ রজনী ঘোষ বড় লোক। টাকা হইলে সংসারে বড় লোক বলে, তাহা রজনীর বখেট আছে—বিষয় থাকিলে বড় লোক বলে, তাহাও রজনীর কম নহে।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সৌন্দর্য্য, এসকলকে যদি বড় লোকের চিত্ত মনে কর, তাহাও রজনীর আছে; যশ—যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাকে যদি বড় লোকের আনুযায়িক উপকরণ ভাব—তাহাও রজনীর কম নহে—তবে, রজনী যে বড় লোক, তাহাতে আর সংশয় কি ? রজনী বোধের অবস্থা উন্নত হইবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বাল্যকালের কথা সকল মনে ছিল—কিন্তু এখন, এই মুক্তিলাভে সে সকল কথা ছাড়য়ে ঢাকা পড়িল—সংসারে বড় লোকের সকল প্রকার বাহু চিহ্ন আসিয়া রজনীকে অধিকার করিল। আজ রজনীর পূর্বতন অভিন্নহৃদয় বন্ধু আসিল, তাহাকে দেখিয়া পূর্বের শ্রায় রজনীর মন আর প্রফুল্ল হইল না, সামান্য আলাপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। আজ একজন দীন দুঃখী আসিয়া কাতরস্বরে একমুষ্টি ভিক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিল, রজনীর আর তাহা সহ হইল না, প্রহরীকে হুকুম করিলেন,—উহাকে দূর করিয়া দেও। দেশের একটা স্থাপিত স্কুলের জন্ত আসিয়া পাঁচ জন ভদ্রসন্তান কিছু সাহায্য চাহিলেন, রজনী বাবু বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন—‘এদেশে স্কুল করিলে কিছুই হইবে না, এবিষয়ে আমার টাকা অযথা ব্যয় করিতে পারি না।’ একজন দরিদ্র প্রজা আসিয়া বাকী খাজনা আদায় করিতে, দশদিন বিলম্ব করিতে অমুরোধ করিল, বাবু তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। সংক্ষেপে রজনীর আর পূর্ব স্বভাব নাই যে, বাল্য-কথা মনে থাকিলে, লোক মহত লাভ করিতে পারে, সে কথা আর স্মরণ নাই। রজনী আজ বড় লোক।

মুক্তি লাভ করিয়াই রজনী বাবু নিজ দেশে গেলেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাবাসিনীর পিত্রালয়ের খোজ পাইলেন! বিদ্যাবাসিনীর পিতাকে ডাকাটয়া তাঁহার কথা সমুদয় বলিলেন, তারপর আবার তাহার নিরুদ্দেশের কথা বলিয়া একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

দিন কয়েক পর, বিদ্যাবাসিনীর সয়ল স্বভাব, পতি ভক্তি, অপরাধিত সতীত্ব, রজনীর মন হইতে চলিয়া গেল; বিদ্যাবাসিনীর পিতার আগমনে, অবশেষে, তাহার অভ্যস্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ বলিলেন, মহাশয়,—সে কথার আর কাজ কি ? আপনি দেখে আবার ও সব কথা মুখে আনেন—যে কল্পা একবার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয়, সে সতীই হউক, আর অসতীই হউক, তাহার কথা আর মুখে আনিতে নাই।

বিদ্যাবাসিনীর পিতা একথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেলেন।

এই প্রকার সর্ব বিষয়ে রজনী ঘোষের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িল । একজন লোক আসিয়া রজনীর প্রশংসা করিল, সে রজনীর কুপার পাত্র হইল, যে নিন্দা করিল, সে রজনীর চক্ষের বিষ হইল ।

লোক মাত্রেই উন্নতির আশা আছে, বর্তমান অবস্থায় কেহই সুখী নহে, মহুষোর তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না । যত পাওরী যায়, ততই পাইবার ইচ্ছা হয়, যত ভোগ করা যায়—ততই ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়, ইহাই স্বাভাবিক । কিন্তু মানুষ সময়ে সময়ে গম্য পথের পরিবর্তে অগম্য পথে উপস্থিত হয় ; তাহাতে সংসার-সুখ, যশ, মান সকলই লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয়ত জীবনের লক্ষ্য নাও হইতে পারে ! আমাদের দেশীয় বড় লোক মাত্রেই লক্ষ্য-শূন্য পথের পথিক ।

বড় লোক হইলে পূর্বের কথা মনে থাকে না । থাকিলে বোধ হয় তাদৃশ সুখ হয় না । আমি এত লোককে শাসন করিতেছি, কিন্তু আমি নিজকে শাসন করিতে পারি না—একথা সকল সুখের কণ্টক ; নিজে বাহা করিতে না পারি, তাহা অস্ত্রের প্রতি কেন প্রচার করি ? এ অতি শক্ত কথা—মনের সকল সুখ-হস্তারক । ভাল অবস্থার পূর্ব অবস্থার কথা মনে স্থান পাইলে, লোকের সুখ হইত না—তাই বড় লোকের এত পরিবর্তন দেখা যায় । রজনী ঘোষও এখন বড় লোক—জীবনের পরিবর্তন আশ্চর্যের নহে ।

বড়লোকের জীবন সদা পরিবর্তনশীল, আমরা নানা কারণে একথা স্বীকার করি, কিন্তু দয়া প্রভৃতি সদগুণ তাঁহাদিগের মনে থাকে না কেন, বুঝিতে পারি না ।

বিক্রাবাসিনী এক সময়ে রজনীর অত্যন্ত বৈহের পাত্রী ছিলেন—তাঁহার জন্ম একদিন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন,—সেই বিক্রাবাসিনীর কথা মনে করা দূরে থাকুক, সেই কথা আদরের হওয়া দূরে থাকুক, সে কিনা আজ অত্যন্ত বৃণার পাত্রী হইল ;—দয়ার স্থানে কঠোরতার সৃষ্টি হইল । রজনী ঘোষ এখন বড় লোক—বিক্রাবাসিনীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল । তাহার জীবন, উচ্চ জীবন—বড় লোকের জীবনের জায় সংসার-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল । বিক্রাবাসিনী দীন-দরিদ্রা—উচ্চ অবস্থাপন্ন রজনী ঘোষের স্মরণেরও বুকি বা অযোপ্যা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সংসারের অসারতা ।

সাংসারিক লোকমণ্ডলীর মতে, মালতী দেবীর মৃত্যুতেই জগদীশ বাবুর সকল সুখের পর্যাবসান হইল—ছুঃখপট অভিনয়ের সুখ-পটের স্থান অবিকার করিল। লোকের চোক আছে ভালবাসার বস্তু দেখিতে, কাণ আছে ভালবাসার স্বর শ্রুতিতে, নাসিকা আছে ভালবাসিত বস্তুর ঘ্রাণ লইতে, মুখ আছে ভালবাসিত বস্তুর আশ্বাদন লইতে—আর হৃদয় এবং মন সেই ভালবাসাকে, এবং ভালবাসার পাত্রকে ধারণ করিতে। জগদীশ বাবুর চোক, কাণ, নাক, মুখ, হৃদয় এবং মন এ সকলই ছিল—সুতরাং ভালবাসাও ছিল, কিন্তু ভালবাসিত জন চিরকালের মত, ইন্দ্রিয় সকলকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিল। মালতী দেবী জগদীশ বাবুর একমাত্র ভালবাসার বস্তু—সেই মালতীর অদর্শনে অঙ্গ শিথিল হইল—জগদীশ বাবু শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন, দুদিন, তিনদিন, তত্রাচ মন স্তব্ধ হইল না।

ঈশ্বরের রাজ্যে কেহই পরম্পরের সাহায্য বাতীত, কর্তব্য কার্য্য সমূহ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন, তাই প্রেমের সৃষ্টি। ভালবাসা, সময় ভেদে, সেই প্রেমের রূপান্তর মাত্র। এই ভালবাসা এক এক সময়ে এক একটা বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে ; ইহাই সংসারের স্বার্থ ভালবাসা নামে খ্যাত। এই স্বার্থের জন্মই ভালবাসিত বস্তুর অবর্ত্তমানে মন ছুঃখে অবসন্ন হয়। জগদীশ বাবুর ভালবাসাও স্বার্থময়—মালতী দেবীর অদর্শনে তাঁহার মন যেন ছুঃখ-সাগরে ঝাঁপ দিল—সংসারের সুখ, সেই সময়কার মতে, যেন তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের মত বিদায় লইল। ষাঁহাদের মতে রমণী সর্ব-সুখ-হেতু, তাঁহাদিগের পক্ষে স্ত্রীর বিরোগ-শোক অসহ, ছুঃখ জগদীশ বাবু শোকে অস্থির হইলেন।

জগদীশ বাবুর শোকের কারণ দুইটা, একটা মালতী দেবীর অদর্শন, —প্রাণ-য়ের কণ্টক ; আর একটা এমন গুণসম্পন্ন ভাৰ্য্যা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘাটেবে না। প্রথম শোক সময় বিশেষে ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টা প্রায়ই মানুষের জীবনকে ছাড়ে না—আজীবন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া রাখে।

ভালবাসিত জনের অদর্শন-জনিত দুঃখ প্রায়ই যায় না, পক্ষান্তরে সেই স্থানে দ্বিতীয় ভালবাসার বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব কথা, পূর্ব ভালবাসিত জনের কথা দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনে উদ্ভিদ হইয়া মনকে ঘোর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই জগুই শোক, মনুষ্য জীবনের চিরসম্বল। জগদীশ বাবুর মালতী দেবী যে সকল গুণে সমন্বিতা ছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস, সে সকল গুণ প্রায় রমণীর জীবনে ঘটে না, তাঁহার নিকটে মালতী দেবী অলৌকিক গুণসম্পন্ন ভাগ্য-প্রসূত দৈববাণী বিশেষ—এই ভাবিয়াই তাঁহাকে দেহ, মন, জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন; আজ সেই দৈববাণী বিশ্বাসের মূল ছেদন করিয়া, আশায় নৈরাশ্যের ছাই ঢালিল! জগদীশ বাবু ভাবিলেন, তাঁহার এ শোকাগ্নি আর নিবিবার নহে।

মালতী দেবীর মৃত্যুর তিন দিন পরে, তিনি মালতীর পিত্রালয় ছাড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। বাটীতে আসিয়াও তাঁহার মন সুস্থ হইল না; তাঁহার বাটীর চতুর্দিকের আনন্দ-ধ্বনি তাঁহার নিকটে কর্কশ বোধ হইত; প্রকৃতির অপূর্ণ শোভা দুঃখের চিত্র, শোকের চিত্র বলিয়া বোধ হইত; সংসারে থাকা না থাকা তাঁহার পক্ষে উভয়ই তুল্য বোধ হইতে লাগিল। জগদীশ বাবু ভাবিলেন, “স্বা শূণ্য হইলেই গৃহ শূণ্য হয়—যাহার গৃহ-শূণ্য, তাহার সংসার শূণ্য—যাহার গৃহে সুখ নাই—তাহার সমস্ত সংসারে সুখের বস্তু ছলভ। সংসারে থাকিয়া আর কি করিব—ভাই, বন্ধু—আত্মীয় পরিজন যাহাই বল না কেন—আমার কিছুতেই মন সন্তুষ্ট হয় না। তবে আমি কি করিব?”—জগদীশ বাবু মনে মনে ভাবিলেন—“তবে তুণা এই সুখ-শূণ্য সংসারের জড়পিণ্ডবৎ, দুঃখের সেবা করিবার জন্য বাস করিয়া ফল কি? ধন, জন, সকলই অদার! আমার চাকরি? চাকরিতে আর কি হইবে? চাকরি করিয়া আর কাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিব। সমস্ত দিবস শরীরের রক্ত জল করিয়া কাহার জন্য আর অর্থ সংগ্রহ করিব? যাহার জন্য করিতাম—আমার জীবনের সে সুখ-স্বপ্ন আর নাই—আমার অর্থে আর প্রয়োজন কি? আমার অধায়ন! অধায়নে কত সুখ পাইতাম—পূর্বে সুখের সময় আর সে প্রকার সুখ পাই না। যে অধায়নে নিবৃত্ত হইলে সমস্ত পৃথিবীর সুখ বিস্মৃত হইতাম,—আজ সে অধায়নও কর্কশ বোধ হইতেছে। মনে কিছুতেই সুখ পাই না। এইত শকুন্তলা, কাদম্বরী—এইত সম্মুখে কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। এসব এক সময়ে কত ভাল বোধ

হইত—কিন্তু এখন আর সে প্রকার বোধ হয় না ? দেখি একবার পড়িয়া দেখি ‘রাজ্য একদিন’—ছাই মাথা মুণ্ড ! এখানি পড়িয়া দেখি—দূর হউক, এ যে ইংরাজি, এতে ত মালতীর শোক নিবারণ হবে না ? তবে এসব পড়ব কেন ? এসব পড়ে কি হবে ? আমার গৃহের চতুর্দিকে কত প্রকার মনোহর জীব্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে—এক সময়ে এ সকল দেখিলে কত আহ্লাদ হইত—আজ আর কিছুই ভাল লাগে না !”

একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, চক্ষে ঘুম বসিল না ! ভাবিলেন,—“পোড়া চক্ষে ঘুমও নাই—মন যেন দগ্ধে যাচ্ছে—কত করে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তা মন আর প্রবোধ মানে না ! মন প্রবোধ মানিল না—তবে আর এ সংসারে থাকিয়া কাজ কি ? আমি আছি, কিন্তু কি ভাবে আছি, তাহা বুঝিতে পারি না । সংসার অন্ধকারময় হলেও আমার কোন ক্ষতি বোধ হ’ত না । নয়ন মুদিলে চতুর্দিক অন্ধকার দেখি, ভাবি—এই অন্ধকারে যদি মালতীকে দেখিতে পাইতাম,—কিন্তু মনের অবস্থা ঠিক একভাবে থাকে না—আবার নয়ন উন্মীলিত হয়ে পড়ে ! হায়, কোথায়ও কি আমার আর সুখ হবে না ?”

জগদীশ বাবু এই প্রকার নানা চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে একটা স্ত্রীলোক আসিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইল, স্ত্রীলোকটির বেশভূষার পরি-বর্তন কিছুই ছিল না—সুতরাং জগদীশ বাবু চিন্তিতে পারিয়া আশ্চর্যের সহিত বলিলেন ‘দিনী—তুই আসিলি—মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি ? জগদীশ বাবুর বিশ্বাস ছিল, দিনীর মৃত্যু হইয়াছে—এখন দিনীকে ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার মনে সহসা কি ভাবের উদয় হইল—মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল, আশা আসিয়া শূন্য মনকে অধিকার করিল, আশ্চর্যের সহিত মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—তুই আসিলি—মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি ? দিনীর চক্ষের জল পড়িল—মুখে কথা সরিল না ।—

জগদীশ বাবু আশ্চর্যের ভাবে বলিলেন, ক’দিস্ কেন ?—মালতী কোথায় ? তুই আসিলি—মালতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি ?

দিনী এবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—“আমি—কি জানিব ?—আমার সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল না—আজ গ্রামের চতুর্দিকে তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিলাম—তাই আপনার নিকটে আসিলাম—বলুন, সত্যিই কি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে ?

জগদীশ বাবু।—তুই এতদিন মরিয়াছিলি—আবার বাঁচিলি কেমন করে ?
দিনী।—দেখি ? আমার মৃত্যু হলে কি আবার পুনরায় বাঁচিবার শক্তি
থাকিত—মরিলেই বাঁচি তাম। আমার মরাই বাঁচা, মরিলে আর কিরি-
তাম না ।

জগদীশ।—বলিস্ কি—আমিত জানি তোর মৃত্যু হয়েছে—আবার তুই
বাঁচিলি কেমন করে ? মালতী কেমন আছে ?

দিনী।—আপনি দেখি উন্নতের ন্যায় হলেন। একি স্বপ্ন দেখেছেন—
লোকের মৃত্যু হলে কি আর বাঁচিবার শক্তি আছে ?

জগদীশ।—কি বলিলি, তবে কি আমি আর মালতীকে দেখতে পাব না ?

এই বলিয়াই হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন, দস্তে দস্ত লাগিল,
জগদীশ বাবুর মোহ হইল। দিনীর নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল।
ক্ষণকাল পরে স্থানান্তর হইতে জল আনয়ন করিয়া, জগদীশ বাবুর শিরো-
দেশে সিঞ্চন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জগদীশ বাবুর আবার চেতন
হইল—বলিতে লাগিলেন—‘অসার সংসারের ফাঁদ এমনই কঠিন যে, একবার
মাথা ঢুকাইলে আর রক্ষা নাই। সংসার কাহাকে বলি—কাহার জন্য ইহাতে
মাথা ঢুকাইলাম ? এ ফাঁদে কেন ইচ্ছা করিয়া জড়িত হইলাম ? জড়িত
হইলাম ত কেন আর আপনাকে আপনি বশে রাখিতে পারিলাম না ? বশে
রাখিতে পারিলাম না ত প্রাণ দেহ ছাড়িল না কেন ? কেন জীবিত রহিলাম ?
লোকে বলে, সংসার মায়াময়—এ মায়ায় ফাঁদ অকাটা—আজ্ পর্য্যন্ত কেহই
এফাঁদে একবার পড়িয়া মুক্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাতে আমার কি ? আমি
পারিলাম না কেন ? সংসারের সুখই, সংসারের প্রলোভন, হয়, কেন এই ক্ষণ-
স্থায়ী সুখ-প্রলোভনে ভুলিয়া সংসার ফাঁদে পড়িলাম ? এখন প্রাণ যায়, আর
বাঁচিতে ইচ্ছা করে না—এপ্রাণে আর সাধ নাই—এ শরীরে আর কাজ নাই।’

মহুঘোর মন হুর্সল, চঞ্চল। প্রলোভনে মন ভুলিলে মানুষ যখন অকাটা
ফাঁদে জড়িত হয়, তখন হুর্সলতা প্রযুক্ত সেই ফাঁদ হইতে মুক্তি পাইবার
জন্য মৃত্যুকেই একমাত্র অবলম্বনীর উপায় বলিয়া নির্দেশ করে। এই জন্য
আমরা দেখিতে পাই, সংসারের অধিকাংশ লোক, যে সুখ কামনার সংসারে
জড়িত হয়, তাহা না পাইলে, হয় অসময়ে পৃথিবী হইতে অবসর লয়, নয়
সেই অকাটা সংসার-জালে চিরকাল অন্তর্বে, হৃৎখে জীবন অতিবাহিত করে।
সংসারে সুখও আছে, হৃৎখেও আছে ; উইয়ের সামস্তই জগৎ প্রতিষ্ঠিত

এবং এই দুইয়েরেতেই জগতের উন্নতি । কিন্তু মহুবোর এমনি স্বভাব, চিরকাল একভাবে থাকিতে বাসনা । চিরকাল সুখের সেবা করিতে পারিলেই যেন জীবন সার্থক, এবং এই সুখ কামনায় এত নিগূঢ়রূপে নিযুক্ত থাকে যে, হিতাহিত জ্ঞান যে কখন অবসর লয়, তাহা পর্য্যন্তও বৃথিব্যর ক্রমতা থাকে না । যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শরীর, মন অবশ হয়ে পড়ে, ততক্ষণ সেই প্রলোভনই মধুর—ইহাতে যতপ্রকার কষ্টই থাকুক না কেন, সেই সুখের—কাল-নিক সুখের পর্য্যবসান পর্য্যন্ত আর মনের গতি স্থগিত হয় না, হিতাহিত জ্ঞান মনে পুনরুদিত হয় না । সংসার-সুখ যেন প্রদীপের আলো । সংসার-পত-
ঙ্গের এমনি ভালবাসার বস্তু যে, আলো দেখিরা সামান্যরূপ উপভোগ করিয়া, সে ভালবাসার শেষ হয় না । আলো দেখিলাম, সেই আলোতে মাথা ঢুকাইলাম, উদ্ভাপ লাগিল, অল্পে অল্পে শরীর দন্ধ হইতে লাগিল—কিন্তু তত্রাচ বাসনা পূরিল না—সংসার-পতঙ্গের মনের আশা পূর্ণ হইল না ! যে পর্য্যন্ত না সৰ্ব্ব শরীর সেই উত্তাপে ভস্মীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত আর পতঙ্গের বিশ্রাম নাই !

সংসার বহ্নিময়—এ বহ্নিতে পড়িয়া অহোরহ কত শত পতঙ্গ অসময়ে পুড়িয়া মরিতেছে ; কিন্তু তত্রাচ অঞ্জের জ্ঞান হইতেছে না, অঞ্জের বাসনার নিবৃত্তি হইতেছে না । শেষ পর্য্যন্ত ভোগ করা পতঙ্গের চিররোগ, দৃষ্টান্তে এ রোগ প্রতিকার হয় না, যতক্ষণ সেই বহ্নিতে শরীর না নির্ক্ষিপ হয়, তত-
ক্ষণ আর মন প্রবোধ মানেন না । বহ্নিতে—সংসার-বহ্নিতে একবার পড়িলে, আর সেই বহ্নি হইতে উদ্ধার হওয়া সাধ্যায়ত্ত থাকে না । যে ব্যক্তি পারে, তাহার মন সবল হইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই তাহা ঘটে না । তবে মহুবোর মন দুর্ব্বল বলিব না ত কি বলিব ?

জগদীশ বাবু এ সকলই জানিতেন, জানিয়াও সংসার-বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এখন শরীর মন, উভয়ই দন্ধ হইতেছে ! ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া জগদীশ বাবুর ক্ষমতার অতীত—জগদীশ বাবুর দুর্ব্বল মনের অসামর্থ্য ।

সে দিন গেল । আর এক দিন আসিল—আর এক দিন গেল, আর এক দিন আসিল, কিন্তু মালতীর কথা কোন মতেই মন হইতে গেল না । সময়ে সময়ে এত দুর্ব্বল মনঃকষ্ট উপস্থিত হইত যে, আত্মহত্যা করিয়াও সকল কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইত ।

জগদীশ বাবু প্রায়ই নির্জনে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেন । লোক-সমাগমে এক দণ্ডও থাকিতে ভালবাসিতেন না । লোকের সহিত কথা

বলিয়া জগদীশ বাবু এক মুহূর্তও আর সুখ পাইতেন না। আহারাদি একে একে সকলি প্রায় পরিত্যাগ করিলেন, মনের সুখ শান্তি মুহূর্তের জ্ঞও ছিল না। এই ভাবে কষ্টের জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সংসারের বন্ধন এমন কঠোর যে, জগদীশ বাবু সকল বুদ্ধিয়াও ইহার হাত এড়াইতে পারিলেন না, মালতীর শোক-সিন্ধুতে জগদীশ বাবুর চঃখময় জীবন, বিসর্জিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কথায় কি হয় ?

জগদীশ বাবু সংসারের সুখ পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি একাকী নিষ্ক্ৰমে বসিয়া থাকিতেন, দিনীর পক্ষে ইহা একটা শুভ লক্ষণ বোধ হইল। দিনী প্রত্যহ জগদীশ বাবুর অজ্ঞাতে, তাঁহার জ্ঞান নানা প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া যাইত। দিনীর জীবনে আর কাজ ছিল না, বর্তমানে জগদীশ বাবুর মনস্তৃষ্টিসাধনের চেষ্টাই একটা প্রধান কার্য হইল। যেখানে যাহা মিলিত—পূর্বে জগদীশ বাবু বে সকল দ্রব্যাদি ভালবাসিতেন, তাহা সকল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ জগদীশ বাবুর ঘরে রাখিয়া আসিত; জগদীশ বাবু তাহা কিছুই জানিতেন না। একদিন চিন্তা ভঙ্গ হইলে জগদীশ বাবু উঠিয়া সামান্য কিছু আহার করিতে যাইবেন, এমন সময়ে তাহার সম্মুখে কতকগুলি সুপক্ক আম্র ফল দেখিতে পাইলেন। একটু চিন্তিত হইলেন, অনামনক বশতঃ হটক, কিম্বা জগদীশ বাবুর প্রিয় ফল বলিয়াই হটক, হঠাৎ সেই মনোরম ফল হইতে একটীর আশ্বাদন লইলেন। সে দিন গেল। তার পর দিনও আবার সেই প্রকার দেখিলেন। মনে বিস্ময় জন্মিল, কিম্বা কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

এদিকে দিনী প্রত্যহই জগদীশ বাবু নিকটে আসিয়া বসিত—দৈবে কোন সময়ে জগদীশ বাবু কোন কথা বলিলে তাহা করিত, কিম্বা গুনিয়া চলিয়া যাইত। এদিন জগদীশ বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'দিনী, এঘরে প্রত্যহ নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী কে রাখিয়া যায় ?'

দিনী—তাহা কেমন করিয়া জানিব? বোধ হয়, বে আপনাকে ভালবাসে, সেই রাখিয়া যায়।

জগদীশ বাবু—আমাকে কে ভালবাসিবে?—আমাকে ভালবাসিবে, এমন লোক পৃথিবীতে আর নাই!

দিনী—একথা বলিলে আর আমি কি বলিব—তবে বুঝি, আপনাকে যে না ভালবাসে, সে রাখিয়া যায়।

জগদীশ—যে না ভালবাসে, সে রাখিয়া যায়, তার অর্থ কি?

দিনী—আপনার অজ্ঞাতগারে—আপনার ভালবাসার অপ্রার্থী হয়ে যে আপনাকে ভালবাসে—সে-ই না ভালবাসে।

জগদীশ বাবু—তার অর্থ কি?

দিনী—আপনাকে যে ভালবাসে, সে আপনার প্রকাশ্যেই ভালবাসার কাজ করে—আপনার মন বাঁধিবার জন্য প্রকাশ্যে ভালবাসার ফাঁদ পাতে, আপনি সেই ফাঁদে পড়েন এবং ভাবেন, উহাই ভালবাসার উচ্চ আদর্শ। অতএব আপনি সমস্তই হউন, বা না হউন—অর্থাৎ আপনি তাহাকে ভালবাসুন বা না বাসুন, এ বিষয়ে বাহার চিন্তা নাই—সে-ই আপনার জন্য গোপনে এই সকল সামগ্রী রাখিয়া যায়—আপনার ভালবাসার আদর্শে সে ব্যক্তির ভালবাসা ‘না ভালবাসার মধ্যে গণ্য।’

জগদীশ বাবু—আমি ওর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

দিনী—মনে করুন, মালতীকে আপনি ভালবাসিতেন, মালতীও আপনাকে বাসিত, দুই জনেই দুই জনের ভালবাসার পরিচয় পাইতেন—দুই জনেই পরস্পরের মন বাঁধিতে ভালবাসার ফাঁদ পাতিতেন। এখন সে মালতী নাই—তাই আপনার মন অস্থির হয়েছে—এখন মালতী আর ভালবাসার ফাঁদ পাতে না—তাই আপনার দারুণ মনোকষ্ট উপস্থিত হয়েছে—ভাবিতেছেন—আপনার ভালবাসার আর পাত্রী নাই! তবেইত দেখুন—যে ব্যক্তি এই সমস্ত রাখিয়া যায়, সে আপনাকে ভালবাসে, কিন্তু আপনার ভালবাসার স্থান অধিকার করিতে চায় না—তাই—আপনার মতে সে আপনাকে ভালবাসে না।

জগদীশ—কেন? এই যে সকল রাখিয়া যায়, এওত ফাঁদ বিশেষ।

দিনী—এ ফাঁদ বিশেষ তা মানিলাম—কিন্তু আপনাকে ধরিবার ইচ্ছা থাকিলে সে অপ্রকাশ্যে থাকিত না। এ ফাঁদ তাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরিচয়, এবং আপনার পরীক্ষা বিশেষ।

জগদীশ—সে কি?

দিনী—তাহার ভালবাসার পরিচয়—একথা আর কি বলিব—আপনাকে

সে ভালবাসে, সেই জন্তাই এসকল রাখিয়া যায়—আর আপনার নিকটে কিছু প্রার্থনা নাই বলিয়াই অপ্রকাশিত থাকে—আপনার নিকটে তাহার কোন বাসনা থাকিলে কখনই অপ্রকাশিত থাকিত না ;—আর আপনার পরীক্ষা ? দেখুন, আপনার ভালবাসা স্বার্থের । নিঃস্বার্থের হইলে—আপনার আর ভালবাসার লোক নাই, একথা বলিতেন না ।

জগদীশ বাবু—আমি মালতীকে ভালবাসিতাম, মালতীর মৃত্যু হইয়াছে—তাই বলি, আমার আর ভালবাসার লোক নাই ।

দিনী—ভালবাসিতেন, আর এখন লোক নাই, তাহাতেই কি ভালবাসার শেষ হইল ? বিবেচনা করুন, আপনার মালতীই আপনার জন্ত এই সকল সামগ্রী রাখিয়া যায়—তাহার ভালবাসা আছে—তাই আপনার জন্ত এ সকল প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া যায়—আর আপনিসেই ভালবাসার বস্তুকে না দেখিধাই অস্থির হয়েছেন । আপনি ভালবাসিতেন—সে ভালবাসা এখন নাই কেন ? না মালতী নাই ? এইত আপনার ভালবাসা ?

জগ—তা মিথ্যা নয় ! মন এমনি দুর্বল, মালতীর অদর্শনে একেবারে অস্থির হয়েছে—জানিনা, ইহার শেষ ফল কি হইবে, কিন্তু বোধ হয়, আমার জীবনে আর সুখ নাই !

দিনী—ইচ্ছা করে চিরতুঃখে মনকে ঘেরিয়া রাখিলে, আর কে কি করিবে ? নচেৎ মালতীর মৃত্যুতে অর্থাৎ মালতীর অদর্শনে আপনার মন অস্থির হয় কেন ? মালতীর ভালবাসা নিঃস্বার্থের—কাজে কাজেই তাহার আর কষ্ট নাই ।

জগ—তা যা হোক, সে সকল কথায় আর কাজ নাই, মালতীর কথা মনে হলে হৃদয় তুঃখে অবসন্ন হয় ! হায় ! এত্নয়ে আর মালতীর সেই সরল মুখ দেখিব না—আমার জীবনে সুখ নাই । (দীর্ঘনিঃশ্বাস !) দিনী এই প্রকার করিয়া কত বুঝাইত, কিন্তু জগদীশ বাবু তাহা শুনিয়াও শুনিতেন ন্ম, অথবা শুনিতেন, কিন্তু মনের ভাব পরিবর্তন হইত না । জগদীশ বাবু চিরকাল বিচ্ছেদানলে দগ্ন হইতে লাগিলেন । কথায় কি বিচ্ছেদ ভোলা যায় ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কানপুরের পর্ণ কুটীর ।

সাধকের ঠিক কথাগুলোসারে, পনের দিনের দিন আসিয়া তিনি বিদ্যাবাসিনীকে দেখা দিলেন । বিদ্যাবাসিনী সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলেন । সাহেবদিগের অত্যাচার, ভাগ্যক্রমে সেই দিনে যুবকের দ্বারা সাহেবদিগের অসাময়িক মৃত্যু, সৈনিক পুরুষের আঘাত, তাঁহার গুরুত্বা, আরোগ্য, কঠোর ব্যবহার, এই সমস্ত কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ।

সাধক ভাল মন না বুঝিয়া, সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বিন্দুর জন্মনের কারণ কি ?’

সত্যভামা বলিল, সেই সৈনিক পুরুষই ‘শরৎচন্দ্র ।’ সাধক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, ‘তিনি এখন কোথায় আছেন ?’

সত্যভামা ।—তিনি কোথায় আছেন, তা জানি না ; সেই দিনের পর আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নাই ।

সাধক বিদ্যাবাসিনীকে বলিলেন, মা ! সে স্ত্রী চিন্তা কি ? আমার সহিত শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, তোমাকে তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন ।

বিদ্যাবাসিনী পূর্বেই সত্যভামার উপদেশে একটু স্নেহ হইয়াছিলেন, সাধকের উপদেশে এবং আশ্বাসে আরো আশ্বাসিতা হইলেন । কয়েক দিন সাধকের সহিত থাকিতে থাকিতে বিন্দুর মন অনেক পরিবর্তিত হইল ।

কিয়দিবস পরে বিদ্যাবাসিনী সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘পিতা ! আপনি যখন আমাদিগকে এই খানে রাখিয়া গেলেন, তখন আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই ; তখন বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলে, আমার কথা উত্তর দিবেন । আপনার সেই প্রতিজ্ঞা অদ্য পালন করুন । আপনি এই পনের দিন কোথায়, কি প্রকার অবস্থায় ছিলেন ?’

সাধক বলিলেন, আমি তখন তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করি নাই, বলিয়া ছিলাম—‘বলিবার হইলে আসিয়া বলিব ।’ তোমার নিকট সকলই বলিতে পারি, কিন্তু অগ্রে কয়েকটা কথা না শুনিলে বলিতে পারিব না । আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে, বল, তারপর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব ।

বিদ্যাবাসিনী।—আমার ক্ষমতা থাকিলে, নিশ্চয় বলিব।

সাধক।—তুমি জীবনে কি সুখ পাইয়াছ ? বাহাকে দেখিবার জন্ত তুমি উন্নত হইয়াছিলে, তাহাকে দেখিয়া তোমার মনের সাধ মিটিয়াছে কি ? তুমি আবারও কি শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করিবে ?

বিদ্যাবাসিনী।—শরৎচন্দ্রের সহিত আর একবার দেখা করাইতে চেষ্টা করিবেন, এই কথা যদি বলেন, তবেই পরিষ্কার উত্তর দিতে পারি।

সাধক।—প্রাণপণে সে চেষ্টা করিব।

বিদ্যাবাসিনী বলিলেন, তবে উত্তর শুধুন—

১ম। জীবনে একদিনের তরেও সুখ পাই নাই।

২য়। সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু আর একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা।

৩য়। আমার জন্ত যে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, সে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম ; আর তাঁহার পথে কণ্টক পুতিব না।

সাধক বলিলেন, তবে আমার উত্তর শুন। আমি এই পনের দিন তোমাদের নিকটেই ছিলাম। তোমার মন পরীক্ষা করিবার জন্ত অস্বরালে থাকিতাম। তোমরা এই কয়েকদিন যাহা যাহা করিয়াছ, তা আমি সকলি জানি। তোমাকে ঔষধ দ্বারা একদিন স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম, মনে পড়ে কি ?

বিদ্যাবাসিনী।—আপনি সকলি জানিতেন, তবে যে দিবস সাহেবেরা আমাকে লইয়া গেল, সে সময়ে আপনি আসিয়া রক্ষা করিলেন না কেন ?

সাধক। সেইটাই আমার পরীক্ষা। তোমার মনের বল পরীক্ষা করিবার জন্ত আমি সেইখানেই ছিলাম। যদি দেখিতাম, বলপূর্ব্বক পামরেরা তোমার সতীত্ব বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি তাহাদিগের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার হাত আর কলুষিত হইল না ; শরৎচন্দ্রই তোমাকে রক্ষা করিলেন। তারপর আমি শরৎচন্দ্রের পায়ে একটা ঔষধ লাগাইয়া তোমার নিকটে তাঁহাকে আনিয়া রাখিলাম ; আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া তুমি আমাকে চিনিলে না, আমি তোমাকে বলিলাম—“শুশ্রূষা কর।” তারপর সেই বাগানের মধ্যে তুমি যখন শরৎচন্দ্রের প্রতি আত্মসমর্পণ করিলে, এবং তিনি যখন তোমাকে ফেলিয়া গেলেন, তখন তোমার চৈতন্য ছিল না, তখন তোমাকে আমি শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়াছিলাম। তারপর যখন দেখিলাম, আবার শরৎচন্দ্র আসিতেছেন, তখনই সে স্থান হইতে সরিয়া গেলাম

তোমাদের স্বথের কণ্টক হইলাম না। তারপর তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তুমি অস্থির হইলে, সত্যভামা পরদিন তোমাকে লইয়া আসিল। সত্যভামার উপদেশে তোমার মন একটু স্থস্থির হইল দেখিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আর তোমাকে বলিব কি? আমার পরীক্ষার ফল পাইলাম, বুঝিলাম, তোমার ছায় সতী আমি আর দেখি নাই। পনের দিনের মধ্যে এত কাণ্ড হইয়া গেল, এখন তোমার মন পরিবর্তন হইয়াছে, তবে চল মা! দেশের দিকে যাই।

বিদ্যাবাসিনী মস্তক অবনত করিলেন, বুঝিলেন, সাধক একেবারে তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা কাড়িয়া লইতেছেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, পিতা! শরতের সহিত আর একবার দেখা করাইয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন ত!

সাধক বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে।

শ্রুতিশ্রুতি অমুসারে একপক্ষ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রের অমুসন্ধান করিয়াও সাধক তাঁহার কোন সংবাদ পাইলেন না। সাধকের অধিক চেষ্টা করিতে হয় নাই, এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতেই অত্যাচারী এবং বিদ্রোহীদিগের অমুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। যাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের যে সকল দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। সাধক, দুইজন লোকের নিকট শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে দুইটা কথা শুনিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিল—শরৎচন্দ্র নানা সাহেবের সহিত নেপালে যাত্রা করিয়াছেন; আর একজন বলিয়াছিল—শরৎচন্দ্রের কাঁসি হইয়াছে। যাহাই হউক, এদুটা সংবাদই ভয়ানক। সহসা এদুইটা কথা বলিলে, বিদ্যাবাসিনী অস্থির হইবেন, এই জন্ত সাধক এ সকল কথা বিন্দুকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। এক পক্ষ পূর্ণ হইলে বিদ্যাবাসিনীকে বলিলেন—মা! শরৎচন্দ্রকে পাওয়া গেল না, আর পাইবার আশাও নাই। এখানে থাকিলে, আমাদিগকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে। অতএব চল, দেশে যাই।

বিদ্যাবাসিনী ভয়েই হউক, কিম্বা যে কারণেই হউক, বলিলেন, আপনাদের ইচ্ছা হইয়া থাকিলে, চলুন, দেশেই যাই।

সাধকের উত্তর পাইবার পূর্বেই বিদ্যাবাসিনী পুন বলিলেন, যদি আমাকে দেশের লোকে গ্রহণ না করেন, তবে কি হইবে?

সাধক বলিলেন, তাহা হইলে তোমাকে আমার সহিত রাখিব।

বলিলেন, আরও একটা কথা আছে। রজনী বাবুর নিকট

আমি অনেক বিষয়ে ঋণী আছি; তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইবার আর উপায় নাই; তাঁহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই; তাঁহাদের পরিবারের পূর্ব্ব অর্জিত কোন গোল থাকায়, তাঁহার সহিত কেই কণ্ঠার বিবাহ দেয় না। নীরদা—শরৎচন্দ্রের বিধবা ভগ্নী। শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছাড়িবার একমাত্র কারণ নীরদার কষ্ট। আপনি যদি সাহায্য করেন, তবে নীরদার সহিত রজনী বাবুর বিবাহ দিতে চেষ্টা করিব।

সাধক।—গুরুতর কথা। নীরদার কষ্টই শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছাড়িবার কারণ, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না; যে ব্যক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে বিলোড়িত করিতে প্রস্তুত, তাহার সমাজের কি ভয়? বাহা হউক, তোমার কথা বুঝিতে যদি ভুল হইয়া না থাকে, এবং নীরদা ও রজনীর যদি বিবাহে অমত না থাকে, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

বিন্দ্যবাসিনী।—নীরদা বালিকা, তাহার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কি? রজনীবাবু আমার কথায় অমত করিবেন না। বিশেষত, নীরদার রূপ দেখিলে তিনি অবশ্যই আমার প্রস্তাবে সন্মত হইবেন।

সাধক।—নীরদার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। নীরদা বিবাহে সন্মতি দিবে, কি না দিবে, তাহা তুমিও বলিতে পার না, পারিলেও তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ মানুষের মন বুঝিবার শক্তি তোমার অল্পই আছে। বাহা হউক, আমি এই পর্য্যন্ত বলি, নীরদার মত হইলে বিবাহ হইবে।

বিন্দ্যবাসিনী আর কিছুই বলিলেন না।

তারপর দিন সাধক, বিন্দ্যবাসিনী এবং সত্যভামাকে লইয়া মধুপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিফল-চেষ্টা।

অবিনাশচন্দ্রের সূত্রা জননী আত্মও জীবিতা আছেন। পুত্রের প্রধান কার্য্য—মাতৃসেবা; অবিনাশচন্দ্র মাতৃভক্ত, মাতার অহুবোধ পালন করিবার জন্ত, স্বীয় জীবনের কর্তব্য-কার্য্যে আত্ম পর্য্যন্তও হাত দিতে পারেন নাই।

মাতার অমুরোধে, তিনি চাকুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সরস্বতী চিত্রদিনই আবির্ভাবের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, বিদ্যা বলে গবর্ণমেন্টের নিকট তিনি একটা ভাল চাকুরি পাইয়াছেন। বৎসরের মধ্যে ৭৮ বার করিয়া বাড়ীতে আসিতেন; মাতার সেবার জন্ত নলিনীকে মধুপুরেই রাখিয়া যাইতেন। নীরদা মধুপুরেই থাকেন; তাহার শিশুর-বাড়ীতে আর কেহই নাই; অনেক দিন হইল, শিশুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

অল্পকাল মধ্যেই অবির্ভাবের মধুপুরের মধ্যে একজন মাননীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। অবির্ভাবের মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন লোক, মধুপুরে নিতান্ত অল্প।

বিদ্যাবাসিনী, সাধকের সহিত প্রথমে বিষ্ণুপুরে গেলেন। সেখানে রজনী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রজনী বাবু বড় লোক হইলেও, বিষ্ণুর সংব্যবহারে পরাজিত হইলেন। বিষ্ণুর আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন; তিনি পূর্বে মেহ স্মরণ করিয়া, বিদ্যাবাসিনীর বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত মধুপুর পর্য্যন্ত আসিলেন।

বিদ্যাবাসিনী, সাধক ও রজনী বাবুকে লইয়া বাড়ীর ঘাটে আসিলেন। নীরদা এবং অবির্ভাবের আফ্লাদিত মনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। অবির্ভাবের এই সময়ে বাড়ীতে না থাকিলে সামাজিক গোল বাধিত কি না, জানি না, কিন্তু অবির্ভাবের বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহার ভয়ে কেহই কিছু বলিল না।

যখন অবির্ভাবের, সাধক এবং রজনী বাবুর পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার আফ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্বে সন্দেহ-পূর্ণ হৃদয়ে দাদার কথা পালন করিবার জন্ত, বিদ্যাবাসিনীকে, আগ্রহ সহকারে, বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সর্বিশেষ যখন শুনিলেন, তখন তাঁহার বিমলানন্দ হইতে লাগিল। নলিনীকে বিষ্ণুর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। সাধক এবং রজনী বাবুকে বিশেষ যত্নসহকারে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন।

এই প্রকারে প্রায় দশ বারো দিন গেল; সাধক বিদ্যাবাসিনীকে নীরদার মন বুঝিতে বলিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর কি সাধ্য নীরদার মনে প্রবেশ করে? নীরদার আর সেই বালিকার জায় চঞ্চল স্বভাব নাই। হৃদয় মন গভীর—অতলম্পর্শ।

বিদ্যাবাসিনী, নীরদার উন্নত মনের পরিচয় পাইয়া, বিস্মিত হইলেন।

এক দিন অবিনাশচন্দ্রের নিকট নীরদার এবং রজনী বাবুর বিবাহের কথা পাড়িলেন, অবিনাশচন্দ্র বলিলেন “নীরদার ইচ্ছা হইলে আমার অমত নাই।”

কিন্তু নীরদার ইচ্ছা হইবে কি প্রকারে ? রজনী বাবু নীরদার রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন ; বিদ্যাবাসিনীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ; মনে মনে ভাবিলেন, এক দিনে হটক, দুই দিনে হটক, স্ত্রীলোকের মন পুরুষে অমুরক্ত হইবেই হইবে ।

অবিনাশচন্দ্র বখা সময়ে কৰ্ম্ম স্থানে গেলেন । বিদ্যাবাসিনী, এবং রজনী বাবু, একাগ্রমনে নীরদার মন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আর নলিনী ? নলিনী—দেখিতে লাগিল—“ঠাকুরঝি ফাঁদে পড়েন কি না ?”

নীরদার সাধারণ স্ত্রীলোকের স্থায় লজ্জা নাই । লজ্জার স্থান, ধর্ম্মভাব অধিকার করিয়াছে ;—নীরদা সকলের সহিতই সরলভাবে কথাবার্তা বলে । তুমি ইহাকে মন্দ বলিবে, বল, নীরদার গায়ে সে কথা লাগিবে না ; নীরদা যাহা ভাল বঝিবে, তাহা করিবেই । নীরদা জানে, যে সতী স্বীয় জীবনের আদর্শে পুরুষের কুটিল মনকে পরাস্ত করিতে না পারে, সে সতীর অস্তিত্বে সংসারের কি উপকার ? নীরদা লজ্জাশূন্য, রজনী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হইবার ইহাই একটা প্রধান আশা । পুরুষ জানে, পরশমণির মহাগুণ, তাতে নীরদা আবার লজ্জাহীন, রজনী বাবু ভাবিলেন, এ সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার জীবনেই এক দিন শোভা পাইবে । এই আশালতায় জড়িত হইয়া, নীরদার মন ভাঙ্গিবার জন্ত, তিনি চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন । পুরুষের মন কি প্রকার নীচ, তাহার উদাহরণের জন্ত, আমরা এক দিনের ঘটনা এই স্থানে প্রকাশ করিলাম ।

একদিন সন্ধ্যার সময়, নীরদা গম্ভীর ভাবে ঈশ্বর-তত্ত্ব চিন্তা করিতে ছিলেন, রজনী বাবু সময় বুঝিয়া মন ভাঙ্গিবার জন্ত বাইরা লগিতে লাগিলেন, “নীর,—আর কতকাল এই ভাবে থাকিবে ? নীর, কথা কও । নীর, আমার যে আর কেহই নাই ।”

বারম্বার বিরক্ত করায়, নীরদা বাধা হইয়া বলিল—“আপনি এসময়ে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিলেন কেন ?

রজনী বাবু বলিলেন,—কেন নীর, তোমার আবার চিন্তা কি ?

নীরদা।—সে কথার উত্তর আপনাকে স্থাি দিব না । আমি-ত আর আপনার দাসী নহি যে, আপনি বাহা বলিবেন, তাহাই করিব ?

রজনী।—তবে কি, নীর, তুমি আমাকে ভালবাস না ? আমি যে আর কিচুই জানি না ; তোমার মন পাইবার জগুই ত আমি এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছি । তুমি যদি আমাকে এমন নিদারুণ কথা বল, তবে আর যে আমার উপায় নাই ।

নীরদা।—অপনাকে ভালবাসি কি না, তাহা জানিয়া অপেনার দরকার কি ? আপনার মনের কথা অজ্ঞকে জানিতে দিব কেন ?

রজনী।—আমি যে তোমার মন চাই ?

নীরদা।—আমার মন অজ্ঞকে কি প্রকারে দিব ?

রজনী।—আমি কি তোমার আপনার নহি ?

নীরদা।—আপনি কি চাহেন, স্পষ্ট করিয়া বলুন । আমাকে রোজ রোজ বিরক্ত করিবেন না, আপনার উপকার করিতে আমার সাধ্য থাকে, করিব ; নচেৎ এমন করিয়া প্রত্যহ আর বিরক্ত করিবেন না ।

রজনী।—আমি বলি, তুমি চুল বাঁধ, কপালে সিন্দূর কোঁটা দেও, ভাল কাপড় পর, অধর রঞ্জিত কর ।

নীরদা।—তাতে আপনার স্বার্থ কি ? আমার চুল বাঁধি বা না বাঁধি, সে আমার ইচ্ছা ; আপনি আমাকে অহুরোধ করেন কেন ?

রজনী।—তোমাকে সুন্দর দেখিলে, আমি সুখী হই ।

নীরদা।—সুখী নাই বা হইলেন ? আমার সৌন্দর্য্যে যদি আপনার সুখ হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলি, আপনার জীবনে সুখ নাই ।

রজনী।—কেন নীর ? ও কথা বলিতেছ কেন ? তুমি কি চিরকালই এই ভাবে থাকিবে ? আর কি চুল বাঁধিবে না ?

নীরদা।—কি জন্য চুল বাঁধিব ? চুল বাঁধিলে-কি হয়, আপে বলুন, তার পর বলিব, বাঁধিব কি না ?

রজনী।—চুল বাঁধিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় । সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইলে, অস্ত্রের মন বাঁধা যায় ।

নীরদা।—আমি সৌন্দর্য্য লইয়া কি করিব ? আমার যে ত্রুত, ইহাতে সৌন্দর্য্য চাই না । অস্ত্রের মন বাঁধার যে কথা বলিলেন ;—তাতে আমার আবশ্যক কি ? আমি সংসারকে মন দিব, সংসারকে আপন ভাবিব । অস্ত্রের মন আমাকে দিল কি না দিল, সে বিষয়ে আমি ভাবিব কেন ?

রজনী যাবু বলিলেন, নীর । আমি এখানে আসিয়াছি কেন, বলত ?

নীরদা।—আপনি কেন আসিয়াছেন, তা আপনিই জানেন। আমি কি প্রকারে জানিব ?

রজনী।—জানিতে চাও ?

নীরদা।—জানিয়া কি করিব ? জানিলে আমার যদি কোন উপকার হয় বুঝেন, তবে বলুন ।

রজনী।—তোমার উপকার করিবার জ্ঞানই আসিয়াছি, তোমার উপকার ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না ; আমি তোমার জন্যই আসিয়াছি ।

নীরদা।—ঈশ্বর আপনাদেবতার বাসনা পূর্ণ করুন ।

রজনী।—ঈশ্বর কেন নীর ? তোমার ইচ্ছা হইলে, তুমিই যে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পার ।

নীরদা।—আমার কি সাধ্য ? দীনবন্ধু ভিন্ন আমি যে আমিষ-শূন্য ।

রজনী।—তোমার মন আমি পাই, আমার মন তোমাকে দেই, ইহা আমার বাসনা, এই জন্যই তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছি । আমার মন তোমাকে দিয়াছি, এখন তোমার মন আমাকে দেও । এ ত তোমারই হাত ।

নীরদা।—আমার মন আপনাকে কি প্রকারে দিব ?

রজনী।—আমাকে বিবাহ কর ।

নীরদা।—বিবাহের অর্থ কি ? আপনাদেবতার সহিত আমিষ স্থাপন করার নাম যদি বিবাহ হয়, তবে আপনাকে বিবাহ করিতে পারি । আপনি বিবাহ কাহাকে বলেন ?

রজনী।—বিবাহ বাহা, তাহাকেই বলি, অর্থাৎ তুমি আমার হইবে, আমি তোমার হইব ; তুমি আমার উপর বদ্ধক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে, আমিও পারিব, এবং আমাদের উভয়ের বাসনা উভয়ে পূর্যাইব ।

নীরদা।—তবে বিবাহ করিতে পারি না ; আমি আপনাদেবতার সহিত হইব না, আপনাকে গ্রহণও করিতে পারিব না । আমার মনের উপর মাত্র এক জনের আধিপত্য আছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আধিপতি । আমার মনে আপনি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন না ।

রজনী বাবু এ কথা শুনিয়া নিতান্ত অশ্রুতিত হইলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঘর ভাঙ্গিল ।

এই সকল ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন বিদ্যাবাসিনী, নীরদা এবং নলিনী বসিয়া এইরূপ গল্প করিতেছিল ।

বিদ্যাবাসিনী।—নীর! আমি তোমাকে বা যা জিজ্ঞাসা করিব, সে সকলের উত্তর দিবে ত ?

নীরদা।—যদি না দেই ?

বিদ্যাবাসিনী।—যদি না দেও, তবে আবার দেশ ছাড়িয়া যাইব ।

নীরদা।—তুমি কি আমারই জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলে ?

বিদ্যাবাসিনী।—বল ত, কেন দেশ ছাড়িয়াছিলাম ?

নীরদা।—কেন ছাড়িয়াছিলে, তা তুমিই জান । তুমি আমাকে ত পত্র লিখেছিলে, দাদার জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলে ।

বিন্দু।—আচ্ছা মনে কর, তাই হলো । আমি তোমার দাদার জন্য এ সংসার ছাড়িতে পারি ; তুমি কার জন্য পার, নীর ?

নীরদার মুখ গস্তীরভাব ধারণ করিল, বলিল,—আমি কার জন্য পারি ? সংসারে এমন লোক নাই । তবে একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দ জীবনসর্ব্বস্বের জন্য এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারি ।

বিদ্যাবাসিনী দেখিলেন, এই ভাবে কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে কিছুই হইবে না, বলিলেন, নীর ! তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস ?

নীরদা।—আমার হৃদয়কে ।

বিন্দু।—তবে তুমি স্বার্থপর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ ; এ সংসারে পরকে যে মন না দিল, তার আবার ভালবাসা কি ?

নীরদা।—তুমি পরোপকারের কথা বলিতেছ ? আমি পর কি, তাহা জানি না, পরের উপকার আবার কি ? আমি জানি, বিশ্বাস করি, আমার বাহা, তাহাতেই আমার মমতা, তাহাতেই আমার ভালবাসা । আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয়, আমার জগৎ, আমার সকল । আমার বাহা, তাহাকেই ভালবাসি ; আর বাহা পর, তাহাকে হৃদয়েও স্থান দেই না ।

বিদ্যাবাসিনী ।—আপনার জন্ত সমস্ত সংসারই ব্যস্ত, যদি পরের উপকার না করিলে, তবে আর মানুষ কি ? তবে তুমি স্বার্থপর—পশু ।

নীরদা ।—বল নাচার ; কিন্তু ভেবে দেখত, কে স্বার্থপরের ন্যায় কথা বলিতেছে ? তুমি অন্যকে পর ভাবিয়া উপকার করিতে বল, আমি আপনার ভাবিয়া করিতে চাই । আমি জানি, দয়া প্রভৃতি পরের জনহিত, আপনার জন্য । এ সংসারে সকল মমতাই আপনার জন্য । যাহারা পর পর করিয়া অস্থির, তাহারা স্বার্থপর ; মনের সহিত কাহারও উপকার করে না, তবে যশোলিপুসা, আত্মগৌরব ও সম্মান প্রভৃতির আশায় পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করে ; নচেৎ মন হইতে বাহা, তাহা আপনার জন্য । তুমি যাহাকে পর বলিয়া উপকার করিতে বল, আমি তাহাকে আপনার ভাবিয়া করি ; স্বার্থপর কে ?

বিদ্যাবাসিনী দেখিলেন, এ প্রকারেও মন পাইবার ঘো নাই, বলিলেন —
আমাকে তুমি পর ভাব, না আপনার ভাব ?

নীরদা ।—আপনার ভাবি ।

বিদ্যাবাসিনী ।—যাহাকে আপনার ভাব, তাহাকে দেখিবার জন্য তোমার মন উৎসুক হয় না ?

নীরদা ।—না—তা হয় না । যাহাদের হয়, তাহারা পর ভাবে । আমার বাহা, তাহাকে দেখি আর না দেখি, তাহা আমারই থাকিবে । যদি বিচ্ছেদ আমার অসম্ব হইত, তাহা হইলে, এ প্রাণ এত দিন বাহির হইয়া বাইত ।

বিদ্যাবাসিনী ।—তুমি সকলকেই আপন ভাব ?

নীরদা ।—না, তাহা ত বলি নাই । আমি যাহাকে দয়া করি, যাহার উপকার করি, সে আমার ; আমি পরোপকার করিতে জানি না ।

বিদ্যাবাসিনী ।—পূর্বে বলিয়াছ, আমাকে তুমি আপন ভাব, আচ্ছা, আমার উপকারের জন্য তুমি কি করিতে পার ?

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 'ঠাকুরঝিকে এইবার পথে আসিতে হইবে ।

নীরদার উত্তর করিতে বিলম্ব হইল না, বলিল 'তোমার জন্ত বি উপকার করিতে পারি ? আমার বাহা সাধ্য, তাহাই করিতে পারি ।

বিদ্যাবাসিনী বলিলেন, 'নীর ! বসন্তে কোকিল ডাকে কেন ?'

নীরদা ।—নিজেরা স্বর শুনিয়া মোহিত হয় বলিয়া ।

বিদ্যাবাসিনী ।—আর তুমি রহিয়াছ কেন ?

নীরদা।—আমায়ই জন্ম রহিয়াছি। যাহা আমার, তাহারই জন্ম আছি।

বিদ্যাবাসিনী।—আচ্ছা বলত, রজনী বাবু তোমার পর না আপন ?

এবার নীরদা একটু ভাবিল, ভাবিয়া বলিল, রজনী বাবু তোমার আপন, তুমি আমার, তবে রজনী বাবুও আমার।

নলিনী স্নানার্থী হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুরঝি, পুরুষ আপন হইলে কি হয়, তা আপনি জানেন না ? এইবার আপনি ঠকিয়াছেন।”

বিদ্যাবাসিনী।—রজনী তোমার আপন ! স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ বধন আপন হয়, তখন তাহাকে কি বলে, জান ? তাহাকে বিবাহ বলে।

নীরদা।—তাহাকে কি বলে, তাহা জানিবার আবশ্যিকতা নাই। যাহার মধ্যে আমিহ, তাহাকেই যদি বিবাহ বলে, তবে আমি অনেককেই বিবাহ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, সমস্ত পৃথিবীকে বিবাহ করি।

নলিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরঝি ! তবে নাকি আপনি বিয়ে করবেন না, তবে নাকি আপনি বিয়ে করবেন না ?

বিদ্যাবাসিনী।—তবে রজনী বাবু তোমার স্বামী ?

নীরদা এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, ‘রজনী আমার, কিন্তু আমার স্বামী নহে। আমার স্বামী একজন আছেন,—যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনিই স্বামী। রজনী আমার স্বামী নহে। রজনী আমার আপনার লোক, এই মাত্র।

বিদ্যাবাসিনী মহাগোলে পড়িয়া বলিলেন,—নীর ! আজ রজনী বাড়ী যাবে।

নীরদা।—এখানে থাকিয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন, যাবেন, ভালই।

বিদ্যাবাসিনী।—তোমার কষ্ট হয় না ?

নীরদা।—না, আমার কষ্ট হয় না।

বিদ্যাবাসিনী।—নীর ! আর একটা কথা জানিতে চাই ?

নীরদা।—বল, কি কথা ?

বিদ্যাবাসিনী।—রজনী বাবুকে যদি তোমার বিবাহ করিতে অমত না থাকে, তবে তাহাকে বিবাহ কর।

নীরদা।—রজনী আমার ; তাহার মধ্যে আমিহ আছে, ইহাই যদি বিবাহ হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আবার বিবাহ কি ?

বিদ্যাবাসিনী। শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ কর, নহিলে তুমি বধন রজনী বাবুর সহিত যাইবে, তখন লোকে তোমাকে কুলটা বলিবে।

নীরদা।—শাস্ত্র কি ? শাস্ত্র মন । মন ভিন্ন যে শাস্ত্র, তাহা আমি মানি না । আমি তাহার সহিত বাইব কেন ? তাহাকে বিবাহ করিলাম, এইমাত্র, বিবাহের সহিত যাওয়ার কি প্রসঙ্গ ? আর গেলেই বা আমাকে লোকে কুলটা বলিবে কেন ? বিবাহ করিলে যদি কুলটা হয়, তবেত আমি কুলটাই ।

বিদ্যাবাসিনী এবার স্পষ্টত বলিলেন, মনুষ্যের রিপূর^১ অস্তিত্ব তুমি স্বীকার কর না ?

নীরদা।—একদিনও না । তুমি সেই কথা বলিতেছিলে ? তবে রজনী আমার বিষ—এ সংসারে রজনী আমার আপন নহে । রজনীকে আপন বলিলে, যদি তোমাদের মনে 'রিপুর কণা' উঠে, তবে রজনীকে কখনও বিবাহ করিব না, রজনী আমার পর ; তাহার জন্ত আমার মন কাঁপে না ।

ঘর ভাঙ্গিয়া গেল । বিদ্যাবাসিনী এতক্ষণ ধরিয়া যে ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সহসা ভাঙ্গিল । বলিলেন, একটা কাজ করিবে, নীর ? —রজনীর উপকার, আমার উপকার ।

নীরদা।—রজনীর কথা আর বলিও না, আমি তাহার উপকার করিব না, সে আমার পর, পরের উপকার করিতে আমি আজও শিক্ষা করি নাই । তোমার কি উপকার, বল ?

বিদ্যাবাসিনী।—আমার উপকারের কথা, তবে শুন । রজনী বাবুর দ্বারা আমার জীবন পাইয়াছি, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার আমার আর উপায় নাই ; তবে তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হও, তবে আমি সে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি । আর কিছুই নহে, তুমি রজনী বাবুকে বিবাহ কর ।

নীরদার মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিল—জীবনে তোমার ঋণ কিম্বা আমার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্ত, পরের উপকার করিতে পারি না । পারিলেও তোমার এ কথার সার দেই না । রজনী সর্প—সর্পদংশনে আমার প্রাণ বাহির হইবে ; তুমি কেমন করিয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইবে ?

বিদ্যাবাসিনী আর কথা বলিলেন না । বৈকালে সাধক আসিলে, তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন । সাধক সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—আমার ধর্মসাধন না, স্বার্থসাধন ; আমি এতকাল কেবল স্বার্থ-সাধন করিয়াছি । যদি ধর্মসাধন কেহ করিয়া থাকে, যদি প্রেমের মর্ম্ম কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে সে নীরদা । আমার সাধনা পরাস্ত হইল ; নীরদা আমার ধর্ম্ম-জীবনের এক অস্তাব দূর করিল । কোথায় নীরদা, তাহাকে ডাকিরা আন ।

নীরদা আসিয়া গভীর ভাবে দাঁড়াইল। সাধক দেখিলেন, প্রকৃত সাধনার ফল জ্বালানান রহিয়াছে; দেখিলেন, নীরদার মূর্তি প্রেমে গঠিত। বিস্ময়-প্রেম নিকেতন দেখিয়া সাধক মস্তক নোরাইয়া নীরদাকে প্রণিপাত করিলেন, তারপর বলিলেন—‘মা ! তোমার নিকট আজ যাহা শিক্ষা করিলাম, চতুর্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও তাহা শিক্ষা করিতে পারি নাই। সংসারের স্বার্থ নিঃস্বার্থ তুমিই বুঝিয়াছ; আমিও কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; পর কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; ধর্ম কি, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ; আমরা কেবল যশ-প্রার্থী, স্বার্থ-সাধনার রত, আমরা কেবল স্বার্থ বুঝিয়াছি। আমাদের ধর্মকথা কেবল ভাণ মাত্র, আমাদের পরোপকারের কথা কেবল স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র।

বিদ্বাসিনী সকল শুনিলেন, শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সাধক তাহার পর রজনী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—‘রজনী ! কেন বুধা মনে আশা করিয়া আছ ? নীরদাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও; এসংসারে নীরদাকে বিবাহ করিতে পারে, এমন লোক আছে কিনা, আমি জানি না। কেন আর এই পবিত্র প্রেম-নিকেতনের প্রতি, অনিমেঘ নয়নে, সংসারের কুটিল প্রণয়ের আশায় তাকাইয়া রহিয়াছ ? যে দিন বিশ্বত্রকাণ্ডকে বিবাহ করিতে শিখিবে, সেই দিন নীরদা তোমার ভার্য্যা হইবে। এখন তুমি বাড়ীতে যাও।

রজনী বাবু সকল কথা না বুঝিয়া একটু ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন, অথচ সাধকের আজ্ঞা অবহেলার যোগ্য নহে, তিনি সেইদিনই বাড়ীতে গেলেন।

সাধক, স্বীয় সাধনার প্রধান অভাব বুঝিয়া, সেই সাধনার অঙ্গ পূর্ণ করিতে আবার বিজন অরণ্যে যাত্রা করিলেন। বিদ্বাসিনীও তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইলেন। বালিকা নলিনী—নীরদার নিকট নিঃস্বার্থ প্রেম শিক্ষা করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আর একটা দৃশ্য ।

বিদ্বাসিনী এবং সাধকের মধুপুর পরিত্যাগের প্রায় একমাস পরে শরৎচন্দ্রের বড় ভ্রাতার বিষয় মনে বাড়ীতে আসিলেন। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদানল

বাহাদের জদরে প্রজ্জলিত, তাঁহাদিগের মনে পৃথিবীর কোন্ বস্তু স্মরণ দিতে পারে ?

শরৎচন্দ্রের দেশত্যাগের সহিত মধুপুরের কোন্ পদার্থ শ্রীবিহীন হইয়াছে ? মধুপুরের কোন্ কাণ্ড অসম্পন্ন থাকে ? মধুপুরের নিকটবর্তী নদী আজও মৃদু মৃদু ভাবে বয়, পাখী আজও মধুর রবে গায়, পশু আজও মাঠে চরিয়া বেড়ায়, রজনীযোগে আজও আকাশে চন্দ্রমা হাসে, আজও গাভী বৎসর কল পাগলিনী, আজও মৎস্য জলে ক্রীড় করে। নাই কোন বস্তু ? লোক আছে—তাহাদের মনে স্মরণ আছে ;—বৃক্ষ আছে,—বৃক্ষ ফল ফল ধরিতে ভুলিয়া যায় নাই। আজও ময়দান কর্ষিত হয়, নিশীথে আজও বীণার ঝঙ্কার কর্ণকে তোষে। সেই আমোদ, সেই কলহ, সেই কোকিল, সেই বসন্ত, সেই বারমাস আজও মধুপুরে সমভাবে ক্রীড়া করে। মধুপুরে সকলই আছে, কিন্তু নাই একটা বস্তু। অল্পে তাহা কি বুঝিবে ? শরৎচন্দ্রের দেশ-ত্যাগের সহিত তাহার ভ্রাতাদের জদয়ের এক অঙ্গ যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা আজও ঘোড়া লাগে নাই ! স্মৃতির শেষ চিহ্ন যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই ভ্রাতৃস্নেহের মূলে কুঠারাঘাতের যন্ত্রণা শেল বিদ্ধ করিবে। মধুপুরের সকলই আছে, নাই কেবল শরৎচন্দ্রের ভ্রাতাদের মনে স্মরণ, নাই কেবল শরৎচন্দ্রের ভ্রাতাদের মুখে বিচিত্র লীলাময়ী হাস্য। মধুপুরের সকলই পূর্বের স্মরণ শিথিল রহিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পিতার শেষ চিহ্ন একেবারে শীহীন হইয়া রহিয়াছে ! !

সুশীলা নীরদার ত্রুটিত নয়ন কতই কি দেখিল ! মধুপুরে, শরৎচন্দ্রের বাড়ী ঘর সময়শ্রোতে, ক্রমে ক্রমে, বিলীন হইতে লাগিল যখন, তখনও এই সরলার নয়ন জলে অভিষিক্ত হইয়াছিল, আর পূর্বের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়াও ইহারই নয়ন একদিন আনন্দাশ্রু ফেলিয়াছিল। সংসারে যত্ন বিনা কোন্ বস্তু চিরস্থায়ী হয় ? শরৎচন্দ্রের দেশ-ত্যাগের পর, তাহার ভ্রাতারা একেবারে বাড়ীর মমতা ছাড়িলেন, ভ্রাতার সহিত পিতার ভবনকে বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জন দিলেন। সময়-শ্রোত, ক্রমে ক্রমে সেই সৌন্দর্য্যের আকর, গৃহ সকলকে বিলীন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে, এক পরমাণু রূপান্তর হইয়া, অল্প পরমাণুর সাজ ধরিল। ধরিল সাজ—কিন্তু সে সকল দেখিতে দেখিতে কাহার নয়ন হইতে জল পড়িল ? ভ্রাতারা দূর দেশে সময় কাটাইলেন, পরমাণুর রূপান্তর তাঁহাদিগের জদরে আঘাত করিতে সমর্থ হইল

না । কিন্তু একটা জীব—সমভাবে, এই সংসারে অস্থায়ী লীলা খেলা দেখিল ; সে জীব সেই নীরদা । নীরদার নয়নাশ্রু দিনান্তে একবার করিয়া সেই স্থানে পতিত হইত । নীরদা যখন দিনান্তে ইষ্টদেবতার পানে তাকাইত, তখন এই অস্থায়ী সংসারের শিক্ষা আসিয়া বৈরাগ্য ভাব উদ্বীপ্ত করিত ।

• এতদিন পর আবার শরৎচন্দ্রের ভ্রাতারা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, — সুখের কথা, মধুপুর আনন্দে আল্পত হইল । কিন্তু ভ্রাতাদের মন ? স্মৃতির শেষ চিহ্ন হৃদয়ে উদ্বীপ্ত হইলে, এ সংসারে কাহার মনের শান্তিরক্ষা হয় ? পিতৃভূমির শেষ চিহ্ন, সেই বিলুপ্ত প্রায় গৃহ সকলের অবশিষ্টাংশ স্মৃতির দ্বারে আঘাত করিল ; ছুই ভাই, ছুই কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে করিয়া সেই আশানে দাঁড়াইয়া অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন । আশানে পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে কাহার মর্মে আঘাত করিল ?—সেই ধর্ম-প্রাণা স্ত্রীসমা নীরদার ।

শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল,—ভ্রাতাদের অমুহত্যামুর্সারে সেই গৃহের অবশিষ্ট সরঞ্জাম সকল একত্রিত হইল । তারপর, ছুই ভাই, সেই চিহ্নকে ভূতে মিশাইবার দ্বন্দ্ব, তাহাতে অধি প্রয়োগ করিলেন । নিমেষের মধ্যে শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল, নিমেষে এত কালের সঞ্চিত শেষ চিহ্ন আঁক বাস্প হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল । এই ঘটনা দেখিয়া, কেহ বুঝিল, নখর জগতে ভ্রাতৃত্বের কি, কেহ বুঝিল, নখর সংসারে উন্নততা কাহাকে বলে । নীরদা যাহা বুঝিল, তাহাতে নীরদাকে আরো ধর্মপথের উচ্চ সোপানে উঠাইয়া দিল ।

এই কার্য সমাধা হইলে শরৎচন্দ্রের স্মরণার্থ গগনে একটা নিশান উঠিল । সে নিশান, কত কাল আকাশে উড়িয়াছিল, তাহা আশাততঃ অপ্রকাশিত রহিল ।

পরম ধনু সমাপ্ত ।

পারিশিষ্ট ।

১। আমরা বাধ্য হইয়া, অপূর্ণ অবস্থায়, শরৎচন্দ্রের কাহিনী শেষ করিলাম। পিঞ্জরের বিহীন যেমন মন ভরিয়া, আনন্দে গাইতে সজুচিত হয়, চিরদীপক-পিঞ্জরের অভ্যস্তর হইতে, স্বাধীন ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে আমাদের মনও সেই প্রকার সজুচিত হইয়াছে। তাই অসময়ে এই জীবন-সাগরের মাঝখানে শরৎচন্দ্রকে ভাসাইলাম। ভারতবর্ষ চিরকাল বীর-প্রসূতি বলিয়া জগতে বিখ্যাত, সেই ভারতের একটী বীরের হৃদয় আঁকিত করিয়া আজ আমরা জগতকে দেখাইতে পারিলাম না, এ দুঃখ, এ মনস্তাপ এ জীবনে ঘুচিবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক !

আমরা কর্তব্য পালন করিয়া জেলে বাইতে ভীত নহি, কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহাতে কোন ফলের আশা দেখি না। আজ ভারতে, এক জনের কষ্ট দেখিলে, অন্তের হাস্ত সঘরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠে,—এক জনের সুখ কল্পনা করিলে অপরের হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হয়। বিধাতা কতকাল ভারতকে এই প্রকার হীনাবস্থায় রাখিবেন, আমরা জানি না ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি এ ভারতে কখনও শুভদিনের সুপ্রভাত হয়—যদি ভারত কখনও সহানুভূতির মর্ম্ব বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়, তবে তখন আমরা আনন্দে আবার শরৎচন্দ্রকে লইয়া অভিনয় দেখাইতে আসিব, এ সংসারে কেহ আমাদের বাধ্য দিতে পারিবে না।

২। বিবাহ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত কি, তাহা অব্যক্ত নাই। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, প্রণয় ব্যতীতও প্রেম শিক্ষা হইতে পারে; প্রণয় রিপূর পরিচালনা, প্রেম বৃত্তির পরিচালনা। বিবাহ না করিলেও লোক ভাল থাকিতে পারে, ইহাই প্রমাণ করা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাহাদের জীবন কার্যস্রোতে ভাসমান, তাহাদের রিপূর যরণা নিতান্ত নিস্তেজ ; এই সকল কথাই আমরা ধ্বাংস বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। শরৎচন্দ্র পাঠে যদি কাহারও জীবনে এই গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন নূতন শিক্ষা লাভ হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

৩। আদিরস-প্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে শরৎচন্দ্রকে কলুষিত ভাব-ছটা হইতে রক্ষা করিয়াছি। শরৎচন্দ্র রমণীগণের পাঠোপযোগী হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। একটী রমণীরও যদি ইহা পাঠে উপকার হয়, আমাদের পরিশ্রম সফল হইল মনে করিব।



